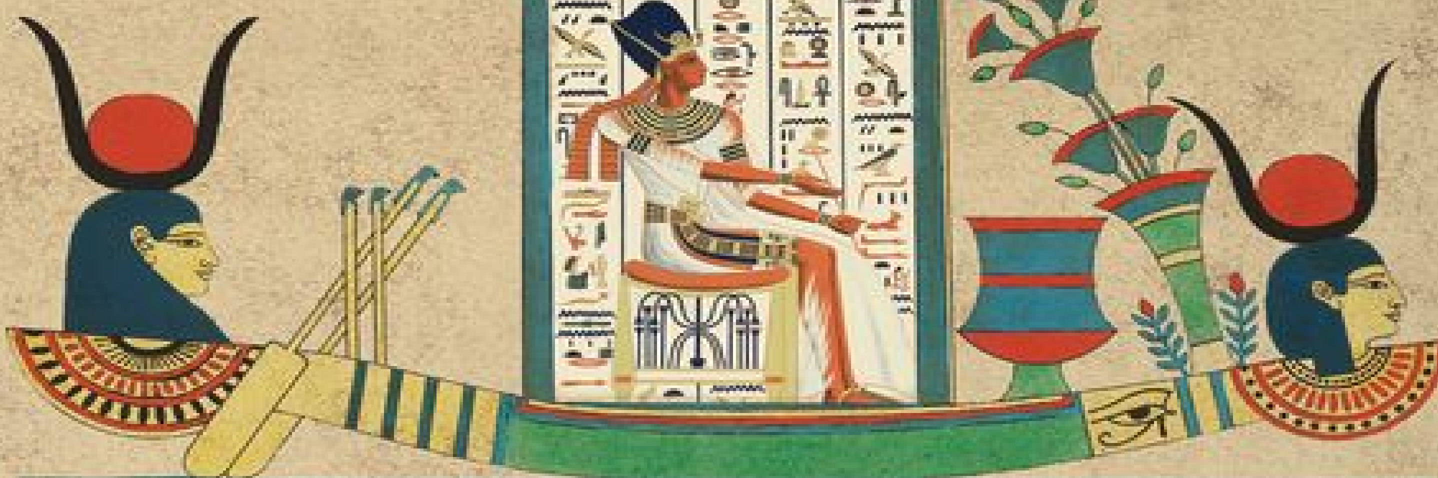








অনির্বাণ ঘোষ

হারানো সূর্যের খোঁজে

অনির্বাণ ঘোষ

হারানো সূর্যের খোঁজে





www.patrabharati.com



প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০২২
দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০২২

পত্রভারতী বুকস প্রাইভেট লিমিটেড, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ রূপায়ণ সুবিনয় দাস
অলংকরণ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

HARANO SURJER KHONJE
Mythological Novel *by* Anirban Ghosh
Published by PATRA BHARATI BOOKS Pvt. Ltd.
1/1 Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700009
Sales Office : PATRA BHARATI®
at 3/1 College Row, Kolkata 700009
+91-33-22411175, 9433075550
info@patrabharati.com
patrabharatibooks 9830806799

ISBN 978-93-94913-10-3

এই বইটা তোমার জন্য বাপি।
তোমার দেখানো স্বপ্ন
আমার দুই চোখে লেগে রয়েছে।

কেমন করে এল?

এই উপন্যাসটি জন্ম নেওয়ার কৃতিত্ব বেশ কিছু পিঠ চাপড়ানির এবং একটি লম্বা চওড়া হাইওয়ের, যার নাম 'এম-থ্রি'।

আমার প্রথম বই বেরিয়েছিল সাড়ে তিন বছর আগে। তার অভাবনীয় জনপ্রিয়তা যেমন আমাকে আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনই একই সঙ্গে একটি খুব বড় সত্যির সামনে এনে ফেলেছিল আমাকে। তা হল বইটি সফল ঠিকই, কিন্তু আমি নিজে এখনও ভালোভাবে লিখতে জানি না।

আমার বেশ কিছু পাঠক জানেন যে আমি পেশায় ডাক্তার। যদিও আমার মন পড়ে থাকে ইতিহাস, মিথোলজি, সাহিত্য, শিল্পে, তবুও আমার দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় হয় ডাক্তারিতে। বাড়ি ফেরার পরে ব্যস্ত হয়ে পড়ি মেয়েকে নিয়ে। সুতরাং ক্রমশই লেখালিখি থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছিলাম। তবু নিজের মনকে প্রবোধ দিতাম, কাজের চাপ কমুক, একদিন ঠিক ফিরবই।

কিন্তু 'ফিরবই' এমন ভেবে চলা আর সত্যিকারের ফিরে আসার মধ্যে যে কয়েক পৃথিবীর দূরত্ব। এই পথ পাড়ি দিলাম ওই এম-থ্রি'র হাত ধরে। গতবছরে আমার কর্মস্থল বেশ কিছুটা দূরে চলে গেল। দুটি ঘণ্টা আমার কাটত গাড়িতে বসে, ইংল্যান্ডের মোটরওয়ে এম-থ্রির বুকে। সেই সময়টা আমি অডিও বুক শুনতে লাগলাম। কয়েক মাসের মধ্যে খেয়াল করলাম আমি শুনে ফেলেছি সুনীল, শীর্ষেন্দু, বুদ্ধদেব, শরদিন্দুর বেশ কিছু উপন্যাস, যা আমার আগে পড়া থাকলেও এবারে যেন অন্যভাবে আবিষ্কার করছি। একদিন খেয়াল করলাম, নিজের অজান্তেই, একটি গল্পের শিশুগাছ, যেন আমার মধ্যে বেড়ে উঠছে।

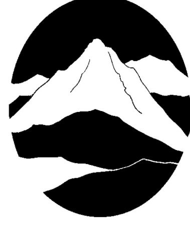
সেইদিন বাড়ি ফিরে ল্যাপটপের সামনে বসলাম। সেই শুরু। রাত জেগে কয়েক ঘণ্টা লিখে শুতে যেতাম। পরদিন সকালে ড্রাইভ করার সময় আমার মন জুড়ে থাকত 'থীবস', 'অগস্ত্য', 'উপল', 'ইরতেনসেনু'। লিখতে লিখতে বুঝতে পারলাম কাহিনিটি আয়তনে বড় হয়ে চলেছে।

সেই দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের ফল এই উপন্যাস 'হারানো সূর্যের খোঁজে'। তবে উপন্যাসটি বই হয়ে প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ পথে আমি একা ছিলাম না। সপ্তর্ষি বোস অনেক যত্ন নিয়ে এই উপন্যাসটিকে পাঠযোগ্য করে তুলেছে। সাহিত্যিক রাজা ভট্টাচার্য এবং ঋজু গাঙ্গুলি তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক দেবাশিষ গোস্বামী, আমার ভাই অরিজিৎ গাঙ্গুলি এবং 'আনাড়ি মাইন্ডস'-এর সবাইকে। আমার স্ত্রী জয়িতার সহ্যশক্তি তুলনাহীন, তার স্বামীর মাঝে-মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে সে। 'পত্রভারতী'র ত্রিদিববাবু, চুমকিদি এবং বিভাগের সকলের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

পাঠক, আপনার কাছে অনুরোধ, আমার তৈরি করা জগতে ঘুরে এসে আপনার কেমন লাগল জানাবেন প্লিস। তাহলে আপনার জন্যই আমার লেখকসত্তা বেঁচে থাকবে।

অনির্বাণ ঘোষ

১লা জুলাই, ২০২২
কলকাতা



১

আজ মকর সংক্রান্তি।

পয়োষ্ণী নদীর উপরে গত তিন বছর ধরে যে বাঁধ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে আজ তার পরীক্ষা। মধ্যগগনে থাকা সূর্যের গনগনে আঁচে পৃথিবীর মাটি তপ্ত হয়ে আছে। মাটির উপরের শিলাখণ্ড, টিলা, পাহাড়ের গায়ে আরও বহুগুণে যেন জমা হয়ে আছে সেই উষ্ণতা। অথচ সেই তাপকে উপেক্ষা করেই মানুষের ঢল নেমেছে আজ। নদী থেকে আধযোজন দূরে পাহাড়ের ঢালে তারা জমা হয়েছে এক আশ্চর্য জাদুকে নিজের চোখে দেখবে বলে।

এমন জাদু এই দেশে আগে কখনও ঘটেছে বলে জানা যায় না। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের হয়তো এমন ক্ষমতা ছিল। কিন্তু দু'জন মানুষ যে এমন আশ্চর্য ঘটাতে পারে এমন কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি। আজ হয় এই জাদু সফল হয়ে মানুষ ঈশ্বরকে স্পর্শ করবে, অথবা প্রলয় নেমে আসবে পৃথিবীর এই ভূমিখণ্ডটির বুকে।

ভারতবর্ষ, দু'দিকে পাহাড় আর অন্য দু'দিকে সমুদ্রে ঘেরা এই সুবিশাল ভূমি। এর উত্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয় পর্বত। তার হিমেল হাওয়া এই ভূখণ্ডের বুকের উপর দিয়ে বয়ে যেতে যেতে মিশে যায় সাগরের আর্দ্রতায়। দেশটির দক্ষিণ-পূর্ব আর দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে দুই মহাসাগর, যাদের শেষ কোথায় তা কেউ জানে না। এই দুই সাগরের মাঝে যেন বল্লমের ফলার মতো নেমে এসেছে ভারত ভূখণ্ড।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে দু'হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল এই পৃথিবীর সভ্যতম, আধুনিকতম জনপদ। হিমালয়ের উপত্যকায় জন্ম নিয়ে পশ্চিমে পাড়ি দেওয়া সিন্ধুনদ আর তার উপনদীরা ছিল এই অঞ্চলে প্রাণের উৎস। সরস্বতী, বিতস্তা, শতদ্রু এদেরকে ঘিরেই সবুজের মধ্যে প্রাণের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। নদীই মানব সভ্যতার জননী, তার জল, হাওয়ায় জীবন বিকশিত হয়, চাষবাস হয়, গৃহপালিত পশুরা চরে বেড়ায় হরিৎ চারণভূমে।

সিন্ধুর জনপদও এমনই ছিল। এমনকী তারা সরস্বতী নদীর বুকেই ভাসিয়েছিল পালতোলা বড় বড় নৌকা। সেই নৌকারা যেত দূরের দেশগুলিতে বাণিজ্য করতে। কয়েকমাস অথবা কয়েকবছর পর তারা ফিরে আসত সিন্ধুর বন্দরে, তাদের বুকে থাকত ভিনদেশের শস্য, অলঙ্কার, নারী এবং পুরুষেরা।

কিন্তু কালের নিয়ম বড় অদ্ভুত। মানুষ প্রকৃতির দাসমাত্র। আচমকাই একদিন মাটি কেঁপে উঠেছিল। ভয়াবহ সেই কাঁপুনি। মনে হয়েছিল সেই দিন যেন শেষ হয়ে যাবে মানবজাতি আর তার গড়ে তোলা সভ্যতার সকল দিকচিহ্ন। সরস্বতীর তীরে বসতি তৈরি হওয়ার হাজার বছর পরে ভূকম্পন তাকে টলিয়ে দিয়েছিল। সংখ্যার হিসাব না থাকলেও প্রাণহানি হয়েছিল লক্ষাধিক মানুষের।

সেই ভয়ঙ্কর প্রলয় মিটে যাওয়ার পর পৃথিবী যখন শান্ত হল তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে, সরস্বতী নদীটি তখন আর নেই। যে খাতে নদী বইছিল সেই খাতে এক প্রকাণ্ড ফাটল। যেন সেই ফাঁক দিয়েই ভূগর্ভস্থ হয়েছেন নদী-মা। এই ঘটনার কয়েক বছরের মধ্যেই সরস্বতীর দু'পাশে থাকা গ্রাম, শহরগুলি নষ্ট হয়ে যেতে থাকল। দুর্ভাগ্য যেন লেগেই ছিল ভারতবর্ষের ললাটে। কোন অজানা কারণে মাটি হয়ে উঠল

লবণাক্ত, অনুর্বর। বছরের পর বছর ধরে বৃষ্টি না হওয়ার কারণে শস্য উৎপাদন একপ্রকার অসম্ভবই হয়ে উঠল। যে ঘৃণ্য কাজের জন্য দেবী সিন্ধুর অভিশাপে সিন্ধু সভ্যতা নষ্ট হয়ে গেল তার কথা আজও ভারত ভূখণ্ডের মানুষ ভুলতে পারেনি। আজও এই ভারত ভূখণ্ডের কোনও এক মা তার শিশুটিকে সেই কথা গল্প করে বলার সময় কেঁপে ওঠেন।

সিন্ধু সভ্যতা যখন কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে থাকছে তখন মানুষ আরও একবার যাত্রা করল। এবার কিছুটা দক্ষিণের দিকে ততদিনে দেশের মধ্যে বিস্তৃত হওয়া অন্য এক জাতি মিশে গেছে সিন্ধুর আদি নাগরিকদের সঙ্গে। এরা আর্য, এরা ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দাদের তুলনায় আকারে এবং প্রকারে অন্যরকম। লম্বায় বেশ কিছুটা বেশি, গৌর বর্ণ, এদের নাক টিকালো, বড় বড় চোখ। বর্তমানে এই আর্যরা ভারত ভূমির নিয়ন্ত্রক। যে নতুন ভারত এখন জাগছে তা ভারত ভূমির শিরঃদেশ থেকে সরে এসে আশ্রয় নিয়েছে তার বুকে। বেশ কয়েকটি আর্য রাজার রাজত্ব তৈরি হয়েছে এখানে। এই নতুন রাজত্বগুলির প্রায় সবক'টিই গড়ে উঠেছে গঙ্গা, যমুনা এবং সরযু নদীর তীরে। এখন এই নদীগুলি দিয়ে হিমালয়ের আশীর্বাদ প্রবাহিত হয়। গোটা বছর নদীগুলিতে জল থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে। ভারতবর্ষের পূর্বদিকে একটি জঙ্গলে ঘেরা অববাহিকায় গঙ্গা এসে মিশেছে সমুদ্রে। এখানে গড়ে উঠেছে কিছু নতুন বন্দর। তবে এখন এই দেশের সবচেয়ে বড় বন্দরটি আছে পশ্চিমে। তার নাম সোপারা।



ভারতবর্ষকে যদি মানবশরীর হিসাবে কল্পনা করা যায় তাহলে তার ডান বাহুর আকারে বেরিয়ে থাকা ছোট্ট অংশটির নীচেই আছে এক বিরাট হ্রদ। লোকশ্রুতি এই যে, এই হ্রদের আকার এতই বড় যে তা স্বয়ং গঙ্গার সমস্ত জল নিজের মধ্যে অনায়াসে ধারণ করতে পারবে। হিমালয় থেকে মাটির নীচের কোন গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে বয়ে আসা জল নাকি এই হ্রদের পুষ্টি যোগায়। এই সুড়ঙ্গ প্রকৃতির এক অজানা খেয়ালে সৃষ্টি। সোপারা হ্রদ থেকে একটি সরু অথচ গভীর খাঁড়ি জন্ম নিয়ে মিশেছে পশ্চিমের সমুদ্রে। তাই এই হ্রদের তীরে জন্ম হয়েছে ভারতের সর্ববৃহৎ বন্দরটি। হ্রদের নামে বন্দরটির নামও সোপারা। দেশের মূল বাণিজ্য চলে এই বন্দরের মাধ্যমে।

তবে আর্যদের বেশিরভাগ রাজ্যগুলি মূলত নদীমাতৃক হলেও একটি এমন রাজত্ব আছে যার প্রাণ কোনও নদী নয়, এক পর্বত। ভারতবর্ষের প্রায় মাঝ বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে বিস্তৃত এই পর্বতমালার নাম

বিন্ধ্য। এই পর্বতের চারপাশে যেন এক নিজস্ব জলবায়ু তৈরি হয়েছে। পশ্চিমের সমুদ্রের লবণাক্ত হাওয়াকে বিন্ধ্য আটকায়, আবার হিমালয় থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস বিন্ধ্যর গায়ে ধাক্কা খেয়ে তার পাদদেশে জমতে শুরু করে। সেই বায়ু ভারী হয়ে এলে যে মেঘের সৃষ্টি হয় তাই এই অঞ্চলের মাটিতে নেমে আসে বৃষ্টিকণার আকারে।



এখানের আবহাওয়া গোটা বছরই নাতিশীতোষ্ণ, আরামপ্রদ। আবার উত্তরের কোশল বা পাঞ্চাল রাজ্যের তুলনায় এই জায়গাটি সোপারা বন্দরের বেশ অনেকটাই কাছে। তাই এখানে জনপদ তৈরি হতে বেশি সময় লাগেনি। এই অঞ্চলে যে রাজত্ব গড়ে উঠেছে তার নাম বিদর্ভ। বিদর্ভের রাজারা এখানে গত দেড়শো বছর ধরে রাজত্ব করছেন। ভারতবর্ষের বুকে প্রতিপত্তিশালী এক নগরী হিসাবে নাম করেছে বিদর্ভের রাজধানী কুন্দিনাপুরী। মগধ, কোশল, অযোধ্যার রাজপরিবারগুলির সঙ্গেও বিদর্ভের বেশ সদ্ভাব রয়েছে। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ বিদর্ভের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পেলেও সেই সুখ কোথাও গিয়ে যেন সামান্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল।

তার কারণ দুটি।

২। ইরতেনসেনু

থীবস নগরী, মিশর।

থীবসের সূর্য ঝলমলে আকাশে আজ খুশির আলো। বাতাসে খুশির গন্ধ। গুগগুল আর মৃগনাভি ইন্ধন জোগাচ্ছে সেই গন্ধে। শহরের রাস্তায় আজ মানুষের ঢল নেমেছে। আনন্দে আত্মহারা তারা। আজ যে ওপেতের উৎসব!

সদ্য কয়েকমাস আগেই নীলনদে বন্যা হয়েছে। নদের পাড়ে থাকা শহর থেকে বন্যার জল নেমে গেলেও নীচু চাষের জমিতে তার চিহ্ন রয়ে গেছে। এই জলই বয়ে এনেছে নীলের বুকের কাদা মাটি। এতে আবাদি জমি আরও উর্বর হয়ে উঠবে। জমা জল সরে গেলেই শুরু হবে চাষের কাজ। গম, ভুট্টা, যব, পিঁয়াজ, বাঁধাকপিতে ভরে উঠবে খেতগুলো। এখান থেকেই খাদ্যের জোগান যাবে গোটা দেশে। বছরের এই সময়ে তাই ওপেতের উৎসবে মেতে ওঠে মিশরীয়রা। ধন্যবাদ জানায় আমুন-রাকে।

আমুন-রা মিশরের প্রধান ঈশ্বর। আকাশে থাকা সূর্য তিনি। তাঁর আঙুল থেকে জন্ম নিয়েছে নীলনদ। আমুনের আলোতে আলোকিত হয় পৃথিবী। রাতে আমুন পশ্চিমে হারিয়ে গেলে যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে আসে চাঁদের ক্ষীণ আলো তাকে দূর করতে অক্ষম। মিশরীয়রা মনে করে এই অন্ধকারেই বাস শয়তানের। তাই তারা প্রতি রাতে প্রার্থনা করে যেন আগামী সকালে আবার আকাশে আমুনের দেখা পাওয়া যায়।

তাদের দেবতা কখনও তাদেরকে নিরাশ করেননি।

ওপেতের উৎসব আমুন-রা'র উদ্দেশেই। থীবস শহরের লাক্সরে আছে আমুনের বিশাল মন্দির। আজকের দিনে আমুনকে মন্দির থেকে বার করে পবিত্র নীলনদের জলে স্নান করানো হয়। তাঁর গায়ে জড়ানো হয় গাঢ় নীল পশমের বস্ত্র, গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় বহুমূল্য রত্নহার। আমুনের সেই মূর্তিকে বসানো হয় একটি কাঠের তৈরি নৌকায়। আজ আমুনের গন্তব্য কার্নাকের মন্দির। লাক্সর আর কার্নাক এই দুই মন্দিরই নীলনদের তীরে। দুই মন্দিরকে যোগ করেছে একটি বেশ চওড়া রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে রাখা অজস্র অদ্ভুতদর্শন মূর্তি। তাদের কারোর মাথা মানুষের, কারোর ভেড়ার, কারোর বা কুমিরের, কিন্তু তাদের শরীরগুলি হয় সিংহের। পবিত্র এই রাস্তার সর্বসময়ের রক্ষী এরা।

রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে এক বিশাল শোভাযাত্রা। সবার সামনে আছে আমুনের পতাকা বাহকেরা, তাদের পিছনে বাদকেরা। ঢোল, বীণা, খঞ্জনি বাজাচ্ছে তারা, সেই বাজনার সুরে দেবতার গীত গাইছে মন্দিরের গায়কেরা। তাদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ। উজ্জ্বল নীল, লাল, হলুদ পোষাক তাদের পরনে। গায়কদের পিছনে আসছে কসরতকারীদের দল। তাদের কেউ ডিগবাজি খাচ্ছে, কেউ হাঁটছে উল্টো হয়ে হাতের ওপরে ভর দিয়ে। তাদের পিছনে দেখা যাচ্ছে দেশের সর্বশক্তিমান মানুষটিকে। আজ তাঁর জন্যও বড় একটি দিন। আজই তিনি ফারাও হবেন। আমুন-রা এর শক্তি আজ প্রবাহিত হবে তাঁর আত্মা 'কা'-এর মধ্যে।

তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে মৃদু আপত্তি আছে এই মানুষটিকে নিয়ে। তার কারণ তিনি তো পুরুষ নন, এক নারী! এক মেয়ে দেশ শাসন করবে, এমনটা মিশরীয়রা দেখেছিল বটে কয়েকশো বছর আগে। কিন্তু সেই ঘটনা যে আবার ঘটতে পারে তা কেউ কোনওদিন ভাবেনি। রানি হাতসেপসুতের গায়ে আজ বহুমূল্য পোশাক। রক্তের মতো লাল এই পোশাকের কাপড় আসে পূর্বের যে দেশ থেকে তার নাম ভারতবর্ষ। আজ রানির সর্বাঙ্গে সোনার অলঙ্কার, তাতে শোভা পাচ্ছে চুনী ও পান্নার মতো রত্নেরা। রানি দু'হাত আকাশের দিকে তুলে মৃদু কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন আমুন-রা'র। তাঁর খুব কাছে কেউ থাকলে আজ বুঝতে পারত

হাতসেপসুতের গলার স্বর কাঁপছে। মুখের অমলিন হাসিটি বুকের মধ্যে থাকা আশঙ্কার দোলাচলকে লুকিয়ে রেখেছে। তাঁর দু'হাতে পরা চামড়ার দস্তানার দিকেও হয়তো কারোর নজর যায়নি।

হাতসেপসুতের পিছনেই আসছেন স্বয়ং আমুন-রা। কাঠের নৌকার ওপরে বসে থাকা তাঁর বিগ্রহকে কাঁধে করে নিয়ে আসছেন লাক্সরের মন্দিরের আট পুরোহিত। তাদের মুণ্ডিত মস্তক, পরনে সাদা কাপড়। তাদের মধ্যে প্রধান পুরোহিত সেনেনমুতকে আলাদা করে চেনা যায় তাঁর কোমরে জড়ানো চিতা বাঘের চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে। আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি। সেনেনমুত একাধারে পুরোহিত এবং রাজসভার মহামন্ত্রী। আবার তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান অবিশ্বাস্য! প্রতি বছর খরা বা বন্যার সময় তিনি আগে থেকেই অনুমান করে ফেলেন অব্যর্থ ভাবে। সেনেনমুত তাঁর কর্তব্যে অবিচল। হাঁটার সময় যেন তাঁর চোখের পলকও পড়ছে না। এই দীর্ঘ রাস্তায় এত ভারী বিগ্রহকে কাঁধে করে আনার সময় বেশ কয়েকবার পুরোহিত বদল হলেও সেনেনমুত তাঁর জায়গা ছাড়েননি। রানি হাতসেপসুত একবার পিছন ফিরে তাকালেন সেনেনমুতের দিকে। অপাঙ্গে সেই দৃষ্টিকে খেয়াল করলেন তিনি। চোয়াল শক্ত হল। সেই সময় আগত প্রায়।

হে আমুন-রা! রক্ষা করুন আমাদের!

অনাম্নী এক জনৈকা কোলের শিশুটিকে নিয়ে এই শোভাযাত্রা দেখছিল। বাজনার তালে তালে দুলে উঠছিল শিশুর হাত। একসময় সে আকাশের দিকে তাকাল অবাক চোখে। আঙুল তুলে কিছু দেখাতে চাইল মাকে। পাখির দল শহরের আকাশ বেয়ে পাড়ি দিচ্ছে পশ্চিমের দিকে। কিন্তু এখন তো ওদের ঘরে ফেরার কথা নয়! সেই ভরা দুপুরে...একী! একী হচ্ছে! আলো কমে আসছে কেন!

মুহূর্তের মধ্যে বাজনা থেমে গেল। কোন সম্মোহনী শক্তিতে যেন জনসমুদ্রের কলরব ক্ষণিকের নিস্তব্ধতায় বিলীন হয়ে গেল। তার পরেই জেগে উঠল হাহাকার! কালো হতে থাকা আকাশের দিকে দু'হাত তুলে আর্তনাদ করতে লাগল তারা।

স্বয়ং আমুন-রা কুপিত হয়েছেন। তাঁর অভিশাপ নেমে আসছে মিশরের বুকে!

ওপেতের উৎসবের কয়েক চন্দ্রমাস আগের কথা।

'সূর্যগ্রহণ!'

'হ্যাঁ রানি, সূর্যগ্রহণ। আকাশের সূর্য ঢাকা পড়ে যাবে কালো এক বলয়ের আড়ালে।'

'আপনি ঠিক বলছেন তো সেনেনমুত?'

'হ্যাঁ রানি, আমার গণনা নির্ভুল। আসন্ন ওপেত অনুষ্ঠানের দিনেই হবে সূর্যগ্রহণ। তা স্থায়ী হবে বেশ কয়েক ঘণ্টা।'

ভয়ে রানি হাতসেপসুতের দম যেন বন্ধ হয়ে এল। এমন কিছুর জন্য তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না! রানি সাহসী, বুদ্ধিমতী। স্বামী দ্বিতীয় তুতমোসের আকস্মিক মৃত্যুর পরে দেশের শাসন ব্যবস্থার হাল ধরতে হয়েছিল রানিকেই। তাঁর সৎ ছেলে তৃতীয় তুতমোসের বয়স যে তখন মাত্র দুই! এই সময় রাজধানীর সিংহাসন খালি থাকলে মিশরের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আশেপাশের দেশগুলি সবসময় ওৎ পেতে থাকে। সামান্য দুর্বলতার সুযোগ পেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে মিশরের ওপরে। তছনছ করে দেবে সোনার দেশটিকে।

গত আট বছর ধরে রানি বেশ শক্ত হাতেই সামলেছেন তাঁর দায়িত্বকে। তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধিতে শত্রু দেশ নুবিয়াও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আক্কাদিয়ান, হিতাইত, মিতানিদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েই গিয়েছিল। তারা জানে আদতে মিশরের সিংহাসন শূন্য। এক নারী বকলমে রাজত্ব চালাচ্ছেন। এই সময় প্রয়োজন এক ফারাওয়ের। নাবালক তুতমোসকে তো আর ফারাও বানানো যায় না, তাই স্বয়ং রানিই এগিয়ে এসেছিলেন আবার। মিশরের ইতিহাসে তৃতীয় বারের জন্য কোন নারী পরতে চলেছিলেন ফারাওয়ের মুকুট।

ওপেতের উৎসব হল ফারাওয়ের রাজ্যাভিষেকের দিন। মিশরীয়রা বিশ্বাস করে এই দিনই আমুন-রা'র শক্তি প্রবাহিত হয় ফারাওয়ের মধ্যে। ফারাওয়ের আত্মা 'কা' এক হয়ে যায় আমুন-রা এর সঙ্গে। তাই রানি হাতসেপসুতেরও ফারাও হওয়ার দিন এই ওপেতের উৎসবই।

কিন্তু সূর্যগ্রহণ!

'এ কীভাবে হয়?'

'সেদিন সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে চলে আসবে চাঁদ। তার ছায়ায় ঢাকা পড়বে সূর্যের আলো।'

'তাহলে উপায়? আকাশে সূর্য না থাকলে যে দেশের মানুষ আমাকেই দায়ী করবে। তারা ভাববে আমার সাথে একাত্ম হতে চান না আমুন-রা! কোনওভাবেই আমি ফারাও হতে পারব না, আর তার ফল কী হবে বুঝতে পারছেন সেনেনমুত!'

প্রধান উপদেষ্টার কপালে তখন গভীর চিন্তার ছাপ, ওপেত উৎসবের দিন পূর্ব নির্ধারিত। সেই দিনটি বদলাতে গেলে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ জাগবে।

অস্থির ভাবে নিজের কক্ষে পায়চারি করছিলেন রানি। তাঁর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেনেনমুত। কক্ষের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

'আর কে জানে এই সূর্যগ্রহণের কথা?'

'আর কেউ জানে না রানি। গত পরশু আমি সামনের একটি বছরের আসন্ন মাসগুলির গণনা করছিলাম। তখনই আমার নজরে আসে এটি। দু'রাত আমি চোখের পাতা এক করতে পারিনি। বার বার মিলিয়ে দেখেছি আমার অঙ্ক। প্রতিবার একই উত্তর এসেছে।'

সূর্যের দেবতা আমুন-রা এর উৎসবেই আকাশে সূর্য থাকবে না!

আলো, আলো চাই!

রানি সেনেনমুতের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। হতাশা আর দুশ্চিন্তা মেশানো গলায় বললেন, 'এই আলোচনা আমার আর আপনার মধ্যেই থাক। অন্য কাউকে ঘুণাক্ষরেও এর কথা বলবেন না। আর একটা কাজ করুন, ইরতেনসেনুর কাছে খবর পাঠান। বলুন আমি এখনই দেখা করতে বলেছি।'

ছোট্ট পিঁপড়েটির দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে ছিল ইরতেনসেনু। পিঁপড়ে তখন রুটির টুকরো মাথায় নিয়ে তার বাসার দিকে চলেছে। এই বাসাটি ইরতেনসেনুর বানানো। নিজের গবেষণাগারের একটি কোণে বালি এবং শুকনো মাটি দিয়ে তৈরি করেছে পিঁপড়েদের বসতি। দিনের অনেকটা সময় কাটে এদেরকে লক্ষ করে। থীবস শহর থেকে কিছুটা দূরে পাহাড়ের গায়ে তৈরি হচ্ছে রানি হাতসেপসুতের বিশাল মন্দির। সেই মন্দির বানানোর দায়িত্ব ইরতেনসেনুর উপরে। ওর তৈরি নকশা দেখে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে কয়েকশো শ্রমিক।

তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য ইরতেনসেনু বানিয়েছে একটি যন্ত্র। যাতে দড়ির সাহায্যে খুব ভারী পাথরও টেনে উপরে তোলা যায়। কিন্তু মানুষের শরীরের গঠন এমন যে আধুনিক যন্ত্র আবিষ্কার করলেও তার কায়িক পরিশ্রম সামান্য মাত্র কমে। একটানা বেশিক্ষণ কাজও করতে পারে না তারা। অথচ এই পিঁপড়েদের দেখ, নিজের থেকে অন্তত কুড়ি গুণ ভারী বস্তুকেও কেমন অনায়াসে বয়ে নিয়ে যায়। ইরতেনসেনু তাই এখন এদের নিয়েই মেতেছে। খুব কাছ থেকে এদেরকে লক্ষ করে বোঝার চেষ্টা করছে এই অমিত শক্তির রহস্য। পিঁপড়েদের দৈহিক গঠনের ওপরে ভিত্তি করে শ্রমিকদের জন্য বর্ম বানানোর ইচ্ছা ইরতেনসেনুর। সেই বর্ম পরলে হয়তো মন্দির তৈরির জন্য পাথর বয়ে নিয়ে যেতেও সমস্যা হবে না আর। কাজও এগোবে দ্রুত।

সামনের দুটো পা আর শুঁড়ই ধরে রেখেছে রুটির টুকরোটাকে। বাকি পাগুলি শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করছে। ইরতেনসেনু অনেকটা ঝুঁকে এসেছে পিঁপড়েটির দিকে। নীলনদে ফোটা পদ্মের মতো আয়ত চোখ তার। পান্নার মতো হালকা সবুজ মণি সেই চোখের। ইরতেনসেনু দীর্ঘাঙ্গী, তার গায়ের রঙ শ্যামলা। দু'দিকে সামান্য উত্তল মুখ এসে শেষ হয়েছে তীক্ষ্ণ থুতনিতে। ঘন কালো চুল কাঁধ ছাপিয়ে পিঠের উপরে এসে

নেমেছে। ইরতেনসেনু সুন্দরী, কিন্তু সেইদিকে ওর নিজের ভ্রুক্ষেপ নেই। ওর মতে মানুষের আসল সৌন্দর্য তার শরীরে নয়, মস্তিষ্কের গভীরে। বুদ্ধিহীন সুন্দর মানুষ নিষ্প্রাণ রঙিন পাথরের মতোই। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই ইরতেনসেনু রানি হাতসেপসুতের সভার প্রধান কারিগর এবং বৈজ্ঞানিক। থীবস শহরের কোলাহল থেকে দূরে ছোট এক গ্রামের মধ্যে থাকে সে। এখানে তার কাজে মন বসে বেশি। নিজের বাড়ির একটি ঘরে সে বানিয়েছে গবেষণাগার। ইরতেনসেনু প্রকৃত অর্থেই সুন্দরী।

সেনেনমুত নিজে দেখা করতে এসেছিলেন ইরতেনসেনুর কাছে। তিনি ইরতেনসেনুর পালক পিতা। ইরতেনসেনুর বয়স যখন সাত তখন এক অনাথ আশ্রম থেকে তাকে দত্তক নেন সেনেনমুত, তাকে আশ্রয় দেন নিজের পরিবারে। তারপর থেকে সযত্নে বড় করে তুলেছেন এই কন্যারত্নটিকে। এখন এই মেয়ে মিশরের গর্ব! ইরতেনসেনুর সঙ্গে একান্ত আলাপে সেনেনমুত জানিয়েছিলেন আসন্ন বিপদের কথা। সব শুনে ইরতেনসেনুর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। কিন্তু খানিক পরেই সে উজ্জ্বল চোখে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

'রানিকে আমি কিছু দেখাতে চাই পিতা!'

'খুব ভালো ইরতেনসেনু, তাহলে কবে প্রাসাদে আসবে বলো। তুমি চাইলে এখনই আমার সঙ্গে যাত্রা করতে পারো।'

'না, আমি যেতে পারব না। যা দেখাব তা এখনই এই গবেষণাগারের বাইরে বার করা উচিত হবে না মনে হয়। আপনি রানিকে বলুন এখানে আসতে। আমার বিশ্বাস উনি কিছু মনে করবেন না।'

হাতসেপসুত চরম রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েও আত্মদম্ভে ডুবে যাওয়ার মানুষ নন। অতি বিচক্ষণ তিনি। যখন শুনলেন ইরতেনসেনু তাঁর দর্শনপ্রার্থী, তখনই মনস্থির করেছিলেন ওর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার। সাধারণত ইরতেনসেনু এমন কিছু করে না। নিজেই হাজির হয় রাজপ্রাসাদে। এবারে নিশ্চয়ই কোন যথার্থ কারণ আছে। দু'দিন পরে রাত্রির অন্ধকারে এক ছায়া মূর্তিকে দেখা গেল রাজপ্রাসাদ থেকে বার হতে। অতি সাধারণ পোষাকে রানি হাতসেপসুত যখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে থীবসের রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কেউ ফিরেও তাকায়নি তাঁর দিকে। ইরতেনসেনুর কাছে আগাম খবর ছিল রানির আগমনের। নিজের গৃহের দরজার বাইরে সে অপেক্ষা করছিল।

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই রানি এতটা পথ আসার জন্য। একই সঙ্গে আমি ক্ষমাপ্রার্থীও।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই ইরতেনসেনু। তুমি নিশ্চয়ই সেনেনমুতের মুখে সব শুনেছ?'

'হ্যাঁ, সমস্যা সত্যিই গুরুতর। তবে এর সমাধান করার একটি উপায় আমার জানা আছে।'

এই কয়েকদিনে এই প্রথমবার রানির মুখে আশার আলো ফুটে উঠল, 'সত্যি! পারবে তুমি এই সূর্যগ্রহণকে ঠেকাতে?'

'না, তা পারব না, এই মহাজাগতিক ঘটনাকে আটকানোর ক্ষমতা আমার নেই রানি। কিন্তু আকাশে সূর্য না থাকলেও মাটিতে তার বিকল্প আমি হয়তো তৈরি করতে পারব।'

'মাটিতে সূর্য! তার মানে?'

'এই জন্যই আপনাকে আজ এখানে আসতে বলা। আপনাকে কিছু দেখাতে চাই আমি।'

ইরতেনসেনুকে অনুসরণ করে ওর গবেষণাগারে প্রবেশ করলেন রানি। ঘরের দেওয়ালের মধ্যে করা একটি খুপরিতে রাখা চুল্লীর আলোয় আলোকিত সেই ঘর। ঘরের মাঝখানে একটি কাঠের আসন, সেখানে বেশ কিছু প্যাপিরাসের পুঁথি অবিন্যস্ত ভাবে পড়েছিল। ইরতেনসেনু সেগুলোকে সরিয়ে রাখল একপাশে। তারপরে ঘরের এক কোণ থেকে একটি কাঠের বড় বাক্স নিয়ে এল। বাক্স খুলতেই দৃশ্যমান হল ভিতরে রাখা বস্তু। একটি কাচের গোলক, আকারে মানুষের মাথার তুলনায় সামান্য বড়। গোলকটি সম্পূর্ণ নয়। তার ফাঁকা অংশে লাগানো আছে ধাতব পাত, তা থেকে সরু সুতার মতো একটি অংশ উঠে গেছে গোলকের মধ্যে।

‘এটি কী?’

‘এই আমার আবিষ্কার রানি, এটিকে দেখাব বলে আজকে আপনাকে এখানে আসতে বলা।’

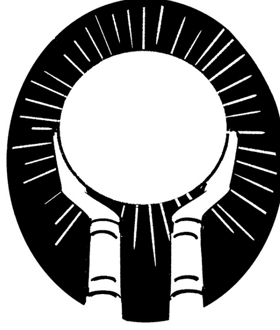
হাতসেপসুত বেশ ধন্দে পড়লেন, ‘তুমি বলতে চাইছ এই গোলকই সূর্যের বিকল্প হবে?’

‘হ্যাঁ, আপনাকে একটি জিনিস দেখাই।’

চুল্লীর মধ্যে রাখা ছিল একটি লোহার তৈরি পাত। এই ধাতু এ দেশে খুবই বিরল। আকাশ থেকে ধেয়ে আসা উল্কাতেই একমাত্র পাওয়া যায় একে। দেশের যত লোহা সব জমা হয় রাজ দরবারে। ইরতেনসেনু নিজের পদমর্যাদা বলে কিছু লোহা পেয়েছিল, এই টুকরোটি তার মধ্যে একটি। একটি আঁকশির সাহায্যে ইরতেনসেনু সেই পাতটিকে তুলে আনল চুল্লী থেকে। গনগনে আগুনের আঁচে সেই পাতে তখন কমলা আভা ফুটে উঠেছে। পাতটিকে দুটি কাদামাটির ইটের ওপরে রেখে তার ওপরে বসাল কাচের গোলকটিকে। গোলকের ধাতব অংশটি স্পর্শ করে রইল লোহার পাতকে।

এবার অপেক্ষা।

উৎসুক চোখে রানি তাকিয়ে ছিলেন গোলকের দিকে। ধীরে ধীরে গোলকের ভিতরে থাকা সরু সুতার মতো অংশটি লাল আভা ধারণ করল। তারপরে মনে হতে লাগল ওটি নিজেই একটি আগুনের টুকরো। সেই আগুনের আভা কাচের গোলক বেয়ে বাইরে আসতে লাগল। যদিও সেই আলো খুব সামান্যই, তাও রানির মনে বিস্ময় সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।



‘এ কী করে সম্ভব হল! এ কোন জাদু!’

‘জাদু নয় রানি। বিজ্ঞান। এই কাচের গোলকের ভিতরে যে সূক্ষ্ম তন্তুর মতো বস্তুটি দেখতে পাচ্ছেন তা আমার তৈরি এক সংকর ধাতু। এই ধাতু সামান্য তাপেই উত্তপ্ত হয়। আর সেই উত্তাপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা থেকেই আলো আসে। কাচের গোলক সেই আলোকে প্রতিসারিত করে চারিদিকে। কিন্তু ক্ষীণ আলো কোন কাজের জন্যই যথেষ্ট নয়। যে উত্তাপ এর প্রয়োজন তা প্রায় গলন্ত লোহার পাতও দিতে অক্ষম। এখানেই আমি পিছিয়ে পড়েছি।’

‘তাহলে তুমি বলতে চাইছ...’

ইরতেনসেনু জানে রানি বুদ্ধিমতী, তাঁর মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে বলল, ‘হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। পর্যাপ্ত পরিমানে তাপ এই ধাতুর তন্তুতে প্রবাহিত হলে যে আলো তৈরি হবে তা অন্ধকার রাতেও দিনকে ডেকে আনবে। ওপেতের উৎসবের দিন সূর্যগ্রহণের সময় এই যন্ত্রই আলো নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু সেই তাপ উৎপাদনের সময়ে যে শক্তির প্রয়োজন হবে তা আমি তৈরি করে উঠতে পারিনি। সেই বিদ্যা এখনও আমার অধরা।’

রানির মুখমণ্ডলে যে সামান্যতম আনন্দ ফুটে উঠেছিল তা ইরতেনসেনুর কথায় নিভে গেল আবার।

‘তাহলে উপায়? তোমার এই গোলকই আমায় চরম বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। সেই আশাটুকুও আর রইল না!’

ইরতেনসেনু রানির দিকে তাকিয়েই ছিল, এবারে দ্বন্দ্ব ভরা গলায় সে বলল, ‘একটি ক্ষীণ আশা এখনও আছে। আজকে আপনাকে এখানে আসতে বলার এটি দ্বিতীয় কারণ। প্রাসাদে প্রকাশ্যে এই কথা আমি আপনাকে বলতে পারতাম না।’

‘এই বিপদের দিনে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছ ইরতেনসেনু। নির্দ্বিধায় বলো তুমি কী চাও? যত সোনা, যত লোহা তোমার লাগবে নিতে পারো। আমি কোষাধ্যক্ষকে বলে রাখব। মন্দির নির্মাণের কাজ থেকেও আপাতত তোমায় অব্যাহতি দিলাম। আর বলো, কী চাই তোমার?’

‘সোনা আমার চাই না। হ্যাঁ, আরও লোহার প্রয়োজন অবশ্যই। তবে তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন একজন মানুষকে।’

‘কে সে?’

‘মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সেই ভিনদেশি কয়েদি।’

‘কার কথা বলছ বলত?’

বেশ কিছু আসামী এখন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অবস্থায় বন্দি। ওপেতের উৎসবের পরেই তাদের সাজা হবে। তাদের মধ্যে অনেকেই ভিনদেশী। চুরির দায়ে ধরা পড়ে সাধারণত এরা। রানি বুঝতে চাইলেন ইরতেনসেনু ঠিক কার কথা বলতে চাইছেন। নামটি ইরতেনসেনু মুখে আনতে চাইছিল না। সেই নামের উচ্চারণে রানি হাতসেপসুতের প্রতিক্রিয়া তার ইচ্ছার অনুকূলে যাবে না, এই ছিল ইরতেনসেনুর আশঙ্কা। কিন্তু সেই নাম নিতেই হল। শব্দটি উচ্চারণের সময় গলা কেঁপে গেল তার।

‘অগস্ত্য!’

অগস্ত্য কোন চোর নয়, খুন করতে যাওয়ার সময় ধরা পড়েছে সে। যাকে সে খুন করতে যাচ্ছিল স্বয়ং সেই মানুষটি আজ দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইরতেনসেনুর সামনে। রানি হাতসেপসুত!

৩। অগস্ত্য

যে দুটি কারণে শত সমৃদ্ধির মধ্যেও বিদর্ভের ললাটে দুঃখের ছায়া লেগেছিল তাদের একটি হল বিদর্ভের রানির শূন্য কোল। এই নিয়ে রাজা বসুমানের মনে কষ্টের অন্ত ছিল না। যে বিদর্ভের বসুন্ধরা শস্যশ্যামলা তার মহারানির গর্ভ অনুর্বরই রয়ে গিয়েছিল! তবে চার বছর আগে রাজা বসুমান এক আশ্চর্য উপায়ে এক কন্যাসন্তান লাভ করেছেন। কিন্তু রাজত্বের এই দুঃখ যখন মিটল তখন আরও এক শঙ্কা দিগন্তে দেখা দেওয়া কালো মেঘের মতো ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। তার প্রকাণ্ড ছায়া যেন গ্রাস করতে চাইছে বিদর্ভের ভবিষ্যতকে। আপাতদৃষ্টিতে তাকে তুচ্ছ মনে হলেও সেই মেঘ যে একসময় চরাচর ছেয়ে ফেলবে তা রাজা বসুমান জানতেন বিলক্ষণ। বিদর্ভের এই অপর দুঃখটি ছিল জলাভাবের। কিন্তু জলের অভাব বিদর্ভে কীভাবে হবে? বছরের দুটি মাস যে প্রবল বর্ষণে ভেসে যায় এই অঞ্চল, শস্যে ভরে থাকে বিদর্ভের খেত।

অভাব আসলে পানীয় জলের। গত এক শতাব্দী ধরে বিদর্ভের মানুষ বর্ষার জলকেই ধরে রাখত কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা জলাশয়ে। সেই জল ছিল রাজ্যের মানুষের পানীয় জলের একমাত্র জোগান। বিদর্ভে কোন কুয়ো নেই, কারণ ভূগর্ভস্থ জল এখানে সামান্যই। ক্রমে রাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে জনসংখ্যাও। গত কয়েক দশকে বিদর্ভের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আরও ভালো জীবনের আশায় এসে বাসা বেঁধেছে বিদর্ভের বুকে। এতে রাজ্য হয়েছে আরও সমৃদ্ধ, বলশালী।

এই বিপুল পরিমাণ মানুষকে ঠাঁই দেওয়ার জন্য রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হয়েছে দক্ষিণে। দক্ষিণ-পূর্বের দণ্ডক অরণ্যের কিছু অংশকে পরিষ্কার করে গড়ে উঠেছে নতুন কিছু বসতি। কিন্তু বর্ষার জলের পরিমাণ তো বাড়েনি, আজও তা শস্য ফলানোর জন্য যথেষ্ট হলেও মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। তাহলে উপায় কী? আরও কয়েক দশকের মতো বিদর্ভেরও কি অবস্থা হবে বর্তমানে নিশ্চিহ্ন সিন্ধুর জনপদের মতো?

বিন্ধ্য পর্বতমালা থেকে যে প্রধান নদীটির উৎপত্তি হয়েছে সেই নর্মদা বিদর্ভের রাজধানী কুন্দিনাপুরী থেকে প্রায় পঞ্চাশ যোজন দূরে। এই অঞ্চলে যে অন্য একটি মাত্র নদী আছে তার নাম পয়োষ্ণী। রিক্ষ পর্বতের চূড়া থেকে তার জন্ম হওয়ার পর সে বয়ে গেছে পশ্চিমের দিকে। পয়োষ্ণীর গতিপথ বিদর্ভের সর্বপশ্চিমে থাকা রাজ্যগুলি থেকেও প্রায় আধ যোজন দূরে। রাজধানী কুন্দিনাপুরী থেকে তার দূরত্ব দুই যোজন। পয়োষ্ণীর জল বছরের কোন সময়ে শুকায় না। ভরভর সেই নদী নিজের মনের আনন্দেই যেন বয়ে চলেছে। এই নদীর জল পেলে আগামী কয়েকশো বছরে বিদর্ভবাসীদের জলের আর কোনও অভাব হবে না। কিন্তু নদীর দু'ধার পাথুরে, বসবাসের অযোগ্য। তাই বিদর্ভের রাজত্বকে যে নদীর তীরে আনা যাবে এমনটা সম্ভব নয়। অতএব মানুষ নদীর কাছে আসতে পারবে না।

'কিন্তু নদী কি মানুষের কাছে আসতে পারে?'

এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে চমকে গিয়েছিলেন রাজা বসুমান। যে যুবকের মুখ থেকে এমন প্রশ্ন এসেছিল রাজা তার তুলনায় বয়সে কয়েক দশকের বড় হলেও তাকে সম্মান করেন গুরুজ্ঞানে। যুবকটির নাম অগস্ত্য। সেদিন রাজাকে এই প্রশ্ন করার সময় অগস্ত্যের মুখে লেগেছিল একটি হাসি, যেন সেই প্রশ্নের উত্তর জেনেই সে রাজাকে প্রশ্নটি করেছে।

'এই কাজ প্রায় দুরূহ, কিন্তু অসম্ভব নয় রাজন।'

'কীভাবে মহর্ষি? পয়োষ্ণী নদীকে আমি দেখেছি। তার প্রস্থ গঙ্গার মতো না হলেও সে খরস্রোতা, সেই নদীকে বিদর্ভের কাছে সরিয়ে আনা কি সম্ভব? এ যে অতিমানবিক ভাবনা!'

‘ঠিক, অতিমানবিকই বটে, একজন মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তবে সহস্র মানুষের পক্ষে অসম্ভবও নয়। আপনি যদি আমাকে ওই পরিমাণ মানুষ, পঞ্চাশটি হাতি এবং একশোটি তেজী ঘোড়া দিতে পারেন তাহলে আমি চেষ্টা করতে পারি।’

অগস্ত্যের কথায় রাজা বসুমান বিশ্বাস না করলেও আর দ্বিরুক্তি করেননি। এই যুবক যে অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী তা তিনি জানেন। ছয়টি বছর আগে অগস্ত্য বিদর্ভে এসে পৌঁছয়, নিজের পরিচয় জানায় এক আর্য হিসাবে। কিন্তু তাকে কি সত্যিই আর্যদের মতো দেখতে? অগস্ত্যের দীর্ঘ দেহ আর চওড়া কাঁধ আর্যদের মতো হলেও তার গায়ের রং যেন অন্যরকম। পাকা ধানের খেতে যে গাঢ় সোনালি আভা দেখা যায় তাই যেন অগস্ত্যের ত্বকে শোভা পায়। রাজা এমন জনশ্রুতি শুনেছেন যে, দীর্ঘকাল হিমালয়ে তীব্র সূর্যালোকে তপস্যা করার ফলে অগস্ত্যের গাত্রবর্ণ এমন। সেই ঘোর তপস্যাই তাকে অমিত ক্ষমতার অধিকারী করেছে।

কুন্দিনাপুরীতে এসে উপস্থিত হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই একের পর এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাতে থাকে অগস্ত্য। তার যোগবলে নাকি জমিতে আরও ফসল ফলেছে, কোন এক সুরা পান করিয়ে গবাদি পশুদের মারণ রোগের হাত থেকে নাকি বাঁচিয়েছে সে, মাত্র একটি লাঠিকে সম্বল করে নাকি একাই এক ডাকাতদলের মহড়া নিয়েছে। নগরের প্রান্তে থাকা তার ছোট্ট কুটিরে রাতে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যায়। ঋষি অগস্ত্য নাকি দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্রটিকে নিজের কাছে এনে রেখেছে।

এমন দেবতূল্য পুরুষকে রাজা বসুমান সাদর আমন্ত্রণ জানাতে দেরি করেননি। কয়েক চন্দ্রমাসের মধ্যেই অগস্ত্য রাজার সভায় রাজগুরুর স্থান লাভ করে। তারপর একদিন হঠাৎই দেখা যায় তার কুটির শূন্য। কোনও এক রাতের অন্ধকারে বিদর্ভ ছেড়ে গেছে ঋষি। সে যে কোথায় গেছে তা কেউ জানতে পারেনি। রাজ্যবাসীর মুখে মুখে কতই না খবর ছড়িয়েছে তারপর, তার কিছু কিছু বসুমানের কানেও এসে পৌঁছেছিল। মহর্ষি অগ্যস্ত নাকি দণ্ডকারণ্যে তপস্যারত, তার শরীর নাকি প্রস্তরীভূত হয়েছে কোন এক বিশাল বটবৃক্ষের নীচে। সে নাকি স্বয়ং ইন্দ্রের আমন্ত্রণে দেবলোকে প্রস্থান করেছে, সেখানে অসুর দমনে ব্যস্ত। এমনকি এমনও শুনেছিলেন রাজা যে, মহাত্মা হিমালয়ের দিকে যাত্রা করেছে, আরও একশত বছর অতিক্রান্ত করে আরও জ্ঞানশালী হয়ে ফিরে আসবে সে।

থীবস শহরটির বেশির ভাগ অংশ নীলনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। রানির প্রাসাদ, ধনীর অট্টালিকা, গরিবের কুটির, নাগরিকদের চলার রাস্তা, ব্যস্ত বাজার, সবুজ শস্যক্ষেত্র সবই আছে এখানে। কিন্তু এই বর্ণাঢ্য শহরের উত্তরের দিকটি রুক্ষ, শুষ্ক, ছোট ছোট বালি পাথরের পাহাড়ে আবৃত। শহরের সবাই ওই জায়গাটিকে ডাকে মৃতের উপত্যকা নামে।

এখানে যতদূর চোখ যায় দেখা যায় কবরখানা। শহরের সাধারণ মানুষদের মৃত্যুর পরে এখানে আনা হয়, স্বয়ং ফারাও ও তাঁর পরিবারের কেউ মারা গেলেও তাঁদের গন্তব্য হয় এই উপত্যকাই। এইখানে পাঁচটি মমি তৈরির কর্মশালা আছে। সারা বছর সেইগুলি ব্যস্ত থাকে মৃতের অন্য জগতে গমনের পথকে প্রস্তুত করার কাজে। কর্মশালাগুলি ছাড়া আর একটি মাত্র বড় বাড়ি আছে এখানে। নদীর পূর্ব পাড় থেকেও দেখা যায় একে। দেশের সবচেয়ে বড় এবং দুর্ভেদ্য কয়েদখানা এটি। শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের রাখা হয় এখানে।

অগস্ত্য আজ প্রায় কতদিন হল এই ছোট্ট কুঠুরিতে বন্দি তা তার খেয়াল নেই। কুঠুরির চার দেওয়ালে কোন জানলা নেই। একটি মাত্র দরজা, তাও তা আজ অবধি একটি বারের জন্যও খোলেনি। দরজার নীচের অংশ দিয়ে দিনে দুবার খাবার আসে। সামান্য ডাল আর শুকনো রুটি। তাই দিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে হয়। কুঠুরির আলো এবং বাতাসের একমাত্র উৎস পাঁচ আঙুল চওড়া একটি গোলাকার গবাক্ষ। তা অগস্ত্যের মতো দীর্ঘদেহী পুরুষেরও নাগালের বাইরে। সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়ে আসা ক্ষীণ আলোর রেখাতেই দিন রাতের চলাচল বোঝে অগস্ত্য। মাঝে মাঝে মনে হয় সে বুঝি অন্ধ হয়ে গেছে। কিছুই তো দেখা যায় না। চোখের কোনপ্রকার কাজই নেই এখানে। আবার এই অন্ধকারেই যেন চোখ আরও বেশি করে দেখতে পায়।

কালো পর্দায় যেন ভেসে ওঠে ফেলে আসা দিনগুলো। স্মৃতিরা চলতে শুরু করে। সে ভাবে তার শৈশব, কৈশোরের দিনগুলির কথা, বিদর্ভের কথা। অগস্ত্যের মাঝে মাঝে মনে হয় সে বুঝি পাগলই হয়ে যাবে। বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই অভিশপ্ত দিনটি।

সেইদিন অগস্ত্য হাজির হয়েছিল রানি হাতসেপসুতের সভায়। নিজের পরিচয় দিয়েছিল ভারত থেকে আসা বৈজ্ঞানিক হিসাবে। অগস্ত্যের মুখে স্থানীয় মিশরীয় ভাষা শুনে অবাক হয়েছিলেন স্বয়ং রানি। বিজ্ঞানচর্চায় মিশর অনেক এগিয়ে থাকা এক দেশ। অগস্ত্যের উদ্দেশ্য ছিল সেই জ্ঞানের আহরণ করা। বিজ্ঞানের গূঢ় তথ্য লুকানো থাকে দেশের কিছু হাতে গোনা বিজ্ঞানীর মধ্যে, তাদের সবাই ফারাওয়ের অধীনে। অগস্ত্য তাই হাজির হয়েছিল রানি হাতসেপসুতের কাছে, তাঁর অনুমতি নিতে। যাতে সেই গুপ্ত বলয়ে স্থান পাওয়া যায়। এইখানেই ভুলটি করে বসে সে।

সদা প্রাণভয়ে ভীত ছোট পাখি গাছের পাতার সামান্য নড়াচড়াকেও শিকারি বাজের আক্রমণ বলে ভ্রম করে। ফারাওহীন মিশরের অবস্থা তেমনই ছিল। রানি নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও জানতেন তিনি ফারাও নন। সেই কারণে প্রতিবেশী শত্রু রাষ্ট্রেরা তাঁকে ভয় পায় না। তাদের বিষাক্ত ছোবল যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। তাই সেদিন রাজসভায় রানির অনুচরেরা অগস্ত্যকে গুপ্তচর ভেবে বসে। দেশের বৈজ্ঞানিকদের কষ্টলব্ধ জ্ঞান সে নাকি চুরি করার চেষ্টা করছে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টায় অগস্ত্য বলে এই জ্ঞানের বিনিময়ে সেও এই দেশকে কিছু দিয়ে যাবে। তার নিজের কিছু আবিষ্কার। সন্দেহের গলায় সেইদিন রাজসভায় উপস্থিত থাকা মহামন্ত্রী সেনেনমুত বলেন, ‘তুমি যে একজন বৈজ্ঞানিক তার প্রমাণ দিতে পারবে?’

‘অবশ্যই পারব।’

এই বলে অগস্ত্য তার ঝোলা থেকে বার করে আনে একটি ডিম্বাকৃতি বস্তুকে। বলতে থাকে, ‘এই হল আমার নবতম আবিষ্কার। যা চোখে দেখা যায় না অথচ তার উপস্থিতি বুঝতে পারা যায় এমন কিছু বানাতে আমি সক্ষম হয়েছি।’

‘এটি কী?’ অনুসন্ধিৎসু রানি জিজ্ঞাসা করেন।

অগস্ত্য বলে, ‘এটি একটি যন্ত্র। এর কোনও নাম এখনও আমি রাখিনি। মিথ্যা বলব না, এর বাস্তব কার্যকারিতার সম্পর্কেও আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু এর অপরিসীম ক্ষমতার ব্যাপারে আমার আস্থা আছে।’

‘কী এটি, দেখি!’ বলে রানি নিজেই সামনে এগিয়ে এসে অগস্ত্যের হাত থেকে কেড়ে নেন সেই যন্ত্রটিকে। অগস্ত্য চেঁচিয়ে ওঠে, ‘সাবধান! ওই নীচের অংশে...’

অগস্ত্যের মুখের কথা ফুরোবার আগেই রানি আঙুল দিয়ে ফেলেন সেই যন্ত্রের গায়ের একটি ছোট ধাতব অংশে। সঙ্গে সঙ্গে এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁর হাত বেয়ে বুকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে! ঝনঝনিয়ে ওঠে হাত! কেঁপে ওঠে হাতসেপসুতের শরীর! তাঁর হাত থেকে ছিটকে পড়ে মাটিতে গড়িয়ে যায় যন্ত্রটি। কিন্তু অগস্ত্য সেটিকে কুড়িয়ে নেওয়ার আগেই রানির দেহরক্ষীরা ঘিরে ধরে তাকে। ভিনদেশি গুপ্তচর খুন করতে চেয়েছিল রানিকে, এই দায়ে সেই থেকে সে এই কয়েদখানায় বন্দি। আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ, তারপর নাকি একদিন তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে, জীবন্ত অবস্থায় তার শরীরের ছাল ছাড়িয়ে নাকি পুঁতে দেওয়া হবে মরুভূমির বালিতে। মৃত্যুর পরের জীবনটা তার নাকি কাটবে প্রেতাত্মা হয়ে, এমনই শুনেছে কয়েদখানার রক্ষীদের কাছে। ভয় পায়নি সে, বরং অবাক হয়েছে এই ভেবে যে সেই জীবনের কি আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে? আর যদি থাকেই তাহলে এই জীবনে তার আহরিত জ্ঞানের সবটুকু বৃথা হয়ে যাবে?

কুঠুরির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বাররক্ষীর কণ্ঠস্বরে অগস্ত্যর চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ল। দরজা খুলছে কেউ! তাহলে কি আজই তার জীবনের শেষ দিন!

রক্ষীটি যখন তার কনুই ধরে কয়েদখানার বাইরে বার করে নিয়ে আসল তখন সূর্যের আলোয় চোখে ধাঁধা লেগে গেল অগস্ত্যর। দীর্ঘ কয়েক মাস অন্ধকারে থাকার পরে এই আলোতে অভ্যস্ত হতে সময় তো

লাগবেই। ভ্রু কুঁচকে অগস্ত্য নিজের চোখের সামনে হাত এনে রাখল। শুনতে পেল এক নারী কণ্ঠ। সে নিজের পরিচয় দেওয়ার আগেই প্রথমেই একটি কথা বলল, 'আপনার আবিষ্কারটিকে আমি চিনতে পেরেছি। তড়িৎপ্রবাহের ফলেই সেদিন রানির ওইরকম অবস্থা হয়েছিল, তাই না!'

কে এ? কে এই নারী! অবশেষে একজন চিনতে পারল অগস্ত্যর আবিষ্কারকে! তার পরিশ্রম তাহলে বৃথা যায়নি! এই বিদুষীরও নিশ্চয়ই যথেষ্ট বিজ্ঞানলব্ধ চেতনা আছে! আনন্দের আতিশয্যে তার ইচ্ছা হল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু শরীর সায় দিল না। এত মাস অপুষ্টিতে কাটানোর পরে এই আকস্মিক উত্তেজনাকে সামলাতে পারল না সে।

অগস্ত্য জ্ঞান হারিয়েছিল তখন। চেতনা ফিরে আসার পর দেখল সে একটি খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে। চারপাশের দেওয়াল হালকা সবুজ বর্ণের। কিছু আসবাবপত্রও রয়েছে ঘরে। ঘরের একপাশে রাখা একটি চারপায়ার ধারে বসে আছে এক যুবতী। অগস্ত্য তার দিকে চোখ মেলে তাকাতে মৃদু হেসে সে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আজকের গোটা দিনটিই আপনি ঘুমিয়ে কাটাবেন।'

এই গলার স্বর তো অগস্ত্যর চেনা! জ্ঞান লোপ পাওয়ার আগের মুহূর্তে এই নারীই তবে...! অগস্ত্য ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল।

'আপনি...আপনি চেনেন আমাকে! আমার আবিষ্কারের কথা জানেন! আমি কিন্তু রানিকে খুন করতে চাইনি! বিশ্বাস করুন আমি...'

'থাক, এখনই এত চঞ্চল হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার শরীর এখনও ক্লান্ত। আগে স্নান করে আসুন, স্নানঘরে একটি ক্ষুরও আনিয়ে রেখেছি আমি, চাইলে এই শ্মশ্রুগুম্ফের জঙ্গল পরিষ্কার করে নিতে পারেন। স্নান করার পরে আহার করতে করতে আপনার কথা শুনব। আমারও কিছু কথা বলার আছে আপনাকে।'

চকচকে পাথরের তৈরি আয়নাতে নিজের মুখ দেখে চমকে উঠল অগস্ত্য। নিজেকে সে চিনতেই পারছে না। গত কয়েক মাসে শরীর জলের স্পর্শ পায়নি। কারাগারের বদ্ধ কুঠুরির বাতাসে ওড়া ময়লা জমা হয়েছে মুখের উপরে, বুনো ঝোপের মতো বেড়ে উঠেছে দাড়ি-গোঁফ। তার ওপরে জল বুলিয়ে নিল সে। ঝিনুক দিয়ে তৈরি ক্ষুর স্পর্শ করল গাল।

অগস্ত্য যখন স্নানঘর থেকে বার হল তখন ইরতেনসেনু খাওয়ার আয়োজন করছিল। অগস্ত্যের কানের কুন্ডলির শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইল সে। সঙ্গে-সঙ্গেই একটি হৃদস্পন্দন যেন হারিয়ে গেল কোথায়। ভারতীয়দের কথা সে আগে অনেক শুনেছে। কিন্তু এই প্রথম কোন ভারতীয়কে এত কাছ থেকে দেখছে ইরতেনসেনু। অগস্ত্যর উচ্চতা ইরতেনসেনুর প্রায় সমান, চওড়া কাঁধ। শরীর পেশিবহুল না হলেও মেদ নেই তেমন। কোমল মুখটি শিশুসুলভ। দু'চোখের মণি নীল বর্ণ, এক আশ্চর্য দীপ্তি। এমন পুরুষে ইরতেনসেনু এই প্রথম বার দেখল। নিজের খেয়ালেই হারিয়ে গিয়েছিল সে, চমক কাটতে দেখল অগস্ত্য তাঁর উল্টোদিকেই বসে আছে, চেয়ে আছে ওর দিকে। ও কি বুঝতে পেরে গেল ইরতেনসেনুর মনের কথা? চট করে নিজের বিহ্বলতাকে কাটিয়ে ইরতেনসেনু বলল, 'আসুন অগস্ত্য। ভোজনে বসা যাক।'

অগস্ত্য ছাগলের মাংসের সুরুয়াতে মধু মেশানো রুটি ডুবিয়ে মুখে পুরল। আহা, এমন স্বাদু খাবার সে কতদিন পায়নি। এ জীবনে আর হয়তো পেতই না। কিন্তু এই নারী তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করল কেন? কী চায় সে?

'আপনি আমাকে চিনলেন কীভাবে?'

'রানির দরবারে আপনি যেদিন আসেন সেদিন সভাসদদের ভিড়ে আমিও ছিলাম। খানিকটা দূরে ছিলাম যদিও। তবে আপনাদের কথপোকথন শুনেছিলাম স্পষ্ট।'

'আপনাকে রানিই বললেন আমাকে মুক্তি দিতে?'

‘প্রথমত আপনি মুক্তি পাননি, বিশেষ কারণে আপনাকে কারাগার থেকে বার করে আনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রানি না, আমার কথায় আপনি আজ এখানে।’

তার মানে মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া এখনও তার ওপরে ঝুলে আছে! এমন কী আছে তার কাছে যা এই যুবতীর প্রয়োজন? তাহলে কাজ ফুরলেই কি তাকে আবার প্রক্ষেপ করা হবে সেই অন্ধকার কুঠুরিতেই? মেয়েটি যেন তার চোখের ভাষা পড়তে পারল। বলল, ‘আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি আপনাকে, আমি ইরতেনসেনু। রানি হাতসেপসুতের সভার প্রধান বৈজ্ঞানিক এবং কারিগর।’

‘আপনিই তাহলে দেশের উত্তরে বাঁধ তৈরি করেছেন! আপনিই রানির মন্দির তৈরি করছেন? সেই মন্দির আমি দেখেছি, অদ্ভুত তার গঠন শৈলী!’

অগস্ত্যের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রুটির একটি টুকরো মুখে পুরল ইরতেনসেনু, নিজ প্রশংসায় তার অস্বস্তি হয়। অগস্ত্যের মুখের কথা ফুরোচ্ছেই না।

‘আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না!’

‘কী?’

‘বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আপনিই সেই! আপনার নাম আমি আগে শুনিনি, কিন্তু আপনার আবিষ্কারের খবর ভারতেও ছড়িয়েছে। আপনার সঙ্গেই দেখা করার জন্য আমার এতটা পথ আসা। কিন্তু ভাবতে পারিনি যে একজন নারীর সঙ্গে আলাপ হবে আমার।’

‘মানে? আমার জায়গায় কোন পুরুষকে আশা করেছিলেন?’

ইরতেনসেনু সোজা হয়ে বসল। তার চোখে মুখে বিরক্তি ছাপ। অগস্ত্য তৎক্ষনাৎ বুঝল তার ভুল হয়েছে। যে দেশ থেকে সে আসছে সেখানে নারীকে তার যোগ্য সম্মান দিলেও জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে এখনও তাদেরকে পিছনেই রাখা হয়েছে। বিদর্ভের যে রাজার সভায় সে ছিল বিগত একবছর, সেখানেও পুরুষের আধিক্য লক্ষণীয়।

‘মাফ করবেন, এভাবে কথা বলা আমার উচিত হয়নি। আমার দেশে মাতৃরূপে শক্তির উপাসনা করা হয়। কিন্তু সমাজ পুরুষতান্ত্রিক।’

‘এই সমাজও পুরুষতান্ত্রিক অগস্ত্য। কিন্তু বিদ্যালাভের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের কোন তফাত করা হয় না। বুদ্ধিই একমাত্র মাপকাঠি এখানে।’

নিজের স্থূল চিন্তার প্রকাশে নিজেই লজ্জিত এখন অগস্ত্য। সে চুপ করে রইল।

‘থাক, এই নিয়ে আর আলোচনাতে গেলে আমাদের সম্পর্কের তিক্ততা বাড়বে বই কমবে না। সেটি এখন কাম্য নয়। কাজের কথায় আসি বরং।’

হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল অগস্ত্য। এই সুন্দরী বিদুষীর হাতে অপদস্থ হওয়ার সামনে মৃত্যুদণ্ডকেও আরামের মনে হচ্ছিল তার। ইরতেনসেনু বলল, ‘সেদিন আপনি রানিকে আপনার একটি আবিষ্কার দেখিয়েছিলেন মনে আছে?’

সেইদিনের কথা ভুলবে কী করে সে? ভোলা যায়?

‘মনে থাকাটাই স্বাভাবিক, আমি চেয়েছিলাম আমার দিক থেকে যদি কিছু দেওয়া যায় আপনাদের দেশকে। কিন্তু বিশ্বাস করুন রানিকে হত্যা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না! আমি বুঝতে পারিনি তিনি আমার হাত থেকে যন্ত্রটি কেড়ে নেবেন!’

‘দেখুন তো এটিকে চিনতে পারেন কী না?’

একটি ছোট বাক্স ইরতেনসেনু এগিয়ে দিলেন অগস্ত্যের দিকে। তার মধ্যে ছিল একটি ধাতব শলাকা, একটি চোঙা, আর শুকনো মাটির টুকরো। এদের চিনতে এক মুহূর্তও সময় লাগল না অগস্ত্যের। তার যন্ত্রের অংশগুলো!

‘দুঃখিত আমি, রানির হাত থেকে ছিটকে গিয়ে আপনার যন্ত্রটি ভেঙে যায়। পরে আমি এই টুকরোগুলিকে নিয়ে আসি।’

‘কিন্তু এগুলো তো কোনও কাজেই আসবে না আর ইরতেনসেনু।’

‘হুম, তা ঠিক। কিন্তু আমি বোঝার চেষ্টা করছিলাম যন্ত্রটি কী ভাবে কাজ করে। এ দিয়ে যে আপনি একধরনের শক্তি উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিলেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। সেই শক্তিই রানির শরীরে প্রবাহিত হয়। পরে রানি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হাত বেয়ে উঠছে। ঠিক যেমনটা হয় দেওয়ালের কোণে কনুই লেগে গেলে।’

‘আপনার অনুমান যথার্থ! এই যন্ত্রটি আমার বহু বছরের গবেষণার ফল! আমি চাইছিলাম এমন শক্তি উৎপাদন করতে যাকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা যাবে, প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। লোহা এই শক্তি পরিবহন করতে পারে। যন্ত্রের গায়ে একটি মাত্র ছোট অংশে তাই লোহা লাগানো ছিল, ভিতরে থাকা শক্তিকে বাইরে আনার একমাত্র দরজা। রানি অসাবধানতায় যন্ত্রের সেই ধাতব অংশে হাত দিয়ে ফেলেন। তাই তার মধ্যে দিয়েই শক্তি প্রবাহিত হয়। আমি যদিও জানতাম ওই সামান্য আঘাত কোনও মানুষের প্রাণ নিতে পারে না। আমি নিজেই গবেষণার সময়ে কত বার আহত হয়েছি ওই ভাবে।’

‘এই যন্ত্রের কোনও নকশা কি আপনি এঁকে রেখেছেন কোথাও?’

‘অবশ্যই, কিন্তু ধরা পড়ার পরে সেই পুঁথিটি আমি হারিয়ে ফেলেছি। তবে তাতে বিশেষ অসুবিধা নেই। এই যন্ত্রের নকশা আমার মস্তিষ্কে অটুট রয়েছে। এখনই এঁকে ফেলতে পারব।’

‘আমার ওই প্রকারের একটি যন্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু আকারে তার চেয়ে কিছুটা বড় হতে হবে। তা না হলে প্রয়োজনীয় শক্তি তৈরি করা সম্ভব হবে না।’

‘কিন্তু আপনি সেই যন্ত্র দিয়ে করবেন কী? সাবধান ইরতেনসেনু, ওই শক্তির অপব্যবহারে কিন্তু প্রাণহানির আশঙ্কা আছে!’

‘না, প্রাণ নেওয়ার জন্য নয়, বাঁচানোর জন্য চাই আমার এই যন্ত্রকে। আমার দেশের প্রাণ বাঁচাতে হবে।’

তারপরে কয়েকটি সপ্তাহ কেটে গেছে। ইরতেনসেনুর কাছে আগত বিপদের কথা শুনে অগস্ত্য আর কালক্ষেপ করেনি। যন্ত্রটি বানাতে সময় লাগছে বেশ, তার প্রধান কারণ উপকরণ সংগ্রহ। অগস্ত্যের বানিয়ে দেওয়া মাপ মতো স্থানীয় কুমোরকে দিয়ে একটি মাটির ছোট কলসি বানানো হয়েছে। তারপর তার মধ্যে রাখতে হবে তামা আর দস্তার পাত। তামা মিশরে সহজলভ্য, কিন্তু দস্তা নয়। তার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে কয়েক সপ্তাহ।



এই অবসরের সময়ে অগস্ত্য ইরতেনসেনুর কাছে শিখতে লাগল মিশরের পদার্থ এবং রসায়ন বিদ্যা, ইরতেনসেনু শিখতে লাগল অগস্ত্যের ভাষা। এই ভাষা না জানলে যে সে দেশের জ্ঞানের উপলব্ধি যথার্থ

হবে না তা বুঝেছিল ইরতেনসেনু। অরণ্যের গভীরে যেমন দুটি গুল্ম একে অপরের সাহচর্যে বেড়ে উঠে জন্ম দেয় অতুলনীয় পুষ্পের তেমনই এই দুই প্রাণও একে অপরের সংস্পর্শে এসে আরও বিকশিত হতে লাগল। দস্তা এল দেশের দক্ষিণের নুবিয়া অঞ্চল থেকে। নুবিয়ার রাজা রানি হাতসেপসুতের মিত্র এখন, তাই খুব অসুবিধা হল না। সেনেনমুত নিজে এসে দস্তা পৌঁছে দিলেন ইরতেনসেনুর কাছে।

'কী মনে হচ্ছে তোমার? আর কতদিন লাগবে? হাতে সময় কিন্তু আর মাত্র কয়েক দিন।'

'দস্তারই অপেক্ষা করছিলাম, যন্ত্রটি এবারে তৈরি হয়েই যাবে, ধন্যবাদ আপনাকে। রানিকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হতে বলুন।'

সেনেনমুতের প্রশ্ন ইরতেনসেনুর জন্য থাকলেও উত্তর দিল অগস্ত্য। তবে এখনও এই ভিনদেশিকে বিশ্বাস হয় না সেনেনমুতের।

মাটির কলসির মধ্যে রাখা হল তামা ও দস্তার পাত দুটিকে। তাদের মধ্যে দেওয়া হল কাঠের গুঁড়ো, যাতে দুই ধাতব পাত নিজেদের সংস্পর্শে না আসতে পারে। এরপরে অগস্ত্য হালকা নীল বর্ণের এক তরল রাসায়নিক যোগ করল সেই কলসিতে। ইরতেনসেনু জিজ্ঞাসা করল, 'এটি কী দিলে?'

'এটি একটি যৌগিক পদার্থ। এর নীল রঙকে খেয়াল করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'এই রঙের জন্য এর নাম আমি দিয়েছি ময়ূরের গ্রীবা। মানব শরীরের চিকিৎসাতেও এর ব্যবহার আছে। তোমায় বলব একসময় সেই কথা।'

মাটির কলসির মুখটি শুকনো খড় দিয়ে বন্ধ করতে করতে বলল অগস্ত্য। তামা আর দস্তার পাতের সামান্য অংশ শুধু বেরিয়ে রইল কলসির বাইরে।

'এখন এর পরীক্ষার সময়।'

বাইরে তখন সূর্য অস্ত গেছে। দেবতা আমুন-রা গমন করেছেন মাটির নীচে। গবেষণাগারের জানলা দরজা বন্ধ করল ইরতেনসেনু। জানলার সামান্য ফাঁকগুলিকেও খুব সাবধানে বন্ধ করে দেওয়া হল মোটা কাপড় দিয়ে। নিজের তৈরি গোলকটি এবারে বার করল সে। গোলকের ধাতব অংশের সঙ্গে লাগানো হল দুটি তামার তার, তাদের অন্য প্রান্তটি এনে একটিকে জোড়া লাগানো হল অগস্ত্যের বানানো যন্ত্রের তামার পাতের গায়ে। আরেকটি তারকে দস্তার পাতের সঙ্গে লাগানোর আগে ইরতেনসেনুর মুখের দিকে তাকাল অগস্ত্য। দুজনের চোখেই তখন সম্ভাব্য আবিষ্কারের আনন্দের সঙ্গে মিশে আছে বিফল হওয়ার আশঙ্কা। একটি, এই একটিই সুযোগ ইরতেনসেনুর কাছে নিজের দেশকে বাঁচাবার, আর একটিই সুযোগ অগস্ত্যের নিজের প্রাণরক্ষার।

দ্বিতীয় তারটি স্পর্শ করল দস্তার পাতকে।

থীবস শহর,

ওপেতের উৎসবের দিনে,

আকস্মিক সূর্যগ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গেই কার্নাকের মন্দিরের রাস্তায় যে শোভাযাত্রা চলছিল, তা দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার দু'পাশের জনস্রোত তখন দিশাহারা! এমন পবিত্র দিনেই আমুন-রা তাদের ত্যাগ করলেন! কিন্তু কেন? দেবতার পূজা তো মহা সমারোহে হচ্ছে। বছরের প্রথম শস্য তাঁকে সমর্পণ করা হয়, গৃহস্থ তাঁকে স্মরণ না করে মুখে অন্ন তোলে না। তাহলে কেন আমুন-রা মুখ ফিরিয়ে নিলেন? তবে কি তিনি চান না এক নারী দেশের ফারাও হোক? তিনি চান না তাঁর শক্তি প্রবাহিত হোক নারী শরীরের মধ্যে দিয়ে!

ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজন চিৎকার করে বলে উঠল, 'রানি অপয়া!'

এমন রব হতাশা আর ভয়ে বিহ্বল জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সংক্রামক ব্যধির মতো। এক থেকে দশ, দশ থেকে একশো জনের কণ্ঠে শোনা গেল একই আওয়াজ!

'রানি অপয়া!'

‘রানি অপয়া!’

অতর্কিতে ধেয়ে আসা বন্যার ঢেউয়ের মতো এই দুটি শব্দ এগিয়ে যেতে থাকল ভিড়ের মধ্য দিয়ে। তীব্র গতিতে আছড়ে পড়তে চাইল আমুন-রা শোভাযাত্রার উপরে।

তারপরে আচমকাই যেন তা মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। চরম বিশৃঙ্খলা হঠাৎই এক জাদুবলে পরিণত হল অপার স্তব্ধতায়। জাদুই তো! বিস্ফারিত চোখে সবাই দেখল থেমে থাকা শোভাযাত্রার মধ্য থেকে ফেটে বেরিয়ে আসছে এক উজ্জ্বল আলোর কিরণ! তার দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়!

আলোর উৎসটি মাটিতে নামিয়ে রাখা আমুন-রার বিগ্রহের সামনেই। স্বয়ং রানি হাতসেপসুত দু’হাতে মাথার উপরে ধরে রয়েছেন তাকে! রানির হাতে যেন জ্বলন্ত সূর্যই ধরা পড়েছে! এ কী করে সম্ভব! এ কি স্বপ্ন?

এই সূচি পতনের স্তব্ধতার মধ্যে ভরাট গলায় সেনেনমুত বলে উঠলেন, ‘দেবতা আমুন-রা স্বয়ং রানি হাতসেপসুতের স্বপ্নে এসেছিলেন। তিনি আমুন-রা এর নিজের সন্তান! তাঁর শক্তি তাই রানির মধ্যে দিয়ে বিকশিত হচ্ছে! রানি দু’হাতে ধরে আছেন মাটিতে নেমে আসা সূর্যের একটি টুকরোকে! থীবসের নগরবাসী, সাক্ষী থাকো এই অলৌকিক স্বর্গীয় ঘটনার! রানি নন, আজ থেকে উনি...।’

সেনেনমুতের মুখের কথা কেড়ে নিল সাধারণ মানুষ। আবার বন্যা বইল। এবারে সেই বন্যার অভিমুখ বিপরীত দিকে। গতি আরও তীব্র। জনসমুদ্রের গর্জনে ভেসে যেতে লাগল থীবস শহর। সেই কম্পনে যেন আলোড়ন উঠল শান্ত নীলনদের জলেও!

‘ফারাও হাতসেপসুত!’

‘ফারাও হাতসেপসুত!’

এতক্ষণ ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল এক জোড়া যুবক-যুবতী। তারা শ্বাস চেপে অপেক্ষা করছিল সূর্যগ্রহণের। রানি পারবেন তো সঠিক সময়ে তার দুটিকে কলসির দুটি পাতে লাগাতে? পারবেন নিজের বর্ণাঢ্য বস্ত্রের তলায় যন্ত্রটিকে লুকিয়ে রাখতে? রানি পেরেছেন! জিতে গেছেন হাতসেপসুত! জিতে গেছেন সেনেনমুত! জিতে গেছে এই যুবক-যুবতী। এখন তারা আলিঙ্গণাবদ্ধ। এই চরম আনন্দের প্রতিটা মুহূর্তকে শুষে নিচ্ছিল তারা।

ওপেতের উৎসব শেষ হওয়ার পরের দিন ফারাও হাতসেপসুতের সভায় তাঁর সঙ্গে দেখা করল অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু।

‘অগস্ত্য, তুমি আমার দেশকে বাঁচিয়েছ। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বলো তুমি কী চাও? যত সোনা, যত লোহা তোমার লাগে আমি দেব। তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছে দেবে আমার ব্যক্তিগত সেনারা।’

আজ অগস্ত্যের ফিরে যাওয়ার দিন। রানির কথা শুনে স্মিত হাসল সে, ‘আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই রানি, আমার আবিষ্কারকে একটি মহৎ কার্যে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার দেশে সোনা, লোহার কোনও অভাব নেই। আমার কোনও লোভও নেই ওতে। আমি অন্য কিছু চাইতে এসেছি আজ আপনার কাছে।’

‘বলো, নির্দ্বিধায় বলো। তুমি আমার দেশের বিজ্ঞানের পাঠ করবে বলেছিলে না? রাজ প্রাসাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় প্রবেশাধিকার আমি তোমায় দিলাম। আগে কখনও কোনও ভিনদেশির জন্য এর দ্বার খোলেনি। তুমি তোমার ইচ্ছা মতো প্যাপিরাসের পুঁথি নিয়ে যেতে পারো।’

‘আবারও ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। কিন্তু সেই পুঁথির যা জ্ঞান তার উৎসটিকে যদি চাই আমি, দেবেন?’

অগস্ত্যের এই কথা হাতসেপসুতের বোধগম্য হল না। এবারে মুখ খুলল ইরতেনসেনু। লজ্জা মাখানো স্বরে বলল, ‘আমারও একটি ইচ্ছা আছে। আমি অগস্ত্যের সঙ্গে তার দেশে যেতে চাই। বাকি জীবন কাটাতে চাই তার সঙ্গে।’

ফারাও হাতসেপসুত না বলেননি। অগস্ত্য আর ইরতেনসেনুর ইচ্ছা একই। দুই দুর্লভ মণি একে অপরকে খুঁজে পেয়েছে। এখন তাদের আলোয় আলোকিত হবে অন্য এক দেশ।

ভারতবর্ষ।



৪। লোপামুদ্রা

একশত বছর অপেক্ষা করতে হয়নি, দু'বছর অজ্ঞাতবাসের পর একদিন হঠাৎই অগস্ত্য উপস্থিত হন বিদর্ভের রাজসভায়। রাজা বসুমান সেদিন অবাক হয়ে দেখেন যে তাঁর মুখের শ্মশ্রুগুম্ফের ভার আর নেই, মাথার উপরে থাকা জটাটিও অদৃশ্য। সোনালি ধানের গায়ের রঙ আর চোখের উজ্জ্বল নীল বর্ণের মণি দেখে সেদিন রাজা চিনেছিলেন ঋষিকে। তবে তার শারীরিক চরিত্রের এই আমূল পরিবর্তন রাজাকে যত না অবাক করেছিল তার থেকেও বেশি অবাক করে অগস্ত্যের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীটি। সে যে-কোনওভাবেই ভারতবর্ষীয় নয় তা একবার দেখলেই বোঝা যায়।

সে লম্বায় অগস্ত্যের প্রায় সমান, গায়ের বর্ণ চন্দন কাঠের মতো। তার পরনে গাঢ় সবুজ বর্ণের একটিই কাপড়, কাঁধের থেকে শুরু হয়ে নেমে এসেছে হাঁটুর নীচ অবধি। তার বুকের কাছে লাল এবং হলুদ পাথরকুচির কারুকার্য। এই যুবতীর ত্বকের ঔজ্জ্বল্যে সেদিন রাজসভায় থাকা সবারই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পদ্মের পাতায় যেমন একবিন্দু জলও স্থির থাকতে পারে না তেমন মসৃণ যেন এই নারীর শরীর। দেবতা যেন অনেক সময় নিয়ে তৈরি করেছেন তাকে।

তবে সেই যুবতীর এত রূপও যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছিল তারই দু'চোখের কাছে এসে। হরিণীর মতো টানা টানা সেই দুটি চোখ, সবুজ তার মণিদুটি, তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে মেধার ঝলকানি সেদিন রাজা বসুমান স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। নিজের সাময়িক মূঢ়তাকে কাটিয়ে উঠে দু'বাহু সামনের দিকে এগিয়ে রাজগুরুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তিনি। অগস্ত্য হাসিমুখে সেই অভিবাদন গ্রহণ করে। সামান্য কুশলমঙ্গল বিনিময়ের পরে যেন রাজার অন্তরের প্রশ্নের ইতি ঘটানোর জন্যই অগস্ত্য এবার বলে, 'রাজন, দু'বছর আগে আপনাকে না জানিয়ে বিদর্ভ ত্যাগ করার জন্য আমি আগাম ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আমি শূন্য হাতে ফিরিনি। আপনি যদি রাজমহিষীকে এই সভায় আসতে অনুমতি দেন তাহলে আপনাদের দুজনের উপস্থিতিতে কিছু বলতে পারি।'

সাধারণত আর্যদের রাজসভায় নারীর স্থান নেই। তাদের বাস অন্তঃপুরে। মগধের রাজার এক স্ত্রী অস্ত্রচালনায় ভীষণই সক্ষম তা জানা যায়, তিনি নাকি কখনও কখনও রাজসভায় আসন গ্রহণ করেন। তবে ওই একটিই ব্যতিক্রম। রাজা ভৃত্যকে পাঠিয়ে রানি কঙ্কাবতীকে রাজসভায় নিয়ে এলেন। তিনি সভায় এসে রাজার পাশে দাঁড়িয়েই অবাক হলেন অগস্ত্যের পাশে থাকা যুবতীকে দেখে।

অগস্ত্য এবার বলতে লাগল, 'বৃক্ষ বড় হয়ে তার ছায়ায় আশ্রয় দেয় ক্ষুদ্রতম কীট এবং বৃহত্তম পশুকে। তার শাখাপ্রশাখায় বাসা বাঁধে পাখির দল। তারই কাণ্ড থেকে ঘর বানায় মানুষ, প্রবল শীতে বল্কলের আগুন তাদের শরীরকে উষ্ণ করে। এইভাবে সেই মহাবৃক্ষ সবার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিলেও তার নিজেরও কিছু ইচ্ছা থাকে। সেও চায় তার দেহে সুগন্ধী, রঙিন ফুল ফুটুক।'

এই কথায় রাজা এবং রানি একে অপরের দিকে একবার চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। অগস্ত্য বলে চলল, 'হে রাজা বসুমান, আপনার ক্ষমতা বলে আপনি এই বিদর্ভকে আজ ভারতবর্ষের এক অন্যতম সেরা রাজ্যে পরিণত করেছেন। আপনার ক্ষমাসুন্দর কিন্তু দৃঢ় চরিত্রের সুফল লাভ করেছে আপনার প্রজারা। রাজ্য জুড়ে শান্তির কোনও অভাব নেই, বিগত তিনদশকে একটিও বড় যুদ্ধের সম্মুখীন যে হতে হয়নি বিদর্ভকে তা শুধু মাত্র আপনার কূটনৈতিক বুদ্ধির কারণে।

কিন্তু আপনার এবং রানি কঙ্কাবতীর একটি ব্যক্তিগত ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গিয়েছে। সন্তানলাভের আশায় আপনি কত যজ্ঞ করেছেন, কোশলের বিখ্যাত রাজচিকিৎসক নিজে এসে রানিকে পরীক্ষা করেছেন এ কথা আমার অজ্ঞেয় নয়। কিন্তু এত প্রচেষ্টার পরেও সেই অপার্থিব সুখলাভ থেকে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছেন

আপনারা। রানি গর্ভধারণে সক্ষম নন, কিন্তু আপনি তার পরেও আর নতুন করে দারপরিগ্রহণ করেননি। ভারতবর্ষের অন্য রাজারা যখন অন্দরমহল একাধিক সুন্দরী নারীদের দ্বারা ভরিয়ে তোলার কাজে ব্যস্ত থেকেছেন তখন আপনি আপনার দিবারাত্র ব্যয় করেছেন প্রজাপালনে।'

এই কথায় রাজা বসুমান যেন সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। রাজসভায় নিজের সুখ্যাতি শুনতে অভ্যস্তই তিনি। কিন্তু এভাবে সোচ্চারে রাজগুরুর মুখে এমন গুণগান তাঁর আশাতীত ছিল। আবার রানির বন্ধ্যাত্বের কথা সবার সামনে এসে পড়াতেও বিচলিত তিনি। ঠোঁটে প্রশস্তিসূচক হাসি এনে তিনি অগস্ত্যকে বললেন, 'আপনার মুখনিঃসৃত এমন বাক্যেরা আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করছে মহর্ষি। আমি সামান্য রাজা, প্রজারাই আমার রাজত্বের আসল ঐশ্বর্য, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ আমার কর্তব্য বই আর কিছু তো নয়।'

সঙ্গে-সঙ্গেই রাজসভা ভরে উঠেছিল রাজার নামের সাধুবাদে। ডানহাত সামান্য উপরের দিকে তুলে সম্মিলিত সেই কণ্ঠ থামিয়ে রাজা আবার বলেছিলেন, 'মহর্ষি আপনি নিশ্চয় ক্লান্ত, আজ এই বেলা অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করুন, বিশ্রামের পর সন্ধ্যায় না হয় আমরা আবার আলাপ করব।'

এই কথা বলার সময়ও স্বাভাবিক কৌতূহলবশত রাজার দৃষ্টি ন্যস্ত ছিল অগস্ত্যের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীর দিকে। সেই যুবতীও যেন এক অজানা পরিবেশে এসে সামান্য বিব্রত বোধ করছে। তার উজ্জ্বল চোখ দুটি একবার রাজার চোখের উপরে পরেই আবার মাটির উপরে নিবদ্ধ হল। অগস্ত্য এবার বলল, 'সত্যিই আমি ক্লান্ত, তবে বিশ্রাম নেওয়ার আগে যে কথা বলার উপক্রম করেছিলাম তা শেষ করে নিই।

আপনার কর্মে আমি যারপরনাই প্রফুল্ল হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এবং রাজমহিষীর নিঃসন্তান হয়ে থাকা আমাকে পীড়া দিত। তাই আমি এক রাত্রে গৃহত্যাগ করে চলে যাই গহীন অরণ্যে। সেখানে ঘোর কঠিন তপস্যায় তুষ্ট করি দেবতা ব্রহ্মাকে। তিনি এই জগতের সৃষ্টি কর্তা, এই পৃথিবীর প্রথম প্রাণটি তাঁরই সৃষ্টি। ব্রহ্মা যখন আমার তপস্যায় খুশি হয়ে বর দিতে চান তখন আমি তাঁর কাছে এক মানবীকে প্রার্থনা করি, যে রূপে অদ্বিতীয়া, মেধায় যার সমকক্ষ এই ভূভারতে আর কেউ নেই।

দেবতা তখন অরণ্যের পশুপাখি, ফুলের সৌন্দর্য থেকে তৈরি করেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই যুবতীকে। বন্য প্রকৃতির অসামান্য সৌন্দর্য বিলীন হয়েছে এই নারীর মধ্যে। তাই এর নাম লোপামুদ্রা। একে আপনি কন্যা রূপে গ্রহণ করুন। আপনাদের এই কন্যাটি ভূভারতে বিদর্ভের নামকে আরও উজ্জ্বল করবে।'

অগস্ত্যের এই কথায় সভায় এক আশ্চর্য নীরবতার সৃষ্টি হল। মহর্ষি তার নিজ তপস্যা বলে রানির শূন্য গর্ভ ভরিয়ে দিয়েছে! রাজা এবং রানি দুজনেই একে একে রাজমণ্ডপ থেকে নেমে এসে প্রণাম করলেন অগস্ত্যকে। তাঁদের চোখে জল। মহর্ষি তাঁদের মনের সুপ্ত ইচ্ছাকে তার আশ্চর্য ক্ষমতায় সত্যি করল। এই অসামান্য যুবতী তাঁদের কন্যাসন্তান! রানি এবার অপত্যস্নেহে লোপামুদ্রাকে আলিঙ্গন করলেন।

যুবতী রাজা বসুমানের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রাজা। সভায় মহর্ষি অগস্ত্যের নামের স্তুতি হতে থাকল। তা থামলে পর অগস্ত্য একটি কথা বলল, যা রাজা এবং রানিকে আরও একবার অবাক করল। অগস্ত্য বলল, 'আরও একটি কথা আপনাকে জানাই রাজন, আগামী শুক্লপক্ষে আমি লোপামুদ্রাকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করব। সে হবে আমার ধর্মপত্নী। এমনই প্রজাপতি ব্রহ্মার ইচ্ছা।'

এই প্রস্তাবে রাজা বিন্দুমাত্র আপত্তি করেননি। প্রথমত স্বয়ম্ভু প্রজাপতির আদেশকে অমান্য করার কোন সাহস বসুমানের ছিল না, উপরন্তু অগস্ত্যের মতো মহামানবকে নিজের জামাতা হিসাবে পাওয়াটা ছিল তাঁর এবং রাজ-রানির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। দেবানুগ্রহে হয়তো মৃত্যুর পর স্বর্গবাসও সুলভ হবে এইবারে। একই দিনে এমন দুটি চমৎকার বসুমানের জীবনে আগে কখনও ঘটেনি।

সেই দিন থেকে বসুমান জানেন যে অগস্ত্য ভগবানের অংশবিশেষ। হেন কোনও কর্ম হয়তো নেই যা তার দ্বারা অসম্ভব। তাই অগস্ত্য যখন পয়োষ্ণী নদীর গতিপথ বদল করার অভিপ্রায় জানাল তখনই রাজা সানন্দে তাতে সায় দিলেন। শুরু হল এক বৃহৎ কর্মকাণ্ড। রাজ্যের বিভিন্ন কোণ থেকে খুঁজে আনা হল এক হাজার

শ্রমিককে। এদের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। এদের প্রত্যেকের বয়স ত্রিশের কম, তারুণ্যের উচ্ছলতায় পরিপূর্ণ এদের হৃদয়।

প্রতিটি শ্রমিকের দেহ সৌষ্ঠব দেখার মতো, যেন এক হাতের পাঞ্জায় তাদের এক-একজন এক-একটি নিমবৃক্ষকে উপড়ে আনতে পারে। এই কাজের সফলতার পিছনে মুখ্য উপাদান দুটি। তাদের একটি হল শারীরিক শক্তি, যা পূরণ করবে এই হাজার শ্রমিকের এবং পঞ্চদশহস্তির দল। অন্যটি হল মেধা। এই দুটি উপাদানই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিদর্ভের সেরা দুই মস্তিষ্ক একসঙ্গে এই কাজে ব্রতী হল। তাদের একটি অবশ্যই অগস্ত্যের, অন্যটি রাজদুহিতা লোপামুদ্রার।

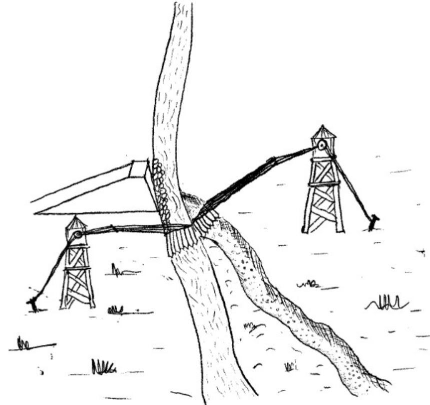
৫। পয়োষ্ণী

ইরতেনসেনু এখন এই ভারত ভূখণ্ডের কন্যা। মিশর ছেড়ে আসার সময় সে জানত হয়তো আর কখনও তার ফিরে আসা হবে না। ভারতবর্ষের অভিমুখে দীর্ঘ যাত্রাপথে অগস্ত্যের মুখে এই দেশের এবং বিদর্ভের অনেক গল্প শুনেছে ইরতেনসেনু। সেই দিনগুলির মধ্যেই দ্রুত রপ্ত করেছে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলা। ব্রাহ্মী হরফ পড়তে এবং তা ব্যবহার করে লিখতে যদিও তার সময় লেগেছে আরও কিছু মাস। তবে তা সে নিশ্চিন্তে করতে পেরেছে রাজ অন্তঃপুরে। রানি কঙ্কাবতী শিখিয়েছেন।

ভারতভূমি যে এভাবে তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাবে তা সে আশা করেনি। তবে এর পিছনে অগস্ত্যের বুদ্ধি আছে। ভিনদেশি তরুণীকে রাজ-ঋষি তার পত্নী রূপে গ্রহণ করছে এ ভারতীয়রা মেনে নিত কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল অগস্ত্যের মনে। তাই সে গহীন অরণ্যে তপস্যা এবং ব্রহ্মার বরের আশ্চর্য কাহিনির সৃষ্টি করে। এতে তার আকস্মিক নিরুদ্দেশকে একটা কারণ দেওয়া গেল এবং ইরতেনসেনুকেও তার পক্ষে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করাটা সহজ হল। ধর্মপ্রাণ রাজা বসুমান অগস্ত্যের অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ তো ছিলেনই। তাই বন্য হরিনী লুপ্ত হয়ে লোপামুদ্রার জন্মের আখ্যানকে বিশ্বাস করতে তিনি বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করেননি। রাজা এবং রানি দুজনেই তাকে আপন করে নিয়েছিলেন।

ইরতেনসেনু রানির কাছে শিখেছে কেমন ভাবে ভারতীয় মেয়েরা কাঁচুলি এবং শাড়ি পরে, কেমন ভাবে তারা স্নানের আগে চন্দনের প্রলেপে নিজেদের অঙ্গ চর্চিত করে। চন্দন বস্তুটি ইরতেনসেনুর কাছে একেবারেই নতুন। কোন এক গাছের কাণ্ড থেকে যে এমন সুরভিত দ্রব্য তৈরি হতে পারে তা তার জানা ছিল না। ভারতীয়দের খাদ্যরীতিও তাকে অবাক করে। ছাগ এবং শূকরের মাংসের সঙ্গে সে পূর্ব পরিচিত ছিলই, কিন্তু মিশরে তারা প্রধানত মাংসকে কাঠকয়লার আগুনে পুড়িয়ে খায়। অপূর্ব সেই নরম মাংসের স্বাদ। ভারতীয়রা সেই মাংসই নানা প্রকার মশলা সহযোগে মাটির তৈরি হাঁড়িতে রান্না করে, তার স্বাদও অতুলনীয়।

এই দেশের মানুষ মিষ্টান্নও প্রচুর পরিমাণে খায়, প্রতিটি খাবারের শেষ ভাগে কোনও না কোনও প্রকারের মিষ্টান্ন থাকবেই। ইরতেনসেনু খাদ্যরসিক। সে প্রায় দিনই নতুন নতুন খাবার আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হয়, আবার একই সঙ্গে নিজের দেশের ভুট্টার রুটি এবং নীলনদের পাড়ে জন্মানো নলিশাক ভাজার কথা মনে পড়ে তার। সুগন্ধি দ্রব্য এবং সুস্বাদু খাদ্য, এই দুই হল ইরতেনসেনুর দুই দুর্বলতা। একদিন দারুণ সুস্বাদু ময়ূরের মাংস খেতে খেতে সে মিশরের ভাষাতেই বলে উঠেছিল, ‘হো হুন্দিহাসে!’



অতি উত্তম!

এই বলেই সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। কী ভাগ্য যে তখন তার আশেপাশে তেমন কেউ ছিল না। যে পরিচারিকাটি খাবার পরিবেশন করছিল সেই শুধু অবাক চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। ঈশ্বরসৃষ্ট কন্যাটি প্রথমবার কোন ভাষা শিখছেন, তাই তার মুখে নড়বড়ে প্রাকৃত ভাষা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু অন্য দেশের একটি ভাষা কীভাবে সেই জিহ্বা থেকে উদ্গত হল তার ব্যাখ্যা করাটা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হতো বই কী। বর্তমানে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশরের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ভালোই চলে। তাই রাজ অন্তঃপুরের কোন কর্মচারী বা দাসীর এই ভাষাকে চিনতে পারলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাই ইরতেনসেনু এই ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকে।

সেইসঙ্গে তার মনে এক দোলাচলও আনাগোনা করে। এইভাবে কি সে দুটি মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে না? রাজা বসুমান এবং রানি কঙ্কাবতী তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপরিচয় হয়েও তাকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। আবার অন্যদিক থেকে ভাবতে গেলে ইরতেনসেনুও তাদের সন্তানের অভাবকে দূর করেছেন, রাজা তার আসল পরিচয় না জেনে যে অমলিন আনন্দ পাচ্ছেন তারই বা তুলনা কীভাবে হয়। এই ভেবে ইরতেনসেনু সামান্য আশ্বস্ত হয়।

নিজের উপাস্যদেবী হাথোরকে উদ্দেশ্য করে সে বলে, ‘হে দেবী, আমায় ক্ষমা করবেন। জানবেন, এই মিথ্যার আড়ালে এই মানুষ দুটিকে প্রতারিত করার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। অগস্ত্যকে আমি ভালোবেসেছি, তাকে স্বামী রূপে গ্রহণ করেছি। তার সঙ্গেই আমার বাকি জীবন অতিবাহিত করতে চাই, তাই এই দেশের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল আমার।’

তখনই যেন নিজের মনেরই অন্য আরেকটি অংশ বলে ওঠে, যেন দেবী হাথোরই বলেন, ‘আর এই দেশবাসীর কথা কি ভেবেছ তুমি? যারা বিনা দ্বন্দ্বে তোমাকে নিজের করে নিয়েছে, যে দেশের মাটি তোমাকে ধারণ করছে, বায়ু তোমাকে প্রাণময় করছে, খাদ্য তোমার উদরপূর্তি করছে, সেই দেশের এই ঋণ কীভাবে চোকাবে তুমি?

ইরতেনসেনু নিজের অন্তরের এই প্রশ্নের উত্তরে বলে, ‘এই পর্বত প্রমাণ ঋণ মেটানোর ক্ষমতা তো আমার নেই, কিন্তু এই দেশকে আমার জ্ঞাত যা কিছু তাই দেব আমি। নীলনদের মাটিতে বাস করে, সেই বায়ু সেবন করে, থীবসের গ্রন্থাগারে এবং আমার নিজের গবেষণাগারে বহু দিবারাত্রি কাটিয়ে যে জ্ঞান আমি আহরণ করেছি তাই দিয়ে এই দেশের সেবা করব আমি।’

সেই সুযোগও অচিরেই উপস্থিত হয়েছিল, যখন কোনও এক সন্ধ্যায় বিশ্রাম করার সময়ে অগস্ত্য ইরতেনসেনুকে জানায় যে সে রাজা বসুমানকে কথা দিয়েছে পয়োষ্ণী নদীর গতিপথ বদলানোর চেষ্টা সে করবে। এমন এক ভাবনায় সেদিন ইরতেনসেনু অবাকই হয়েছিল। নদীর গতিপথ যে বদলে দেওয়া সম্ভব তা সে কখনও ভাবেনি। পূর্বে এমন কখনও ঘটেছে বলেও তার জানা নেই। সে বলেছিল, ‘বিজ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু এমন দুরূহ কাজ করার বিদ্যা কি তোমার আয়ত্ত অগস্ত্য?’

‘না, এমন বিদ্যার কথা আমি নিজেও কখনও শুনিনি। তবে আমার ধারণা কাজটা আমি পারব। এ ব্যাপারে ভাবনা শুরু করি তিনবছর আগে। সেই সময় কিছু নকশাও এঁকেছিলাম। কিন্তু তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমার অন্য যন্ত্রটির কাজে যার মধ্যে কৃত্রিম ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। সেই কাজ করতে করতে আরও জ্ঞান আহরণের জন্য এই দেশ ত্যাগ করে হাজির হয়েছিলাম তোমার দেশে।’

স্মিত হেসে ইরতেনসেনু বলল, ‘ভাগ্যিস এসেছিলে, সেই কলসটি না থাকলে আমার তৈরি আলোকযন্ত্রটিও কাজ করত না!’

‘হ্যাঁ! ভাগ্যিস আমি পৌঁছেছিলাম সেই দেশে, তা না হলে আজ এমন রূপে মহালক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী নারীটিকেও আমার পত্নী রূপে পেতাম না!’

এমনটি বলেই অগস্ত্য হেসে ফেলল, তার এই রসিকতায় ইরতেনসেনুও খিলখিল করে হাসতে লাগল। আরও ঘন হয়ে এল অগস্ত্যের কাছে। রানি কঙ্কাবতীর কাছে পুরাণের বহু গল্প শোনার কারণে দেবী

মহালক্ষ্মী ও সরস্বতীর নাম তার অজ্ঞাত নয়। খানিক পরে সে বলল, 'তাহলে বিজ্ঞানী মহাশয়, নকশা যখন তৈরিই আছে তখন কাজ শুরু করতে আর দেরি করা কেন?'

নকশা অগস্ত্য সত্যিই তৈরি করে রেখেছিল। দুটি বাঁধের নকশা। বাঁধ দুটি তৈরি হবে শাল কাঠের গুঁড়ি দিয়ে। তবে বাঁধের আগে নদীর তীরে অজস্র দৈত্যাকৃতির পাথর বহন করে নিয়ে আসা প্রয়োজন। পয়োষ্ণী নদীর দু'তীর পাথুরেই, কিন্তু সেই নুড়ি আকারে ছোট। অগস্ত্য চায় বড় আকারের অজস্র প্রস্তরখণ্ডদের ধীরে ধীরে নদীর ডানদিকে জমা করতে। এতে প্রবাহে বাধা পেয়ে নদীর গতিপথ সংকীর্ণ হবে, এর কারণে নদীতে স্রোত আরও বেড়ে যাবে, সেই স্রোতের উপরে তৈরি করা হবে প্রথম বাঁধটিকে।

কিন্তু অগস্ত্যের কাজ শুরুর পিছনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই পাথরগুলি। বিন্ধ্য পর্বত থেকে হাতির দল দিয়ে টানিয়ে সেই শত সহস্র প্রস্তরখণ্ডগুলিকে সমতলে নামাতে সময় লেগেছিল প্রায় ছয় মাস। গজের দল পাথরগুলিকে নদী থেকে প্রায় দুশো হাত দূরে এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল, বাকি পথ ছিল তাদের কাছে অগম্য। সেই পথ যে ছোট-বড় ডিম্বাকৃতি নুড়িতে ভরা। সেই নুড়িগুলি বড়ই আলগা। মানুষ চলতে সক্ষম হলেও বিশালাকৃতি হাতি তার উপর দিয়ে কোনও ভাবেই স্বচ্ছন্দে চলতে পারবে না। তাই তাদের দিয়ে টানিয়ে পাথরগুলিকে নদীতে এনে ফেলা ছিল একপ্রকার অসম্ভব।

হাতিগুলিকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য এবং পিছন থেকে ঠেলা দেওয়ার জন্য শ্রমিকদেরও আসতে হতো। একটি হাতিরও অসাবধানতায় পা পিছলে গেলে মারাত্মক প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। মহাভাগ অগস্ত্যের এই মহান কর্মকাণ্ডে যোগ দিয়ে সহস্র কর্মঠ যুবক নিজের শ্রম দান করছে স্বেচ্ছায়। তাদের অন্তরে হয়তো দেবানুগ্রহের সুপ্ত বাসনা রয়েছেই, তাই হয়তো তাদের প্রবৃত্ত করেছে এই কর্মে।

কিন্তু তাদের একজনেরও ক্ষতি অগস্ত্য মেনে নিতে পারবে না। বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে মানুষকে আরও উন্নত জীবন দেওয়ার জন্য, যদি তার অন্যথা হয় তবে তার অর্থ সেই বিজ্ঞান হয় যথেষ্ট কার্যকরী নয় অথবা তার অপব্যবহার হচ্ছে। নিশ্চয়ই এমন কোন উপায় আছে যার দ্বারা এই পাথরগুলিকে অপেক্ষাকৃত সহজে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া যায়। সেই উপায় অগস্তের অজ্ঞাত।

তবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিন্তু ইরতেনসেনুকে দু'দণ্ডও ভাবতে হয়নি। সে বলেছিল, 'তোমার জ্ঞান কখনও কখনও আমার মনেও ঈর্ষা জাগায়। তোমার এক একটি আবিষ্কার এই দেশে তোমাকে প্রায় ঈশ্বরের সমান সম্মান এনে দিয়েছে। সেই আবিষ্কারগুলির জটিলতা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু এখন যে সমস্যায় তুমি পড়েছ আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে সেই সমস্যার সমাধান করেছিল আমাদের দেশের মানুষ।'

এই কথোপকথনের কয়েকদিন পরে পয়োষ্ণী নদীর বুকে ভাসতে দেখা গেল দশটি বেশ বড় আকারের নৌকাকে। নৌকার খোল বোঝাই করে তারা নদীগর্ভের কাদামাটি নিয়ে এল। নদীর ডানদিকের পাড়ে কাঠ এবং বাঁশের তৈরি বেশ চওড়া পাটাতন তৈরি করা হল, সেই পাটাতনটি মাটি থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত উঁচুতে। পাটাতনের উপরিভাগ কয়েক হাত সমতল হওয়ার পর তা মাটির দিকে কৌণিক ভাবে নেমে এল এবং জমিয়ে রাখা বিশালাকৃতি পাথরগুলির কাছে এসে মাটি স্পর্শ করল। সেই দীর্ঘ ঢালু পাটাতনের উপরে চাপানো হল কাদামাটির প্রলেপ।



সেই মাটি শুকিয়ে গেলে এক মসৃণ তলের সৃষ্টি হল। এরপর তার উপর দিয়ে ভারী পাথরগুলিকে টেনে আনতে লাগল শ্রমিকের দল। তাদের পায়ে থাকা চর্ম-পাদুকার নীচে লাগানো হল ছোট ছোট পাথর কুচি। এর ফলে তাদের পক্ষে সেই মসৃণ ঢালু পথ আরোহণ করা অনেক সহজ হল। শ্রমিকের দল প্রতিদিন ঢালু পথ বেয়ে পাথর টেনে এনে পাটাতনের শেষ প্রান্ত থেকে নীচে বয়ে চলা নদীতে ফেলতে লাগল, সশব্দে নদীর বুকে আছড়ে পড়তে থাকল তারা। সেই আওয়াজ কখনও কখনও আশেপাশের ছোট ছোট পাহাড়গুলির গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত চারপাশের গ্রামগুলিতে। গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে বলত, ওই শোনো, অগস্ত্য মুনির মহাকর্মযজ্ঞ চলছে।

এইভাবে নদীর এক অংশকে পাথর দিয়ে ভরিয়ে দিতে সময় লাগল একটি বছর। তারপর চলল নদীর উপরে বাঁধ তৈরির কাজ। সেই সঙ্গে কিছু শ্রমিক নদীর বামদিকের পাড় থেকে প্রায় দু'ক্রোশ দূরে একটি গভীর এবং চওড়া নালা খনন করে চলল, সেই স্থান বর্তমান নদীর পাড়ের মতো নুড়ি বিকীর্ণ নয়। পাথর ফেলে নদীর গতিপথ সঙ্কীর্ণ করে দেওয়ার জন্য যে তীব্র স্রোতের সৃষ্টি হল তার বিপরীতে শক্তপোক্ত বাঁধ দুটি তৈরি করতে সময় লাগল আরও দুটি বছর।

পনের দিন আগে সেই বাঁধ তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রাজ জ্যোতিষী শুক্লদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে মকর সংক্রান্তির এই পুণ্য তিথিটিকে স্থির করা হয়েছে এক আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী হওয়ার জন্য।

বড় পবিত্র আজকের দিনটি। আজকের দিনে সূর্য উত্তরায়ণে যান, ছয় মাস রাত্রিবাসের পর দেবতাদের দিবাযাপন শুরু হয়। আবার আজকের দিনেই বিষ্ণুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে নির্গত গঙ্গা ভগীরথের পিছন পিছন কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছন। কপিল মুনির আশ্রম থেকে সাগরে মিশে যান তিনি। সে সময় গঙ্গা ভগীরথের পূর্বপুরুষ মহারাজ সগরের পুত্রদের মুক্তি প্রদান করেন। আজ কোন পুণ্য কাজ করলে তা অক্ষয় হয়, তাই আজকের দিনটিকেই বেছে নিয়েছিলেন রাজজ্যোতিষী শুক্লদেব। এখন সেই মুহূর্ত আগতপ্রায়।

মহর্ষি অগস্ত্য কি পারবেন পয়োষ্ণীর গতিপথ বদলে দিতে?

নদীর বাঁ-দিকের তটের কাছে অগস্ত্যকে দেখা যাচ্ছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পায়চারি করতে। শেষ বারের মতো সব কিছুর তদারকি করে নিচ্ছে সে। ইরতেনসেনু আছে নদীর অপর প্রান্তে। একটি অশ্বের পিঠে উঠে সে ছুটে চলেছে নদীর তীর বরাবর, সেই প্রান্তের কাজ দেখে নিচ্ছে। একসময় ইরতেনসেনু থামল, তারপর ঘোড়াটিকে ঘুরিয়ে আবার পিছনের দিকে এল যেখানে বাঁধ দুটি নির্মিত হয়েছে। কোনও এক অলৌকিক জাদুবলে বাঁধ দুটি তৈরি করেছেন অগস্ত্য। দুটি বাঁধ পরস্পরের সঙ্গে কৌণিকভাবে অবস্থিত।

ইরতেনসেনু আর একবার দেখে নিল নদীর উপরে থাকা বাঁধটিকে, সেটি এখন নদীর উপরিভাগ থেকে কিছু হাত উপরে ঝুলছে। এই কাজটি সম্ভব হয়েছে এক আশ্চর্য যন্ত্রের জন্য। যন্ত্রটি অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনুর যুগ্ম মেধার ফল। কুড়িটি ভারী এবং মোটা দড়ি বাঁধের উপরের প্রান্তে বাঁধা। সেই দড়িগুলি এসে মিশেছে দশটি দড়িতে, সেই দশটি দড়ি এসে মিশেছে পাঁচটি দড়ির সঙ্গে। এই পাঁচটি দড়ি উপরের

দিকে উঠে গেছে, তারপর মাটি থেকে প্রায় শতহস্ত উপরে একটি কাঠের তৈরি মিনারের উপরে থাকা গোলাকৃতি একটি যন্ত্রের গা বেয়ে উঠে এসে আবার নীচের দিকে নেমে এসেছে তারা। দড়িগুলির এই প্রান্তগুলিকে টেনে মাটির গভীরে গেঁথে রাখা বলিষ্ঠ লৌহকীলকের গায়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

অন্য বাঁধটি রয়েছে নদীর বাঁ-পাশের তীরের উপরে। একটি গভীর খাদ নির্মাণ করে তার উপরে প্রোথিত করা হয়েছে এই বাঁধটিকে। শ্রমিকরা যে চওড়া নালাটি খনন করছিল তা শেষ হয়েছে এই বাঁধটির ঠিক পিছনে এসে। অগস্ত্য দাঁড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তে। ইরতেনসেনু তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পদাতিক সৈন্যটিকে চোখের ইশারা করল। সৈন্যটি তার হাতে ধরা শিঙায় ফুঁ দিল এবারে। রণক্ষেত্রে শত্রুর উপরে আক্রমণের আগে এই শিঙা বাজানোর রীতি, তবে আজ তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে ধ্বংসের জন্য নয়, বরং এক নতুন সৃষ্টিকে ঘোষণা করার জন্য।

আশেপাশের ছোট পাহাড়ের গায়ে যে সহস্র মানুষ আজ এসে জড়ো হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কানে গিয়ে পৌঁছল এই শিঙার আওয়াজ। এতক্ষণ অপেক্ষা করার পরে যারা সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল তারাও এবার স্নায়ু টানটান করে তাকিয়ে রইল বাঁধের দিকে।

শিঙার আওয়াজ কানে পৌঁছতেই অগস্ত্য পিছনে ফিরে তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিকটিকে বলল, ‘প্রস্তুত থাকো।’

নদীর অন্য প্রান্তে এবার ইরতেনসেনুর নির্দেশে লৌহকীলক থেকে দড়িগুলিকে খুলে ধীরে ধীরে নদীর উপরে বাঁধটিকে নামাতে লাগল শ্রমিকেরা। প্রবল গুরুগুরু শব্দ করে বাঁধটি নদীর বুকে প্রোথিত হল। গতিপথ আচমকাই রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে নদী যেন ভীষণই ক্রুদ্ধ। ইরতেনসেনু দেখল নদীর স্রোত তীব্রবেগে আছড়ে পড়ল বাঁধের গায়ে। সেই স্রোত প্রবল আক্রোশে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলতে চাইল বাঁধটিকে।

সামান্য যেন নড়ে উঠছে বাঁধটি, কিন্তু মহাশালের গুঁড়ি দিয়ে এমনই অদ্ভুত কারিগরী দক্ষতায় বানানো বাঁধটি যে নদীর বারংবার মুষ্টাঘাতেও তার গায়ে সামান্যতম চিড়ও ধরছে না। নদীর ধর্ম এই যে সে সদাপ্রবাহমান থাকতে চায়, বাধা পেয়েই সে খুঁজে নিতে লাগল অন্য একটি পথ। নিমেষে নদীর জল কুল ছাপিয়ে প্রবল বেগে আছড়ে পড়ল পাশে কোনাকুনি ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা অন্য বাঁধটির উপরে। যেন এক বন্দি দৈত্য ভয়ঙ্কর আস্ফালনে আঘাত করছে কারাগারের দেওয়ালে। তার আওয়াজে মাটি কেঁপে উঠল। অগস্ত্য এইবার বলল, ‘এখনই সময়! শুরু করো!’

প্রথম বাঁধটির মতো দ্বিতীয় বাঁধটির উপরের অংশেও একই রকম ভাবে দড়ি বাঁধা। সেই দড়িগুলিও নদীর বাঁ-পাশের একটি মিনারের উপরে রাখা যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। দড়িগুলির অন্য প্রান্ত বাঁধা আছে পাঁচটি গজের গায়ে। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মতো তাদের আকার। তাদের পিঠের উপরে বসে থাকা মাহুতের ইশারায় তারা এবারে নদীর বামপাড় থেকে উল্লম্ব কোণে হাঁটতে লাগল। প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বাঁধটি এবার যেন সদ্য ঘুম ভাঙা দানবের মতো নড়ে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকল।

অগস্ত্য ইতিমধ্যে মিনারের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। সামান্য ফাঁক পেতেই পয়োষ্ণী নদী তীব্রবেগে সামনের দিকে বইতে শুরু করল। নদীর স্রোত বাঁধ আর ভূমির ফাঁক দিয়ে এসে পড়ল আগে থেকে তৈরি করে রাখা সেই গভীর এবং প্রশস্ত নালাতে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে গুমগুম শব্দ করে নতুন খাতে বইতে লাগল পয়োষ্ণী।

তখনই এমন এক ঘটনা ঘটল যার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। নালাটিকে বেশ চওড়া করেই কাটা হয়েছিল। তবু নদীর স্রোত সেই নালা ছাপিয়ে বইতে শুরু করল। অগস্ত্য যে মিনারের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল তা নতুন প্রস্তুত নালাটি থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল মিনারের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল শনের কাঠির মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল মিনারটি! মিনারের চূড়া অগস্ত্যকে নিয়েই প্রকাণ্ড শব্দ করে এসে পড়ল স্রোতস্বিনী নদীর উপরে। অপর

প্রান্তে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে ঘটনাটি দেখছিল ইরতেনসেনু। সে ভয়ে বিহ্বল হয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘অগস্ত্য!’



ইরতেনসেনুর গলার আওয়াজ নদীর প্রবল গর্জনে মিলিয়ে গেল। সে কি তবে তার গতিপথ রুদ্ধ করার প্রতিশোধ নিতে চায় পয়োষ্ণী? দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জনগন বিস্মিত চোখে হাহাকার করে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে কাতর আকুতি জানাতে লাগল তারা, ‘হে ঈশ্বর! মহর্ষি অগস্ত্যকে রক্ষা করুন!’

এই আকস্মিক কাণ্ডের বিহ্বলতার মধ্যে একটি ঘটনা সবার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। মিনারের চূড়াটি নদীতে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এক যুবক ঝাঁপ দিয়েছিল নদীর জলে। প্রবল স্রোতের মধ্যেও যেন অতি অবলীলায় সাঁতরে চলল যুবকটি। কয়েক পলের মধ্যেই দেখা গেল তাকে, সাঁতার কেটে নদীর পাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে সে। নদীর তীরে এসে যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন তার কোলে অচৈতন্য অবস্থায় অগস্ত্য। চিৎকার করে সে বলল, ‘রাজবৈদ্যকে খবর দাও! শীঘ্র!’

বলেই সে অগস্ত্যকে মাটিতে শুইয়ে দু’হাতের তালু দিয়ে তার বুকে ক্রমাগত চাপ দিতে লাগল। কয়েকবার চাপ দিয়েই সে নিজের মুখ অগস্ত্যের মুখে লাগিয়ে শ্বাস দিতে লাগল, তারপর আবার বুকে চাপ দিতে লাগল, তারপর আবার শ্বাস...এইভাবে কয়েক বার করার পর হঠাৎই অগস্ত্যর নাক মুখ দিয়ে অনেকটা জল বেরিয়ে এল। পরক্ষণে ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। সামনে বসে থাকা যুবকটিকে দেখে সে বলল, ‘উপল!’

ততক্ষণে তাদের চারপাশে ভিড় জমে গেছে। এবার উপলের দিকে নজর গেল জনতার। উপলের বয়স অগস্ত্যের মতো। তবে তার চেহারা অগস্ত্যের প্রায় দ্বিগুণ। সে উচ্চতায় সাড়ে তিন হাত লম্বা, তার কাঁধ এতটাই চওড়া যে অনায়াসে দু’জন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ বসতে পারবে দু’কাঁধে। কাঁধ থেকে নীচের দিকে নেমে এসেছে সুসংহত পেশিবহুল শরীর। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ পাতলা জামায় আবৃত ছিল, জলে ভিজে সেই জামা গায়ের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। গায়ের রং অগস্ত্যরই মতো, সোনালি ধানের বর্ণ। অগস্ত্য অবাক চোখে উপলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি কবে এলে?’

‘ফিরেছি দু’দিন আগে, বন্দরে নেমেই শুনলাম ঋষিরাজ অগস্ত্য নাকি অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটাতে চলেছেন পয়োষ্ণী নদীর তীরে। কী সেই কাণ্ড তা আর বুঝতে বাকি ছিল না। দু’জনে কত প্রহর কাটিয়েছি এই আলোচনায়। তাই এক দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে চলে এলাম চাক্ষুস দেখার জন্য। এসে দেখি তুমি ব্যস্ত, তাই তোমাকে আর বিরক্ত না করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম কার্য সমাধা হতেই তোমাকে জড়িয়ে ধরব, তা যে এই ভাবে হবার সে কী আর তখন বুঝতে পেরেছিলাম!’

এবার দুই বন্ধু হো-হো করে হেসে উঠল। উপল আবার বলল, ‘তোমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে অগস্ত্য, চেয়ে দেখ!’

সত্যিই পরপর এতগুলি ঘটনার মধ্যে যেন ক্ষনিকের জন্য অগস্ত্য ভুলতে বসেছিল তার এখানে এই অবস্থায় থাকার কারণটিকেই। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে মিনারটি ভেঙে গেল, তারপরই জ্ঞান হারায় সে। তারপর কী হল? পয়োষ্ণী কি সব কিছুকে তছনছ করে দিল? কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজ তো আর শোনা যাচ্ছে

না। অগস্ত্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষেরা এখন তারই নামে জয়ধ্বনি করছে, তাদের মধ্যেও তো কোন প্রকার বিরূপতা চোখে পড়ছে না।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল অগস্ত্য। যা দেখল তাতে তার চিত্ত এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠল। তার সামনেই কুলুকুলু ধ্বনিতে নতুন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে পয়োষ্ণী! অগস্ত্য পেরেছে নদীকে মানুষের কাছে আনতে! বির্দভবাসীদের জলকষ্ট এবার চিরতরের জন্য মিটে যাবে! নদীগাত্রে একটি নৌকাকে দেখতে পেল অগস্ত্য। দ্রুত দাঁড় বেয়ে সেই নৌকা তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

নৌকার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইরতেনসেনু। এতদূর থেকে তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সে নিশ্চয়ই চিন্তিত। অগস্ত্যকে পড়ে যেতে দেখেই সে এই পাড়ে আসতে শুরু করেছে। সে কি এখন অগস্ত্যকে দেখতে পেয়েছে? অগস্ত্য দু'হাত মাথার উপরে আন্দোলিত করে ইরতেনসেনুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সঙ্গে সঙ্গে ইরতেনসেনুও তার ডানহাত নাড়াল। অগস্ত্য মুখের দু'পাশে দুই তালু নিয়ে এসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'আমরা পেরেছি ইরতে...!'

নাহ, ক্ষনিকের জন্য নিজের পারিপার্শ্বকে ভুলে যাচ্ছিল সে। হাজার জোড়া চোখ এখন তাকে দেখছে। নিজেকে মুহূর্তে সামলে নিয়ে আবার চিৎকার করে অগস্ত্য বলল, 'আমরা পেরেছি লোপামুদ্রা! আমরা পেরেছি!'

৬। আগন্তুক

জয় প্রজাপালক রাজা বসুমানের জয়!

জয় মহর্ষি অগস্ত্যের জয়!

রাজপ্রাসাদের বাইরের প্রাঙ্গণে জমা হওয়া মানুষের জয়ধ্বনি প্রাসাদের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। প্রাসাদের দ্বিতলের প্রশস্ত অলিন্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজা বসুমান ও রাজমাতা কঙ্কাবতীদেবী, অগস্ত্য, ইরতেনসেনু এবং উপল। উপল জীবিকায় বণিক। বছরের বেশির ভাগ সময় তার কাটে সমুদ্রে। সে রাজানুগ্রাহী নয়। কিন্তু অগস্ত্যের সঙ্গে উপলের বন্ধুত্ব অচ্ছেদ্য। তারা দু'জনে একসঙ্গে এসেছিল বিদর্ভে। রাজা বসুমান উপলকে পছন্দ করেন। প্রশস্ত স্কন্ধের এই যুবকটি যেমন বলশালী তেমনই সাহসী এবং বুদ্ধিমান।

সম্প্রতি উপলের একার প্রচেষ্টাতেই সুদূর অসিরি দেশের সঙ্গে বিদর্ভের বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়েছে। উপল গতবছর বাণিজ্যের শেষে সেই দেশ থেকে এক অদ্ভুত সুন্দর রত্ন এনে দেয় রাজাকে। তার বর্ণ গাঢ় সবুজ-নীল। রাজা রত্নটির নাম রেখেছেন নীলকণ্ঠ। এখন যে উষ্ণীষটি পরে আছেন তাতে শোভা পাচ্ছে রত্নটি। এর বিনিময়ে বসুমান উপলকে পুরস্কার দিতে চাইলে সে নম্র স্বরে তা প্রত্যাখ্যান করে। বলে, 'সমুদ্রেই আমার সংসার রাজন। আমার তরণীটি আমার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের স্থান। বছরের বেশিরভাগ দিন আমার সেখানেই কাটে, আমার ব্যক্তিগত সৌখিনতা বলতে সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের প্রতি দুর্বলতা। বিদর্ভের মাটিতে যেটুকু সময় কাটাই তাতে সেই সৌখিনতা যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণ করে আপনার পাকশালার রাঁধুনীরা। আমার এই মুহূর্তে তেমন কিছুই চাই না। যদি কখনও কিছুর প্রয়োজন হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপনার দ্বারস্থ হব।'

উপল বিদর্ভে থাকলে অগস্ত্যের সঙ্গে তার গৃহে আশ্রয় নেয়। রাজপ্রাসাদে তার যাতায়াত অবাধ হলেও তাকে সাধারণত অন্তঃপুরে দেখা যায় না, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় রন্ধনশালার মধ্যেই উদরপূর্তি করে সে ফিরে যায়। তবে আজ বসুমান তাকে প্রায় জোর করেই এই অলিন্দে নিয়ে এসেছেন। সে বিদর্ভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্নটিকে আজ রক্ষা করেছে, নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও। এবারেও তাকে পুরস্কৃত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন রাজা। সে বলেছে, 'অগস্ত্য আমার ভাই, আমি বিপদে পড়লে সেও একই ভাবে ওই উন্মত্ত স্রোতে ঝাঁপ দিত আমাকে বাঁচাবার জন্য। এই কাজের বিনিময়ে আমি পারিতোষিক গ্রহণ করলে মহাপাপ হবে।'

তবে আজ উপল রাজার অপর অনুরোধটি ফেলতে পারেনি। প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হওয়া জনসমষ্টির অভিবাদন গ্রহণের পর অন্তঃপুরের ভোজনকক্ষে আজ সে যোগ দেবে রাজা, রানি, অগস্ত্য এবং লোপামুদ্রার সঙ্গে। ক্ষণিক আগেই তাদের আলাপ হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য তাকে একা পেয়ে সব কথা খুলে বলেছে অগস্ত্য। এই দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর মধ্যে গোপন কিছুই নেই।

অগস্ত্যের কথা শুনে আওয়াজ করে বেশ খানিকক্ষণ হেসেছিল উপল। কৌতুক করে বলেছিল, 'হে ঋষি অগস্ত্য, আপনি ধর্মীয় শ্লোক আর গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি কাল্পনিক কাব্য রচনাতেও মনোনিবেশ করতে পারেন তো। নাম করবেন বেশ! তা ভালো, সহধর্মিনীটি তোমার অতীব সুন্দরী এবং বিদুষী। তার বুদ্ধির পরিচয় তো এই বাঁধ নির্মাণের কথাতেই শুনলাম তোমার কাছে। এই মেয়েই হয়তো এবারে তোমাকে গার্হস্থ্যের পথে নিয়ে যেতে পারবে।'

ইরতেনসেনুকে বেশ পছন্দ হয়েছে উপলের, ক্ষনিকের আলাপে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে দু'জনে। তবে এখানে সবার সম্মুখে তাকে লোপামুদ্রা নামেই ডাকছে সে। এখন তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে

ইরতেনসেনু, তার বাঁ-পাশে অগস্ত্য। রাজা এবং রানি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের সামান্য আগে।

বসুমান এবং অগস্ত্যের নামে ক্রমাগত জয়ধ্বনি চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর অগস্ত্য কয়েক পা এগিয়ে এল। নিজের ডানহাত সামনের দিকে এগিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে জয়ধ্বনি স্তব্ধ হল। গলার স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে অগস্ত্য এবারে বলল, 'আপনাদের ধন্যবাদ। রাজা বসুমানের সম্মতি এবং রাজকোষের অনুগ্রহ ছাড়া এই কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। তবে এই কাজের সম্মান প্রাপ্তির অধিকার আরও যাদের আছে তারা হল সেই সহস্র শ্রমিক যারা এখন তাদের কুটিরে শ্রান্ত দেহে বিশ্রাম করছে, আপনারা তাদের নামে জয়ধনি করুন।'

প্রাসাদ প্রাঙ্গনে এবার শ্রমিকদের নামে স্তুতির রোল উঠল। তা থামলে পর অগস্ত্য আবার বলল, 'একজন মানুষের দান এখনও আপনাদের অগোচরে রয়ে গেছে। সে না থাকলে এই প্রকাণ্ড কর্মযজ্ঞ শুরু করা যেত না। তার বুদ্ধিতেই দৈত্যাকার প্রস্তরখণ্ডগুলিকে নদীর তীর অবধি টেনে আনা সম্ভব হয়েছিল। সে আর কেউ নয়, আমার স্ত্রী, রাজকন্যা লোপামুদ্রা।'

ক্ষনিকের জন্য স্তব্ধতায় ছেয়ে গেল প্রাসাদপ্রাকার। বিদর্ভের মন্দিরে শিবের পাশাপাশি শক্তির পূজা হলেও প্রকাশ্যে কোনও নারীর নামে জয়গান গাওয়া হয়নি কখনও। রাজকন্যা লোপামুদ্রার অনির্বচনীয় রূপের পাশাপাশি অসীম গুণেরও অধিকারিনী! তার বুদ্ধি রাজগুরু অগস্ত্যের সমতুল্য। যোগ্য ধর্মপত্নী তিনি বটে!

জয় রাজকন্যা লোপামুদ্রার জয়!

জয় রাজকন্যা লোপামুদ্রার জয়!

কয়েক সহস্র মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে রাজদুহিতার জয়ধ্বনি হতে লাগল। বসুমান পিছন ফিরে তাকালেন ইরতেনসেনুর দিকে। সেই দৃষ্টি স্নেহ এবং গর্ববোধের অনুভূতিতে জারিত। ইরতেনসেনু রাজার দিকে তাকিয়ে সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে তাঁকে প্রণাম জানাল। তারপর প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার দিকে তাকাল। তার চোখ আনন্দে ঝলমল করছে। তার মন চলে গেল কয়েকশো যোজন দূরে থাকা নীলনদের দেশটির কাছে। তার নিজের দেশ, যে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করেছিল।

সামনে থাকা জনস্রোতের মধ্যে যেন তার দৃষ্টি আর স্থির হয়ে রইল না। সে দেখতে পেল সহস্র বছর আগে মরুভূমির বুকে ঘটে যাওয়া এক আশ্চর্যকে। মাটির সঙ্গে কৌনিক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা পাটাতন বেয়ে ভারী ভারী পাথর উপরের দিকে টেনে তুলছে শ্রমিকেরা। তৈরি হচ্ছে ফারাও খুফুর সমাধি। মাটি থেকে কয়েকশো হাত উপরে থাকা সেই সূচিমুখ সমাধিটি বর্তমানে এই পৃথিবীর এক অন্যতম আশ্চর্য।

ইরতেনসেনু নতুন কিছু আবিষ্কার করেনি। সহস্র বছরের পুরোনো এক জ্ঞানকে শুধুমাত্র ব্যবহার করেছে ভারতবর্ষের মাটিতে। তার দেশ মিশরের জন্য মন কেমন করতে লাগল। ক্ষনিকের জন্য সে ভুলে গেল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অগস্ত্যের কথা, প্রাঙ্গণের জনতার কলরবের কথা। কেমন আছে তার ফেলে আসা গবেষণাগারের সঙ্গীসাথীরা? কেমন আছেন রানি হাতসেপসুত? তিনিও তো এক নারী হয়ে নিজের বুদ্ধিবলে মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, আদায় করে নিয়েছেন দেশের মানুষের সম্ভ্রম। সেই দেশেও তো মন্দিরে মাতা হাথোরের পুজো হয়, যেমন এদেশে হয় মা শক্তির আরাধনা। কিন্তু সমাজে নারীর জায়গা কি পুরুষের সমান? তা যে নয় ইরতেনসেনু জানে।

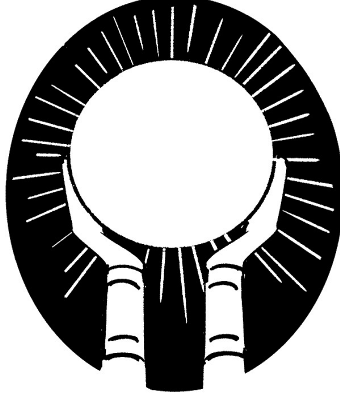
এই বিপুল জনস্রোতের মাঝে এমন মেয়ে বেশ কিছু আছেই যারা হয়তো মেধায় তার সমকক্ষ, অথবা তার চেয়েও অধিক তীক্ষ্ণ তাদের বুদ্ধি। কিন্তু শিক্ষার আলো থেকে তারা বঞ্চিত, তাই এই পুষ্পগুলি কোনদিন বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে না। ইরতেনসেনু চায় এমন এক পৃথিবী যেখানে নারী পুরুষের ভেদাভেদ নেই। যেখানে নিজের মেধার পরিচয় দেওয়ার জন্য সমাজের উচ্চকোটির সুবিধাপ্রাপ্তির প্রয়োজন হবে না তার মতো। মনে মনে এই তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে সে সামান্য লজ্জিতই হয়। তার মন আবার চলে যায় মরুভূমির দেশটায়। মিশরে সে মেয়েদের একটি শিক্ষালয় তৈরি করেছিল। সেটি আছে এখনও? রাজধানী থীবসের মেয়েরা এখনও যায় সেখানে?

এমনটা ভাবতে ভাবতে আকাশের পানে তাকিয়ে ছিল ইরতেনসেনু। হঠাৎই তার নজর গেল আকাশের গায়ে লেগে থাকা একটি বিন্দুর দিকে। বিন্দুটি যেন চক্রাকারে ঠিক রাজপ্রাসাদের মাথার উপরে ঘুরছে। ইরতেনসেনু চিনতে পারে পাখিটিকে। বাজপাখিটিও নিশ্চয়ই অত উপর থেকেও চিনতে পেরেছিল ইরতেনসেনুকে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার কারণে তার ডানায় ক্লান্তি জমেছে।

সে এখন ধীরে ধীরে মাটির দিকে নেমে আসছে।

৭। প্রশ্ন

রাতে ভোজনের পর বিশ্রামকক্ষে বসেছিলেন বসুমান, অগস্ত্য এবং উপল। উপল আজ আর ফিরে যাবে না, এই রাতটুকু সে রাজ আতিথ্য গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। তার কারণ অবশ্যই অগস্ত্য। ইরতেনসেনুকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার পর থেকে অগস্ত্য রাজপ্রাসাদের একটি মহার্ঘ্য কক্ষে থাকে। দীর্ঘ এক বছর সমুদ্রযাত্রার অনেক কথা উপলের বুকে জমা হয়ে আছে। তা সে বন্ধুকে বলতে চায়।



আজ রাতে তাই দুই বন্ধু একান্তে গল্প করে কাটাবে। এখন তারা রাজার সঙ্গে অষ্টপদ নামের এক খেলায় ব্যস্ত। এই খেলাটি বেশ আকর্ষণীয়। একটি তালপাতায় একটি বর্গক্ষেত্র আঁকা আছে। আবার একে ভাগ করা হয়েছে মোট চৌষট্টিটি খোপে। এর মধ্যে আটটি করে খোপ অনুভূমিক ভাবে রয়েছে এবং আটটি উল্লম্বভাবে। দু'জন এই খেলা খেলতে পারে।

এখন রাজা এবং উপল খেলছে, অগস্ত্য পাশে বসে আছে। বসুমানের কাছে আছে চারটি গাঢ় বাদামি বর্ণের নুড়ি এবং উপলের কাছে আছে চারটি সাদা নুড়ি। এইগুলি এই খেলার ঘুঁটি। পালা করে তিনটি চ্যাপ্টানো গোলাকার পাথরের টুকরোকে হাতের মধ্যে নিয়ে ঝাঁকিয়ে তালপাতার উপরে ফেলছেন তারা দুজনে। এগুলি পাঞ্জা। পাঞ্জা তিনটির একদিকে কালো রঙ করা।

তালপাতার উপরে পড়ার পরে এই দিকটি উপরে থাকলে প্রতি পাঞ্জা পিছু প্রতিজনের ঘুঁটি দু'পা করে সামনের দিকে এগোয়। তালপাতার বর্গক্ষেত্রগুলির উপরে দাগ করা আছে। দাগগুলি বৃত্তাকারে ঘুরে এসে শেষ হয়েছে কেন্দ্রে থাকা চারটি বর্গে। দুই প্রতিযোগীর ঘুঁটিগুলি এই দাগ লক্ষ করে কেন্দ্রের দিকে এগোতে থাকে। কোন একটি বর্গে একটি ঘুঁটি অপরটির উপরে এসে পড়লে ঘুঁটিকে ফিরে যেতে হয় আবার প্রথম বর্গক্ষেত্রে। আবার কিছু বর্গে দাগ কাটা আছে।

এগুলিকে দুর্গ বলা হয়। এই দুর্গে দুটি ঘুঁটিই নিরাপদ অবস্থায় থাকতে পারে। যার চারটি ঘুঁটিই প্রথম কেন্দ্রে পৌঁছবে সে এই খেলায় জিতবে। একসময় উপল পাঞ্জার এক চালে তার একটা ঘুঁটিকে রাজার একটি ঘুঁটির বর্গে রেখে দিয়ে বলল, 'এবারে আপনাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে রাজন, আপনার তিনটি ঘুঁটি কেন্দ্রে পৌঁছলেও এটি বেশ বেগ দিচ্ছে। এত সহজে জিততে দেব না আপনাকে।'

খেলার ছকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন বসুমান, বললেন, 'আপনি চতুর বটে। কোন পথে এসে যে খেলায় বাজিমাত করলেন আমি বুঝতে পারলাম না। আপনার খেলা দেখে আমার বিশ্বাস হয়েছিল আপনি নিজের ঘুঁটিগুলিকে বাঁচানোর জন্য এগোবেন। কিন্তু দেখলাম সেটি ছিল ছলনামাত্র।'

‘বিশ্বাস বড় বিষম বস্তু রাজা। বিশ্বাসের বলে মানুষ গিরি লঙ্ঘন করে। আবার বিশ্বাসের ফাঁদে পড়ে সে সর্বস্ব খোয়াতেও পারে। তার তুলনায় এই খেলায় বিশ্বাসের হার তো তুচ্ছ।’

‘এ কথা ঠিক বলেছেন। আপনার দেওয়া চালগুলি আমি মনে রাখার চেষ্টা করব। এই খেলাটি আরও কিছুক্ষণ চলুক নাকি?’

উপল সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নেড়ে আবার অষ্টপদের ঘুঁটিগুলির দিকে তাকাল। অগস্ত্য এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে তাদের খেলা দেখছিল। রাজা এবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি মহর্ষি?’

‘অবশ্যই, নির্দ্বিধায় করুন।’

‘প্রশ্নটা করতে দ্বিধাবোধ তো হচ্ছেই। তবে প্রশ্নটি আমার মনে বেশ কয়েক বছর হল জাগ্রত হয়েছে। বহুবার ভেবেছি জিজ্ঞাসা করব কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে অনধিকারচর্চা হয়ে যাবে। আজ আর নিজেকে সংবরণ করতে পারব না বলে মনে হচ্ছে।’

অগস্ত্য সামান্য হেসে আবার বলল, ‘বলুন রাজন, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। এই ঘরে আপনি আর উপল ছাড়া তো আর কেউ নেই। আপনি বলুন কী জানতে চান। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার।’

রাজা বসুমান এবারে সামান্য দ্বন্দ্বভরা কণ্ঠেই বললেন, ‘আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন অগস্ত্য? সত্যি করে বলুন তো?’

অগস্ত্য এ হেন প্রশ্নে অবাক হল। একেবারেই প্রস্তুত ছিল না সে। অগস্ত্য বলল, ‘ঈশ্বরে বিশ্বাস আমি করি রাজা, কিন্তু এমন প্রশ্ন আপনার মনে এল কেন?’

‘আপনাকে আমি আজ প্রায় সাত বছর ধরে চিনি, মাঝের দু’বছর বাদ দিলে পাঁচ বছর আপনি বিদর্ভে বাস করছেন। আপনি ঋষি, আপনার জ্ঞান অন্তহীন। কিন্তু এই রাজ্যের বাকি কিছু ঋষিদেরকেও আমি চিনি, তাদের আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক আমি। সেইসব শান্তির স্থানে সময় কাটাতে আমার ভালো লাগে। তাই সপ্তাহের দু’দিন কোনও একটি আশ্রমে কয়েক দণ্ড সময় ব্যয় করি আমি। আমি দেখেছি সন্ন্যাসীদের দিনের একটি বড় অংশ ব্যয় করতে দেবতার আরাধনায় এবং তপস্যায়। তাঁরা কৃচ্ছ্রসাধন করেন, ফলাহারেই ক্ষুধার নিবারণ করেন, মাছ-মাংস খেতে দেখি না তাদের।

‘কিন্তু আপনাকে আমি কোনওদিন দেখিনি কোনও দেবতার পূজা করতে। আপনি এই কুন্দিনাপুরীর মহাদেবের মন্দিরে কোনদিন যাননি, এই প্রাসাদের দেবালয়েও নাকি কেউ কখনও দেখেনি আপনাকে। আপনাকে বেশিরভাগ সময় নিজের গবেষণাগারে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। আপনি বলেছিলেন ব্রহ্মার উদ্দেশে তপস্যা করে লোপামুদ্রাকে পেয়েছেন। লোপামুদ্রা আমার অমূল্য রত্নসমা কন্যা, আমার চোখের মণি সে। আপনার কর্মের প্রতি সন্দেহ পোষণ করার কোন অভিপ্রায় আমার নেই। কিন্তু আমি কোনওদিন আপনাকে প্রজাপতির স্তুতি করতেও দেখিনি। আজ সকালে প্রজারা যখন এই বিদর্ভের আরাধ্য দেবতা মহাদেবের নামে জয়ধ্বনি করছিল তখন তাতে আমিও গলা মিলিয়ে ছিলাম। কিন্তু খেয়াল করেছিলাম আপনি চুপ ছিলেন। সেই সময়ে আমার মনে প্রশ্নটি আবার উদয় হল। আপনাকে অপদস্ত করার কোন অভিপ্রায় আমার নেই জানবেন।’

অগস্ত্য খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। রাজার এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সে? আবার একটি মিথ্যা বলবে? সে একবার উপলের দিকে তাকাল। উপল নিজের মনে অষ্টপদের ছকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন একা একাই নিজের মনের মধ্যে খেলাতে ব্যস্ত সে, রাজার প্রশ্নটি তার কর্ণগোচর হয়নি। সামান্য রাগ হল অগস্ত্যের।

উপল সব জানে, এমন অপ্রীতিকর অবস্থায় সে কি পারত না কোন এক অজুহাতে এই আলোচনার স্রোতকে ঘুরিয়ে দিতে? তার চতুর বুদ্ধিতে কি এটা সম্পূর্ণই অসম্ভব ছিল? অগস্ত্য নিজের মনের মধ্যে

একটি উত্তরকে তৈরি করে নিল। তারপর বলল, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী রাজা। লোপামুদ্রার সৃষ্টি ঈশ্বরের আশীর্বাদে, আমার তপস্যার ফলে। কিন্তু আমি ঈশ্বরকে নিজের মনের মধ্যে কল্পনা করি, তাই মন্দিরের বিগ্রহ পূজার প্রয়োজন আমার হয় না। আমার আরাধনার ধরণটি অন্যরকম। আমি বিজ্ঞানের পূজা করি।'

'বিজ্ঞান বিষয়টি আমার কাছে অজ্ঞেয় মহর্ষি। আপনি নিজেই আমাকে আগেও বলেছেন যে আপনার অলৌকিক কর্মকাণ্ড আসলে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফল। কিন্তু প্রকাশ্যে আপনি এই নিয়ে চুপ থাকেন। আমাদের পুরাণের গল্পে দেবমাহাত্মের যে আশ্চর্য গল্প শুনে আমরা বড় হয়েছি তাদের সবকটিকেই কি বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়? আপনার কি মনে হয় ধর্মের তুলনায় বিজ্ঞান বেশি শক্তিশালী? তাহলে ধর্মের প্রয়োজনই বা আর কী?

'না, ধর্মই বিজ্ঞানের তুলনায় শক্তিশালী, আমি তাই মনে করি।'

'আপনার তাই যদি মনে হয় তাহলে আপনাকে কখনও তো দেখি না ধর্মের উপাসনায় সময় ব্যয় করতে। আপনি ধর্মে বিশ্বাসী?'

এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা অগস্ত্যর ছিল না। সে বলল, 'বিজ্ঞানের রহস্য আপনার অজ্ঞেয় বললেন রাজা। বিজ্ঞান আসলে এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এক পদ্ধতি। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে চিনে তাদের মানব কল্যানের কাজে লাগানো হল বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।'

'তাহলে আপনি কখনও সর্বসমক্ষে বলেন না কেন যে আপনার অলৌকিক কর্মকাণ্ডগুলি আসলে কোনও দৈবশক্তিতে নয়, বিজ্ঞানের ফলে ঘটে!'

'বলি না, কারণ আমি চাই যে মানুষ দৈবে বিশ্বাসী হোক।'

রাজা বসুমান এবারে দৃশ্যতই অবাক হলেন, বললেন, 'কেন? এমন ভাবনার কী কারণ?'

অগস্ত্য এবার শান্ত স্বরে বলল, 'দেখুন রাজন, বিজ্ঞানচর্চা এখনও ভারতবর্ষে সেই ভাবে ব্যপ্তি লাভ করেনি। বিদ্যালয়ে ছাত্ররা গুরুর থেকে যে শ্রুতি পাঠ করে তার মধ্যেও বিজ্ঞানের পাঠ নেই। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা সেই ভাবে জন্মায়নি। অন্যদিকে দেশের মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী। এই ধর্ম কিন্তু বয়সে তরুণ। মাত্র কয়েক শত বছর আগে এর জন্ম হয়েছে। ধর্ম মানুষকে বেঁধে রাখতে সাহায্য করে। ধর্মের বলে সমাজ তৈরি হয়, সমাজ থেকে তৈরি হয় রাজ্য। আপনার এই রাজত্ব আপনি শাসন করলেও আদতে কুন্দিনাপুরীর মহাদেবের মন্দির এই রাজ্যের ভরকেন্দ্র।

মানুষ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, ভয় পায় কারণ সে তাঁদের অপরিসীম ক্ষমতার গল্প শোনে। আপনি ক্ষণিক আগে বিশ্বাসের কথা বললেন, ভারতবর্ষের মানুষের এই ধর্মবিশ্বাসের এখন একান্ত প্রয়োজন। আমি আজ অবধি যত আপাত অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছি তার সবই বিজ্ঞানপ্রসূত। কিন্তু জনগন তাকে দৈবের আশীর্বাদ ভেবে থাকলে আমি তাদের আটকাইনি। এই ভাবনা তাদের ঈশ্বরচিন্তাকে আরও দৃঢ় করেছে।

এই সমাজের ভবিষ্যত এতে আরও শক্তিশালী হবে। বিজ্ঞান এখন সদ্যজাত শিশু গাছ, সে নিজের জল হাওয়ায় ধীরে ধীরে বেড়ে উঠুক না হয়। একদিন সে বৃক্ষে পরিণত হবে, ততদিনে ধর্ম মহীরূহের আকার ধারণ করবে। তখন হয়তো এই দেশের মাটির ভাগ পাওয়ার জন্য ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের যুদ্ধ হবে। তবে সেই সময় আগামী সহস্র বছরেও আসবে বলে আমার মনে হয় না।'

অগস্ত্যের এই উত্তরে বসুমান চুপ করে রইলেন। তার যুক্তি যে অকাট্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানে বিশ্বাসী হলে তারা ধর্ম, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রশ্ন করতে শুরু করবে। ধর্মের গতি বায়ুর মতো অবাধ, সমাজের যে কোন স্তরের মানুষের কাছে তা পৌঁছে যেতে পারে। অন্যদিকে বিজ্ঞান একটি অচেনা পুষ্পের মতো। তার সুগন্ধ সবাই পাবে বটে, কিন্তু সেই গন্ধের উৎসের সন্ধান অগস্ত্যের মতো কিছু মহামানবই করতে পারবেন। অগস্ত্যকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না রাজা।

আরও কিছুক্ষণ খেলার পরে রাজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে প্রাসাদের দ্বিতলের লম্বা দালান দিয়ে হাঁটতে লাগল অগস্ত্য এবং উপল। তাদের বাঁ দিকে সারি দিয়ে ঘর, ডানদিক উন্মুক্ত। সেখানে বেশ বড় একটি

উদ্যান আছে। এখন রাত্রি কত তা বোঝা দুস্কর। দালানের স্তম্ভগুলির গায়ে যে মশালগুলি জ্বলে তাদের আগুন কমে এসেছে। বাইরের আকাশের চাঁদের আলো দালানে এসে পড়েছে। চারদিন আগে পূর্ণিমা ছিল, এখন চন্দ্র পুরো গোলাকার নয়। যেন গাঢ় নীল আকাশের আগে কোন অপটু কারিগর একটি অসমান রূপার থালা তৈরি করেছেন। থালার আশেপাশে অসমঞ্জস্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাবে লেগে রয়েছে আরও কিছু রূপার বিন্দু। কোনও এক অদৃশ্য উৎস থেকে আলো এসে তাদের ওপর পড়ায় সেই বিন্দুগুলি ঝিকমিক করে উঠছে। ওইগুলি আকাশের তারা।

জ্যোতির্বিদ্যায় অগস্ত্যর আগ্রহ আছে, তবে আকাশের তারাদের নিরীক্ষণ করার জন্য অমাবস্যার রাত আদর্শ। উপল একবার পিছন ফিরে দেখল রাজার কক্ষটিকে। বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে তারা, এখান থেকে রাজার কক্ষ থেকে নির্গত আলো ক্ষীণ ভাবে দেখা যাচ্ছে। এবার যেন সামান্য নিশ্চিন্ত হয়েই নিজের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা কৌতুকবোধকে আর ধরে রাখতে পারল না উপল। বাম হাতে মুখ চেপে হাসতে হাসতে অগস্ত্যের পিঠে চাপড় মারল সে। অগস্ত্য মুখে ছদ্মরাগ দেখিয়ে বলল, 'কী ভাই, খুব মজা পেলে তো আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখে।'

'মজা পাব না! আমি তো হাসি চেপে রাখতেই পারছিলাম না। শেষে মনে মনে দেড়টি মাস আগের এক ঝড়ের রাতের কথা ভাবতে লাগলাম, মাঝ সমুদ্রের বিষম ঢেউয়ের মধ্যে কোনক্রমে নিজের নৌকাটিকে ভাসিয়ে রাখছি। সেই ভয়ানক মুহূর্তের কথা ভেবে কোনওরকমে হাসি আটকালাম, না হলে রাজার সামনে একটা বিশ্রি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। তা ভাই, তুমি কিন্তু বেশ ধুরন্ধর ব্যক্তি, কীভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে সেটা শেখবার মতো বটে!'

'হ্যাঁ! ভাবিনি এমন প্রশ্নের সামনে আমাকে কখনও পড়তে হবে। রাজা যে আমার গতিবিধির উপরে নজর রাখছেন সেটা বুঝতে পারলাম।'

'হ্যাঁ, তবে আমি এতে অবাক হইনি। হয়তো তোমার নিরাপত্তার জন্যই কোন দেহরক্ষী গোপনে তোমার ওপরে নজর রাখে সর্বদা। একে তুমি রাজগুরু, তার উপরে রাজার জামাতা।'

'হুম, সেটাই হবে। মনে হয় না রাজা আমার উপরে কোন সন্দেহ করেছেন।'

'একদমই করেননি, এই বিদর্ভে আসার পর তুমি এই রাজ্যকে এত কিছু দিয়েছ যে রাজা তোমার মন্দিরে না যাওয়ার ভাবনা নিয়ে খুব বেশি কালক্ষেপ করবেন না। তবে আমার মনে হয় মাঝে মাঝে তোমার উচিত মন্দিরগুলোতে যাওয়া, মাসে অন্তত একবারের জন্য হলেও। এতে রাজার মনে যদি নূন্যতম সন্দেহও তৈরি হয়ে থাকে, তার নিরসন হবে।'

'তুমি জানো উপল, এ আমি পারব না। তুমি নিজেও কি পারতে? আমার নিজের বিশ্বাসকে আমার নিজের কাছে অটুট রাখতেই হবে। ওইটুকু আমার একান্ত ব্যক্তিগত। এই দেশে আসার পর কম মিথ্যের আশ্রয় তো আমাকে নিতে হয়নি। তোমাকেও অনেকবার সত্যের পথ ত্যাগ করতে হয়েছে। আমি নিশ্চিত এর জন্য আমার মনের মধ্যে যতটা গ্লানি আছে ততটাই তোমার মনেও আছে। আমার যতটুকু জ্ঞান তাই দিয়ে সমাজের কল্যানের চেষ্টা করি। তোমার বাণিজ্যতরী কতবার এই ভূখণ্ডে ঐশ্বর্য বয়ে নিয়ে এসেছে। আমরা এই ভারত ভূমির কোনও ক্ষতিসাধন তো করিনি। আমার নিজের ঈশ্বরের প্রতি অটুট বিশ্বাস আমার শেষ সম্বল, তাঁকে আমি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। আমাকে তুমি মন্দিরে যেতে বোলো না।'

উপল সামান্য গম্ভীর মুখে বলল, 'জানি বন্ধু, তোমার সঙ্গে মজা করছি বটে, কিন্তু জানি তোমার মনের মধ্যে কী চলছে। অতটুকু গোপনীয়তা রক্ষা করতে তুমি আর আমি বদ্ধপরিকর। আজ যদি রাজা আমাকে প্রশ্নটা করতেন তাহলে আমি চলচ্ছক্তিহীন প্রস্তরে পরিণত হতাম, আমার মুখ থেকে কোন কথা সরত না। তুমি বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে এনে যেভাবে কথাটাকে এড়িয়ে গেলে তা সত্যিই প্রসংশনীয়। তোমাকে কোনভাবে দুঃখ দিয়ে থাকলে আমাকে ক্ষমা কোরো।'

অগস্ত্য এই কথা শুনে উপলের কাঁধে হাত রেখে কৌতুকের সুরে বলল, ‘তোমাকে আমি ক্ষমা এমনিতেও করতে পারব না ভাই। গতবার দেশত্যাগের আগে বলেছিলে ফেরার সময় মিতানিদের উটপাখির মাংস নিয়ে আসবি। তা তো আনোনি নিশ্চয়ই, ওই পাখির মাংসই তোমার আমার বিচ্ছেদের কারণ হবে এবারে।’

অগস্ত্য এবং উপল দুজনেই হো-হো করে হেসে ওঠে, রাতের নির্জনতা কাটিয়ে তাদের হাসির আওয়াজ এই দালানে গমগম করতে থাকে। দ্রুত নিজেদের সংবরণ করে নেয় দুই যুবক। হাসি থামলে উপল অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করে, ‘আচ্ছা ভাই, ইরতেনসেনুকে কি তুমি আমাদের আসল পরিচয়টা জানিয়েছ?’

এই মন্দালোকেও উপল বুঝতে পারে যে অগস্ত্যের মুখে অন্ধকার নামল। সে মাথা নামিয়ে নিয়ে বলল, ‘না, জানানো হয়নি। আসলে মিশরে যখন প্রথম আমাদের দেখা হয় তখন ইরতেনসেনু আমাকে আর্য বলেই ভেবেছিল। আমিও তার এই ভ্রম নিরসনের চেষ্টা করিনি কখনও।’

‘এটা মনে হয় ঠিক হয়নি অগস্ত্য। সে তোমার ধর্মপত্নী। এমন কিছু থাকার কথা নয় যা তুমি তার কাছ থেকে গোপন রাখবে।’

‘হুম, তুমি ঠিক বলেছ। বলব, সঠিক সময়ে সব বলব আমি।’

এই সঠিক সময়ের অপেক্ষা অগস্ত্য গত চারবছর ধরে করে আসছে। তার আসল পরিচিতি, তার বংশকুলের ইতিহাসের কথা ইরতেনসেনুকে বলতে সাহস পায় না সে। তার মনে ভয় হয়। সবটা জানালে হয়তো ইরতেনসেনু তাকে ত্যাগ করবে। অগস্ত্যর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস হয়তো পৃথিবীর কোনও মানুষের কাছে অজ্ঞাত নয়। খারাপ খবর দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। অগস্ত্য নামের নতুন পরিচয় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব জীবনের সবকিছুকে ত্যাগ করে এসেছে সে। তার নিজের বলে আছে কেবলমাত্র উপল, আর লোপামুদ্রা। এই দুজনের কারোকেই সে হারাতে পারবে না।

সহসাই নূপুরের আওয়াজে অগস্ত্যর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল।

৮। বার্তা

'গতরাত্রে এক বড়ই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি রাজন। এমন কিছু আগে দেখিনি কখনও। দেখলাম কুন্দিনাপুরী নগর ধ্বংস হয়ে গেছে। পথের মধ্যে পুরুষ, নারী, শিশুর মৃতদেহ। এই রাজপ্রাসাদ ভেঙে পড়েছে। প্রাসাদের সামনে দুটি সুউচ্চ স্তম্ভ যেন কোনও মন্ত্রবলে তৈরি হয়ে গেছে। স্তম্ভের গাত্রে খোদাই করা আছে দুই সিংহকে। হিংস্র তাদের মুখ, কেশরগুলি গুটিয়ে রয়েছে। সিংহের পিঠে ঈগলের মতো ডানা। সিংহের মুখে আবার মানুষের মতো শ্মশ্রুগুম্ফের অবস্থান। এমন ভয়ানক স্বপ্ন দেখেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন ভোর রাত। তারপর আমি লোপামুদ্রা এবং উপলকে এই দুঃস্বপ্নের কথা বলি।'

এইখানে অগস্ত্যকে থামিয়ে দিয়ে উপল বলে, 'মহর্ষি অগস্ত্য স্বপ্নে যা দেখেছেন তা আংশিক সত্যি। মহাদেবের আশীর্বাদে কুন্দিনাপুরী এখনও সুরক্ষিত। কিন্তু অগস্ত্যর দেখা সিংহগুলি বাস্তবিকই আছে। আমি নিজের তাদের চাক্ষুস করেছি।'

'কী বলছেন! এমন অদ্ভুত দর্শন জন্তু এই পৃথিবীতে আছে!'

'না রাজা, এই জীব মানুষের কল্পনার ফসল, এর শরীরে প্রাণ নেই। অসিরিয় সভ্যতার যে পুরাণ তাতে এই জীবের উল্লেখ আছে। অসিরিয়দের রাজধানী কাহলু নামের এক শহর। সেই শহরে আমি বাণিজ্যের উদ্দেশে বেশ কিছুবার গমন করেছি। শহরের প্রবেশ দ্বারের দু'পার্শ্বে শ্বেতশুভ্র পাথর দিয়ে তৈরি এর বিকট দর্শন মূর্তি দুটিকে দেখেছি আমি।'

'তাহলে অগস্ত্য স্বপ্নে কীভাবে তাদের দেখলেন?'

অগস্ত্য মন্দ্র স্বরে বলল, 'এর কারণ আমার বোধের বাইরে রাজা। অসিরিয়দের দেশে আমি কখনও যাইনি। তাদের রাজধানীর এমন মূর্তির গল্পও আমি শুনিনি কখনও। অথচ স্বপ্নে যেন আমি তাদের স্পষ্ট দেখতে পেলাম!'

বাইরে সূর্যের প্রথম কিরণ যখন হয়তো সবেমাত্র এই পৃথিবীকে স্পর্শ করেছে তখনই রাজা বসুমানের শয়নকক্ষের দরজায় অস্থির আঘাতের শব্দ শোনা যায়। নিদ্রাজড়িত চোখে রানি কঙ্কাবতী দরজা খুলে দিলে পর দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে ঢুকে আসে অগস্ত্য, লোপামুদ্রা এবং উপল। তিনজনের চোখে মুখেই উৎকণ্ঠার ছাপ ছিল স্পষ্ট। ততক্ষণে রাজাও ঘুম ভেঙে পালঙ্কের উপরে উঠে বসেছেন। হতচকিত চোখে তিনি তাকিয়েছিলেন অগস্ত্যদের দিকে। বিন্দুমাত্র ভণিতা না করে অগস্ত্য রাজাকে তার দুঃস্বপ্নের কথা জানায়।

রাজার মুখ এখন গম্ভীর। দিনটির শুরুই হল খারাপ সংবাদ দিয়ে। মহাত্মা অগস্ত্য মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি ঈশ্বরের দূত। তার এমন দুঃস্বপ্ন কি বিদর্ভের বুকে অভিশাপকে ডেকে আনবে?

উপল এবার বলল, 'অগস্ত্যর এমন স্বপ্নকে আমাদের তরল ভাবে গ্রহণ করা সমীচিন হবে না। স্বয়ং মহাদেব, যিনি এই কুন্দিনাপুরীর রক্ষাকর্তা, তিনিই হয়তো মহর্ষির চেতনায় এই বার্তা এনে দিতে চেয়েছেন। অসিরিয়দের আমি চিনি। এই পৃথিবীতে তাদের তুল্য যুদ্ধবাজ আর কেউ নেই। সামান্য কারণবশত পাশের রাষ্ট্রে রক্তের নদী বইয়ে দিতে দু-দণ্ডও ভাবে না তারা।



অসিরিয়দের রাজা এখন এনলিল-নাসির। সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। রাজা হওয়ার প্রথম তিন বছরের মধ্যেই তিনি মিতানি এবং হিতাইতদের হারিয়ে তাদের ভূখণ্ডের দখল নিয়েছেন। কয়েকবছর আগে যখন আমি কাহলু শহরে উপস্থিত হই তখন একটি ব্যাপার আমাকে অবাক করেছিল। রাজা বিশাল অর্থব্যয়ে বেশ কিছু রণতরী বানাচ্ছিলেন। অথচ কাহলু শহর থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী নৌচলাচল যোগ্য নদীটিও শত যোজন দূরে, তবে সেই নদী পথে সমুদ্রে এসে পড়া যায়। আমার আশঙ্কা যদি সত্য হয় তাহলে রাজা ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।'

উপলের এমন কথায় বসুমানের হৃদয় কম্পিত হল। অসিরিয়দের হিংস্রতার কথা তিনি আগে বহুবার শুনেছেন। তাদের সৈন্যদল নাকি যে পথে গমন করে সেই পথে একটি জীবের শরীরেও আর প্রাণ থাকে না। বসুমান বললেন, 'কিন্তু কুন্দিনাপুরীই কেন? এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে সম্ভ্রান্তশালী রাজ্য দুটি হল মগধ এবং কোশল। ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করতে হলে তো অসিরিয় রাজাকে সেই রাজ্যদুটিকে জয় করতে হবে।'

'আপনার কথা সম্পূর্ণ সঠিক রাজা। কিন্তু অসিরিয়রা জলপথে এলে কোন পথে ভারত আক্রমণ করবে ভেবে দেখুন। সোপারার বন্দরের দিকে লক্ষ তাদের। সেখানে পৌঁছনোর পর প্রথম বড় রাজ্য তো এই বিদর্ভই। মহারাজ বসুমানের সৈন্যদলের সাহস এবং শৌর্যের প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান না করেই বলছি, অসিরিয়দের অযুত লক্ষ দানবিক সেনাদের সামনে তারা তুচ্ছ। বিদর্ভ ধ্বংস করেই রাজা এনলিল উত্তরে অগ্রসর হবেন। মগধ এবং কোশলের পতন তখন কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।'

উপলের কথা শুনতে শুনতে রাজা বসুমান অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন। তাঁর শির ছিল মাটিতে নিবদ্ধ, এবার মাথা তুলে উপলের দিকে চাইলেন, 'তাহলে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আমি আজই আমার সেনাধিপতি রৌরবের সঙ্গে আলোচনায় বসব। উত্তরের রাজ্যগুলিতেও দ্রুত খবর পাঠাতে হবে। যদি আমরা সব শক্তিকে একত্র করতে পারি তাহলে অসিরিয়দের আটকানো সম্ভব হবে বলে কি আপনার মনে হয় না?'

'না রাজন।'

অগস্ত্য দু'পা এগিয়ে এল, 'সেই মহাযুদ্ধে ভারতভূমির জয় হবে কি না তার উত্তর একমাত্র সময়ই দিতে পারবে। আমরা কেবল অনুমান করতে পারি। কিন্তু একটি ব্যাপার নিশ্চিত। যুদ্ধে লক্ষ মানুষের রক্ত ঝরবে। বেশ কিছু শহর ধ্বংস হবে, কত ধন সম্পত্তির যে ব্যয় হবে এই যুদ্ধের কারণে তার কোন হিসাব থাকবে না। একবার ভেবে দেখুন রাজন, এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হলেও বিদর্ভের সমৃদ্ধি কি ক্ষুণ হবে না? অগনিত প্রাণক্ষয়ের মূল্যধারণ কি আদৌ সম্ভব?'

'তাহলে তোমার কী প্রস্তাব?'

'কূটনীতি। উন্মত্ত হস্তীর সম্মুখীন হলে আত্মরক্ষার তাগিদে সর্বশক্তি দিয়ে তাকে আক্রমণ করার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান মাহুত সুকৌশলে তাকে শান্ত করে, কেবলমাত্র তার হাতে থাকা ছোট্ট শূলটির মাধ্যমে। আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিন। উপল অসিরির পথ চেনে।

'আমি তার সঙ্গে সেই দেশে যাই রাজদূত হিসাবে। রাজা এনলিলের সঙ্গে ভারতভূমির সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করি। যদি কূটনৈতিক পদ্ধতিতে দু'দেশের সদ্ভাব বজায় রাখা যায় তাহলে তার চেয়ে উত্তম তো আর কিছু হয় না, আর যদি রাজা এনলিল আমার প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেন তাহলে যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবীই ধরে নেওয়া যাবে না হয়। কিন্তু একবার চেষ্টা করা যাক।'

'কিন্তু মহর্ষি, তারা যদি আপনার কোন ক্ষতি করে?'

'তা হবে না রাজা,' উপল বলল, 'অগস্ত্যের চমৎকারী কার্যকলাপের কথা সাগর পেরিয়ে অসিরিয়দের কাছেও পৌঁছেছে। তারা মহাজ্ঞানী অগস্ত্যের প্রাণনাশের কথা স্বপ্নেও ভাববে না। আর তা ছাড়া রাজা এনলিল নির্মম হলেও বর্বর নন। বিদর্ভের রাজদূতের ক্ষতি সাধন তিনি নিশ্চয়ই চাইবেন না।'

'কিন্তু সে চাইলেই তো অগস্ত্যকে বন্দি করে রাখতে পারে।'

'হুম, তার একটা সম্ভাবনা আছে বটে, সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন উপায় থাকবে না।'

'আচ্ছা, তবে তাই হোক।'

ইরতেনসেনু এতক্ষণ ওই ঘরেই ছিল, সে চুপ করে শুনছিল সব কথা। এবার মুখ খুলল, 'পিতা, এই যাত্রায় আমিও অগস্ত্যর সঙ্গী হতে চাই। ও এমন দুরূহ অভিযানে থাকা কালীন আমি এখানে এই প্রাসাদে আরামে নিশ্চিন্ত দিনযাপন করতে পারব না। আমি ওদের সঙ্গে অসিরি যাব, কিন্তু রাজধানীতে প্রবেশের আগে ছদ্মবেশ ধারণ করে শহরের জনগনের মধ্যে মিশে থাকব। যদি দেখি অগস্ত্য এবং উপল রাজা এনলিলের প্রাসাদে প্রবেশের একদিন পরেও বাইরে আসছে না, তখন আমিই আপনার কাছে দ্রুত খবর পাঠাব।'

রাজা মৌন থেকে শুধু মাথা সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালেন। লোপামুদ্রাকে তিনি কোন কর্মে বাধা দেন না। তিনি জানেন এই কন্যাটি বুদ্ধিমতি। অসিচালনা এবং অশ্বারোহে বিশেষ পারদর্শীও বটে। মহর্ষি অগস্ত্যর তুলনায় কোন অংশে সে কম নয়। নিজের আত্মরক্ষা সে নিজেই করে নিতে পারবে।

অগস্ত্য এবং লোপামুদ্রা রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। তাদের পিছন পিছন উপলও বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর কয়েক পা এগিয়ে গেল রাজার দিকে। প্রণাম জানিয়ে করজোড়ে বলল, 'আমরা আর কিছুক্ষণ পরেই যাত্রা করব রাজন। তার আগে আমার কিছু বলার ছিল।'

'নির্ভয়ে বলুন উপল। যাত্রাপথে আপনাদের যে কোন রকমের প্রয়োজনের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত।'

'না, আপনার আশীর্বাদে যশ-অর্থের অভাব নেই আমার। তবে অন্য কিছু চাওয়ার ছিল। আপনার কাছে আমার একটি বর প্রাপ্য আছে।'

'অবশ্যই আছে উপল, আমি ভুলিনি। বলুন কী চান।'

উপল এবার সসঙ্কোচে মাথা নীচু করে বলল, 'আপনার উষ্ণীষের মণিটি।'

রাজা অবাক হলেন, 'এ তো আপনিই আমাকে এনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন এই পৃথিবীতে এমন রত্ন অতি দূর্লভ।'

'সত্যই তাই রাজন। এমন নক্ষত্রের তুল্য টুকরোটি আপনার উষ্ণীষেই শোভা পায়। কিন্তু আমি এটি আপনার থেকে ধার চেয়ে নিতে চাই। অসিরির উদ্দেশে যাত্রাপথে একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আমাদের গমন করতে হবে, তিনদিনের পথ মাত্র একদিনেই সাঙ্গ করা সম্ভব হবে সেই পথে গেলে।

'তবে সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কেবলমাত্র রাজা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদেরই সেই পথ ব্যবহার করার অনুমতি মেলে। সেই পথের দোরে পাহারা দেয় দোর্দণ্ডপ্রতাপ অসিরিয় সেনাবাহিনী। বিদর্ভের

রাজচিহ্ন স্বরূপ আপনার উষ্ণীষের এর মহামূল্যবান রত্নটিকে দেখালে সেই পথ আমাদের জন্য খুলে যাবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এই যাত্রা শেষে দেশে ফিরেই এটিকে আবার আপনার চরণপ্রান্তে নিবেদন করব। আমার প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব রত্নটিকে।'

কোন বাক্যব্যয় না করে রাজা নীলকণ্ঠ রত্নটি উষ্ণীষ থেকে খুলে উপলের হাতে দিলেন। উপল সযত্নে রত্নটিকে একটি কাপড়ে মুড়ে কাপড়টি নিজের কোমরবন্ধে গুঁজে নিল। রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এল উপল। সে জানে এই মণি তার কোন কাজে আসবে না, তবুও অসিরি যাত্রার গল্পের ভিত্তি এতে আরও দৃঢ় হল। সে যখন ঘরে ফিরে এল অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু তখন তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ যাত্রার জন্য।

অগস্ত্যর কক্ষে ঢুকেই ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিল উপল। তারপর হেসে অগস্ত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বণিকের বুদ্ধিতে কাজ করে কেমন সুফল পেলে দেখলে তো? আজ আমি না থাকলে তোমরা হয়তো মধ্যরাত্রে রাজপুরী ছেড়ে পালানোর কথা ভাবতে। সেই কাজটা কিন্তু মোটেই অগস্ত্যোচিত হতো না। তবে তোমার এই অক্লেষে মিথ্যা বলার ক্ষমতা আমাকে বিস্মিত করছে বন্ধু! যত দিন যাচ্ছে ততই যেন তুমি এতে আরও দক্ষ হয়ে উঠছ!'

গতকাল রাত্রের কথা।

নূপুরের আওয়াজ লক্ষ্য করে ঘুরে তাকাতেই অগস্ত্য আর উপল এক নারীকে দেখে দ্রুত পদচারণায় তাদের দিকে এগিয়ে আসতে। নারীদেহটি সামনে এসে দাঁড়াবার পর তাকে চিনতে পারে দুজনে, ইরতেনসেনু। ইরতেনসেনুর চোখে মুখে তখন চাপা অধীরতা লেগে রয়েছে। অগস্ত্য তাকে বলল, 'কী হয়েছে লোপামুদ্রা? তুমি এত রাতে এখানে? আমরা আবাসকক্ষের দিকেই আসছিলাম, রাজার সঙ্গে অষ্টপদ খেলতে গিয়ে দেরি হল।'

ইরতেনসেনু একবার অগস্ত্য এবং উপলের চোখের দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলার খুব প্রয়োজন।'

তাড়া যে আছে তা অগস্ত্য বুঝতেই পেরেছিল। অন্যসময় তাকে ডাকবার জন্য ইরতেনসেনু কোন দাসীকে প্রেরণ করে। কিন্তু এখন সে নিজেই এসে উপস্থিত, তার সাবধানি গলার স্বর বুঝিয়ে দিচ্ছে কারণটি জরুরি এবং গোপনীয়। অগস্ত্য বলল, 'হ্যাঁ চলো, ঘরে গিয়ে কথা বলি।'

'না, সেখানে যাওয়া যাবে না। দাসীরা আশেপাশেই থাকবে। বরং গবেষণাগারের দিকে চলো।'

প্রাসাদের পিছনের দিকের একটি পরিত্যক্ত আস্তাবলকে গবেষণাগারে পরিণত করা হয়েছে। সেখানে প্রবেশের অনুমতি শুধুমাত্র অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনুর। তারা সেই ঘর ব্যবহার না করলে সেখানে বড় একটি তালা ঝোলে। তার একটি মাত্র চাবি, সেটি থাকে ইরতেনসেনুর কাছে।

কোমরের কটিবন্ধের আড়াল থেকে চাবিটিকে বার করে সামান্য ঝুঁকে তালা খুলতে লাগল ইরতেনসেনু। তার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল অগস্ত্য এবং উপল। উপলের সঙ্গে ইরতেনসেনুর আলাপ হয়েছে আজ সকালেই, তবে তার কথা অগস্ত্যর মুখে বহুবার শুনেছে সে। উপল যে অগস্ত্যের নিজের ভাইয়ের মতো তা সে জানে, অতএব কথা যতই গোপনীয় হোক না কেন, উপল শুনলে কোন ক্ষতি নেই এই বিশ্বাস ইরতেনসেনুর মনে আছে।

গবেষণাগারে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ করল ইরতেনসেনু। দেওয়ালে লাগানো মশালটি জ্বালানো হতেই ছোট অন্ধকার ঘরটির প্রতিটি কোণে আলো ছড়িয়ে পড়ল। ঘরটি চৌকাকৃতির। ঘরের বাঁ-পাশে রাখা আছে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য এবং ছোট ছোট যন্ত্রের সমাহার। ঘরের ডান পাশে স্তূপাকারে রাখা আছে অসংখ্য শুকনো বাঁশপাতায় লেখা পুঁথি। এদের বেশ কিছুতে অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু তাদের গবেষণার পদ্ধতি এবং ফলাফল লিখে রাখে।

বেশ কিছু পুঁথি আবার ভারতবর্ষের উত্তরের রাজ্যগুলির গ্রন্থাগার থেকে আনা। কিছু মাস নিজেদের কাছে রাখার পরে তাদের ফেরত দিয়ে দিতে হয়। এমন কিছু পুঁথি অগস্ত্যরাও পাঠায় উত্তরে। ঘরের মাঝখানে একটি বড় চারপায়া রাখা আছে। সেগুন কাঠের তৈরি সেই আসবাবটির গায়ে লেগে রয়েছে বিভিন্ন গবেষণার ছাপ। কোন এক জায়গা পুড়ে কালো হয়ে গেছে আবার কিছু জায়গা কোন রাসায়নিকের প্রভাবে সাদাটে রঙ ধারণ করেছে। সেই চারপায়ার একদিকে দাঁড়িয়ে আছে ইরতেনসেনু, অন্যদিকে অগস্ত্য এবং উপল। অগস্ত্যের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে ইরতেনসেনু এবার তার হাতে একটি ছোট বস্তু তুলে দিল। তার মুখ থমথমে।

বস্তুটা লোহার তৈরি, চোঙাকৃতির। দৈর্ঘ্যে কনিষ্ঠ আঙুলের থেকে ছোট। তার গায়ে কয়েকটি ছবি খোদাই করা আছে। অগস্ত্য ছবিগুলির দিকে একবার তাকিয়েই ইরতেনসেনুর চোখের দিকে তাকাল। ছবিগুলি আসলে একটি বর্ণমালার হরফ, অগস্ত্য এই ভাষা পড়তে অক্ষম হলেও এই ছবিগুলিকে পাশাপাশি থাকতে বহুবার দেখেছে সে। এরা যে শব্দকে বহন করছে তা সে জানে।

নীলনদের দেশ মিশরের সর্বময়ী কর্ত্রী রানি হাতসেপসুতের নামের শীলমোহর এটি!

চোঙাটির একটি প্রান্ত অপর প্রান্তটির মতো ঢালাই করা নয়। এই প্রান্তটিকে খোলা যায়। ঢাকনাটি খোলার পর ভিতর থেকে ছোট্ট একটি প্যাপিরাসের খণ্ড বেরিয়ে এল। প্যাপিরাসটি অগস্ত্যর হাত থেকে নিয়ে দেখল উপল। এই ভাষা তারও রপ্ত নয়। বাণিজ্যের কারণে সে বেশ কয়েকবার মিশরে গেছে, তাই তাদের ভাষার বেশ কিছুটা সে জানে।

কিন্তু এই হরফ সাধারণের জন্য নয়। এই হরফ পড়তে পারেন সমগ্র মিশর দেশের গুটিকয় মানুষ। এই ভাষা দেবতার ভাষা। মন্দিরে গাত্রে খোদাই করা থাকে, মন্দিরের পুরোহিত ছাড়া আর একমাত্র যে মানুষটির এই হরফ ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে তিনি হলেন স্বয়ং ফারাও। এই পত্রটি তাহলে সরাসরি ফারাও হাতসেপসুতের কাছ থেকেই এসেছে! কী লিখেছেন তিনি?

পত্রটি ইরতেনসেনুর হাতে তুলে দিল উপল। ইরতেনসেনু এটিকে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার পড়ে ফেলেছে। তার কিছুটা পত্রে থাকা নির্দেশকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য, কিছুটা নিজের দেশের প্যাপিরাসের প্রতি মায়াবশত। অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু যখন মিশর ছেড়ে ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করে তখন রানির একটি অনুরোধ তাদের রাখতে হয়েছিল। তাদের সমগ্র যাত্রাপথে সঙ্গী ছিল একটি বাজপাখি। দূরদর্শী রানি বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে হয়তো কখনও এই দুই মহাগুণী মানব-মানবীর প্রয়োজন হতে পারে, তাই সঙ্গের বাজপাখিটিকে পাঠানো।

পাখিটি আকাশপথে তাদের দীর্ঘ যাত্রার সঙ্গী হয়েছিল। তারা বিদর্ভে পৌঁছবার পর সে আবার ফিরে যায় মিশরে। এই যাত্রাপথের নকশা তখন তার মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে। বাজপাখির স্মৃতি অসাধারণ, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, শক্তিশালী দুই ডানার বলে কয়েকমাসের পথ অক্লেশে পার করতে পারে সে। তাই মিশরে দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে খবর আদান প্রদানের জন্য বাজের ব্যবহার প্রচলিত। ভারতবর্ষের আবার এই পাখিটি অপ্রতুল। এখানকার আকাশে আকারে সামান্য ছোট চিলের দেখা মেলে। উপলের হাত থেকে পত্রটি নিয়ে ইরতেনসেনু বলল, ‘ফারাও হাতসেপসুত বিপদে পড়েছেন। আমাদের সত্বর মিশরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।’

‘কী বিপদ!’

অগস্ত্য এবারে ইরতেনসেনুর উৎকণ্ঠার কারণ বুঝতে পারে।

‘সে ব্যাপারে কিছু লেখা নেই। তবে বিপদ যে খুব সামান্য কিছু নয় বুঝতে পারছি, তা না হলে এই এত হাজার যোজন দূরে আমাদের কাছে বার্তা পাঠাতেন না।’

‘হুম, সেটা ঠিক বলেছ। আমাদের তবে সত্বর যাত্রা করা উচিত।’

‘হ্যাঁ, কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে মিশরের পথ কম নয়। সেখান থেকে এই দেশে আসতে অন্তত একটি মাস লেগেছিল আমাদের।’

ইরতেনসেনুর মুখ চিন্তান্বিত।

'যে নাবিক তোমাদের নিয়ে এসেছিল তাকে বলো আমার কাছে শিক্ষানবিশি করতে।'

উপল এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবারে এই কথায় তার দিকে তাকাল বাকি দুজন।

'কোন প্রমোদতরণী এই পথ পাড়ি দিতে একমাস সময় নিতে পারে। কিন্তু আমার সিন্ধুযান নয়।'

যে সভ্যতার মাধ্যমে এই ভারতবর্ষে বাণিজ্যের সূচনা হয়েছিল তাকে মনে রেখে উপল তার নৌকাটির নাম রেখেছে সিন্ধুযান। নৌকাটি এই ভারত ভূখণ্ডের সমস্ত বাণিজ্যপোতগুলির মধ্যে দ্রুততম। এর বলে উপল একবছরের মধ্যে তিন চারটি বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করে আসতে পারে। উপল বলল, 'আমি যে পথ দিয়ে মিশরে যেতে পারব তার কিছুটা দুর্গম হলেও অগম্য নয়। সেই পথ আমার হাতের তালুর মতো চেনা। আমরা যদি আগামীকাল যাত্রা করি তাহলে সামনের অমাবস্যার আগেই তোমাদের আমি সেই দেশে পৌঁছে দিতে পারব।'

উপলের দাবি যে অসত্য নয় তা অগস্ত্য ভালোমতোই জানে। উপলকে সে তার বাল্যকাল থেকে চেনে। সমুদ্রের সঙ্গে উপলের এক অন্যরকমের সখ্যতা আছে। অগস্ত্য বলল, 'কিন্তু উপল, আমি তোমাকে এই যাত্রায় সঙ্গে নিতে পারব না। তুমি সদ্য এক ক্লান্তিকর বছর কাটিয়ে দেশে ফিরেছ।'

অগস্ত্যের কথার মাঝে ইরতেনসেনু তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'আর আমাদের এই মিশর অভিযানের ভবিষ্যত কী তা আমরা নিজেরাই জানি না। জানি না সেখানে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে থাকবে। রানি হাতসেপসুতের বিপদে আমরা দু'জন তাঁর পাশে দাঁড়াবই। কিন্তু তোমাকে আমরা আমাদের ভবিতব্যের সঙ্গে টেনে আনতে পারব না।'

এবারে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল উপল, 'স্বামী-স্ত্রী দু'জনে একসুরে কথা বলছ দেখছি। দু'জনকে পাশাপাশি দেখে তো মনে হয় প্রেমে জারিত কপোত-কপোতী, তোমাদের দাম্পত্যকলহ হয় কখনও? সেই সময়টা আমার পক্ষে বেশ উপভোগ্য হবে। আমার তোমাদের সঙ্গে যেতে চাওয়ার এটা একটা কারণ ভাবতে পারো। তবে অন্য কারণগুলোও শুনে রাখো হে। আমি ছাড়া মাত্র বারোদিনে তোমাদের আর অন্য কেউ মিশরে নিয়ে যেতে পারবে না।

'যদি রানির সত্যই বিপদ ঘটে থাকে তাহলে এখন থেকে প্রতিটা মুহূর্ত অমূল্য। নিশ্চয় একমাস কোন নৌকায় তোমরা কাটাতে চাইবে না। দ্বিতীয়ত, আমার নিদ্রা সবচেয়ে ভালো হয় আমার সিন্ধুযানের খোলের মধ্যে থাকা ছোট বিছানাতে, ঢেউয়ের দোলায়। রাজার অতিথিশালার নরম শয্যায় আমার গায়ে ব্যথা হয়ে যাবে। আর সর্বশেষ কারণটা হল অগস্ত্যর জন্য। সামান্য এক নদীতে সে যেভাবে হাবুডুবু খেল সেটা দেখার পর উত্তাল সমুদ্রে আমি তাকে আর একা ছাড়ব না। তাই আমি যাবই, তোমাদের কোন অজুহাতই আমি শুনব না। এত আর তোমাদের মধুচন্দ্রিমা নয় যে একান্তে থাকতে চাইবে।'



এবার এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও ইরতেনসেনুর মুখে হাসি ফুটল। উপলের কথায় না হেসে পারা যায় না। প্রাণখোলা এই মানুষটিকে তার পছন্দ হয়েছে বেশ। সে বলল, 'আচ্ছা, তবে তাই হোক। তাহলে আমরা কবে যাত্রা শুরু করতে পারি?'

'বিলম্বে কাজ নেই। আগামীকালই আমরা যাত্রা করব। সোপারার বন্দরে সিন্ধুযানের নোঙর ফেলা আছে, কয়েক সপ্তাহের খাদ্য আর পানীয়ের রসদ নিয়ে নিলেই হল। কিন্তু হে অগস্ত্য, রাজাকে এবারে কী বলবে? প্রজাপতি ব্রহ্মা আবার স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন?'

ব্রহ্মার স্বপ্নাদেশের কথা অগস্ত্যকে বলতে হয়নি। উপলের বুদ্ধিতে অসিরিয় রাজের বিদর্ভ আক্রমণের শঙ্কাজড়িত স্বপ্নের কথা রাজাকে বলে অগস্ত্য। দৈবে বিশ্বাসী রাজাকে নিজের অলীক স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করাতে বেশি বেগ পেতে হয়নি অগস্ত্যকে। এবারে তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছে উপল, গতকালের রাত্রের মতো তাকে কঠিন প্রশ্নের মুখে একা ছেড়ে দেয়নি। খুব দ্রুত অগস্ত্যরা তৈরি হয়ে নিচ্ছিল।

মাঝারি আকৃতির ঝোলায় পরনের বস্ত্রাদি নেওয়া ছাড়াও একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে নিল অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু, এগুলির সবই তাদের গবেষণাকেন্দ্রে আবিষ্কৃত। কখন কীসের প্রয়োজন হয় তা তো কেউই বলতে পারবে না। ইরতেনসেনুর বুক দুরুদুরু করছিল কোন এক অজানা আশঙ্কায়। ফারাও নিশ্চয়ই এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তার জন্য। ইরতেনসেনুর কানে যেন বাজতে লাগল থীবস নগরীর দামামা। সেই দ্রিমদ্রিম সুর মিশে যেতে থাকল তার দ্রুত লয়ে চলতে থাকা হৃদস্পন্দনের সঙ্গে।

৯। দ্বন্দ্ব

কুন্দিনাপুরীর প্রধান ফটক থেকে তিনটি অশ্ব যখন বেরিয়ে এল তখন দিবালোকের বেশিরভাগ সময়টিই বাকি আছে, তবুও দ্রুত বেগে ঘোড়া ছোটাল অগস্ত্যরা। অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। মাঝে একবার থেমেছিল তারা, দণ্ডপুর নামের একটি ছোট জনপদে। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে পুনরায় যাত্রা করেছিল। সূর্যের আলো যখন পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে তখন সোপারার বন্দর শহরে এসে পৌঁছল অগস্ত্যরা। অশ্ব তিনটিকে স্থানীয় আস্তাবলে জমা করে পায়ে হেঁটে তারা তিনজনে এগিয়ে গেল মূল বন্দরের দিকে।

সোপারার হ্রদটি এতই বড় যে প্রথম দর্শনে তাকে সমুদ্র বলে ভ্রম হয়। তার দক্ষিণপ্রান্তে দাঁড়িয়ে উত্তরের তীরকে দেখা যায় না। হ্রদের পশ্চিমে সারি দিয়ে দাঁড় করানো আছে অসংখ্য তরণী। ওইখান থেকে গভীর একটি পরিখার মাধ্যমে হ্রদের জল এসে মিশেছে সমুদ্রে। ওই পরিখার মুখে মূল বন্দরটি শুরু হয়েছে। উপল অগস্ত্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল। সোপারার বন্দর সদাব্যস্ত।

মাঝি মাল্লা, ব্যাপারী বণিকদের ভিড় লেগেই থাকে। কোন নৌকা থেকে হয়তো ভারী ভারী পণ্য নামিয়ে নিয়ে কাঁধের ওপরে ফেলে এগিয়ে চলেছে শ্রমিকের দল। কোথাও কয়েকজন পূর্বদেশীয় মাল্লা একজোট হয়ে নিজেদের মধ্যে খেলায় মত্ত। এরা দুটি ঘনকাকৃতি বস্তু নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাজি লড়ছে। ঘনকদুটির গায়ের এক একটি অংশে বিভিন্ন সংখ্যায় ফুটো করা। ঘনকদুটিকে মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে দেখা হয় তার উপরিভাগে মোট কটি বিন্দু আছে। যার ছুঁড়ে ফেলা ঘনকের বিন্দুসংখ্যা বেশি হবে সে জয়ী হবে। সামান্য কিছু দিনার অথবা যাত্রাপথে চুরি করা ধাতুর সামগ্রী অথবা সুরার পাত্র বাজি রাখে এরা। একবার এই খেলা খেলতে শুরু করলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না এদের। এমনই একদল মাল্লা কোন একটি বাজিকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে বচসা করছে।

মাল্লাদের দল এই তুচ্ছ কারণে এত ব্যস্ত না হলে হয়তো তাদের নজর যেত সেই নারীটির দিকে, সে পরনে খুবই সাধারণ বস্ত্র পরে থাকলেও মুখশ্রীতে রাজকীয় ঝলকানি লুকোবার কোনও উপায় নেই। ঘাম, রক্ত, কদর্য ভাষা এবং অর্থলাভের তাড়না দিয়ে তৈরি এই সোপারার বন্দর। এই জায়গাটিতে নারীর লালিত্যের, তার কমনীয়তার কোন স্থান নেই। ইরতেনসেনুও হাঁটার সময় খেয়াল করছিল, এত মানুষের ভিড়ে একটিও মানবীকে তার চোখে পড়ছে না।

পেশি শক্তিতে যে নারী পুরুষের সমকক্ষ নয় তা সে জানে এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিতে নারীর বিচক্ষণতা, চাতুর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বারেবারে পুরুষকে মাত করে দিতে পারে-এও সে জানে স্বীয় অভিজ্ঞতায়। এই বাণিজ্যনগরীতে কি তার কোন স্থান নেই? এমন চিন্তা মনে এলেই ইরতেনসেনু কষ্ট পায়। সে বোঝে তার সামনে অনেক বড় কাজ পড়ে রয়েছে। সে তার সর্বশক্তি দিয়ে এই বিভেদ ঘোচাবার চেষ্টা করবে। এই দেশের মেয়েরা শুধুমাত্র মন্দিরেই নয়, সমাজে, কর্মক্ষেত্রেও সমান ভাবে পূজিত হবে, তাদের অধিকার থাকবে পুরুষদের সমান।

'এই হল আমার সিন্ধুযান!'

উপলের কথায় ইরতেনসেনুর চমক ভাঙল। উপলের এগিয়ে রাখা তর্জনী বরাবর তাকিয়ে সে নৌযানটিকে দেখতে পেল। নৌকাটি আকারে মাঝারি। এতক্ষণ ধরে সে জলযানগুলির পাশ দিয়ে তারা হেঁটে এসেছে তাদের তুলনায় এটিকে খর্বকায়ই বলা চলে। দৈর্ঘ্যে একশত হাতের সমান, নৌকার হালের সর্বোচ্চ অংশটি মাটি থেকে পাঁচটি মানুষের সমান লম্বা। গাঢ় বাদামি বর্ণের সেগুনকাঠ দিয়ে তৈরি সিন্ধুযানের খোল।

একটি কাঠের সরু পাটাতন বেয়ে অগস্ত্য আর ইরতেনসেনু নৌকার উপরে উঠল। অন্যদিকে উপল ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাঝিদের জোগাড় করতে। তারপর সে স্থানীয় দোকান থেকে শুকনো খাবার কিনল। শ্রমিকদের পিঠে করে বেশ কয়েক ঘড়া জল বইয়ে এনে রাখল নৌকার ভিতরে। সমুদ্রের নোনা জল পানের অযোগ্য। বারো দিনের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে তাই এই ঘড়াগুলি হবে অমৃতকুম্ভের সমান।

সোপারার বন্দর থেকে সন্ধ্যা নাগাদ সিন্ধুযানের যাত্রা শুরু হল। আকাশের রঙ তখনও আলোর অভাবে গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করেনি। সদ্য জ্বলে ওঠা মশালের আলোয় ঝলমল করছিল বন্দরটি। জনা কুড়ি মাল্লা একসঙ্গে প্রায় দুর্বোদ্ধ কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে করতে তরণীটিকে ঠেলে গভীর খালটির মধ্যে এনে ফেলল। এইখানে নৌকাটি গভীরতা পেয়ে সামান্য ভিতরে ডুবে গিয়ে ভারসাম্য খুঁজে পেল নিজের।

নিজেদের সঙ্গে আটজন মাঝিদের নিয়েছে উপল। তারা নৌকার দু'পাশে সারি দিয়ে বসে এক ছন্দে দাঁড় টানতে টানতে নৌকাটিকে সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে এল। নৌকার একেবারে অগ্রভাগে থাকা একটি উঁচু অংশে দাঁড়িয়ে ছিল উপল। তার হাতে একটি কপোতের পালক। সে এবারে পালকটিকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পালকটি যেন কোন অদৃশ্য ক্ষমতার বলে দু'পাশে দুলতে দুলতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। পিছন ফিরে অগস্ত্যর দিকে তাকিয়ে হাসল উপল। বাতাস তাদের সহায়। সমুদ্রের হাওয়া এখন উত্তরের দিকেই বইছে। উঁচু কণ্ঠে উপল মাঝিদের উদ্দেশে বলল, 'পাল খুলে দাও!'

চওড়া মাস্তুলের গায়ে মোটা রজ্জু দিয়ে জড়িয়ে রাখা পালটিকে মাঝিরা খুলে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পালটি হাওয়ার প্রভাবে সামনের দিকে ফুলে উঠল। সিন্ধুযানের গতিও কয়েকগুণ বেড়ে গেল এই সময়। সমুদ্রের ঢেউ কেটে তরতর করে এগিয়ে যেতে থাকল সে। এখন শুধুমাত্র সঠিক দিক নির্ণয় করে এগিয়ে গেলেই হল।

পরবর্তী কয়েকটি দিন মাঝ সমুদ্রে ঘটনাবিহীন ভাবে কেটে গেল। যতক্ষণ সামুদ্রিক হাওয়ার জোর থাকে ততক্ষণ সিন্ধুযান যেন কোন চপল শুশুকের ন্যায় সমুদ্রের বুক চিরে ছুটতে থাকে। উপল তার এতদিনের অভিজ্ঞতায় নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারে ঠিক কতক্ষণ হাওয়ার জোর থাকবে। ততক্ষণই পাল মেলে রেখে যতটা সম্ভব যাত্রাপথ পার করে ফেলা হয়। বাতাস মন্দ হয়ে এলে পাল গুটিয়ে ফেলা হয়, তখন মাঝিদের দাঁড়ের টানে নৌকা এগিয়ে চলে। দিনের দু'বেলায় নিয়ম করে পান আহার সারা হয়, এই সময় দাঁড় টানা থামিয়ে মাঝিরা গোল হয়ে বসে। তাদের সঙ্গেই বসে যায় অগস্ত্য, উপল এবং ইরতেনসেনু।

এই নৌকার বুকে কোন জাতিগত বিভেদ নেই। একই রুটি এবং শুকনো মাংস মাঝিদের সঙ্গে ভাগ করে খায় অগস্ত্যরা। খেতে খেতে মাঝিরা নদী, সমুদ্রের গান শুরু করে। কোন এক মাঝি খাওয়া ফেলেই তার বাদ্যযন্ত্রটিকে বার করে গানের তালে তালে বাজাতে শুরু করে দেয়। তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে গলা মেলায় ইরতেনসেনু। মিশরের দিনগুলিতে বহুবার সে নীলনদের বুকে যাত্রা করেছে। সেই সব নৌকার মাঝিদের আর এই ভারতবর্ষীয় মাঝিদের গানের সুর যেন কোথাও গিয়ে এক রকমের।

তাদের গানের কথাও যেন এক। বছরের বেশিরভাগ সময় জলের মাঝে কাটিয়েও তাদের মন পড়ে থাকে একফালি মাটিতে, সেখানে তাদের ছোট্ট কুটিরে সংসার তৈরি হয়েছে। তাদের ঘরে স্ত্রী পুত্র কন্যা তাদের পথ চেয়ে বসে আছে। মাঝিদের কণ্ঠে যেন তাদেরকে দেখতে না পাওয়ার আকুতি ঝড়ে পরে। তবে সেই গান কিন্তু দুঃখের হয় না। বিরহ থাকলেও তাতে আবার স্বজনকে ফিরে পাওয়ার আশা মিশে থাকে। গানের তালে তালে মাঝিরা কাঁধ ঝুঁকিয়ে নাচতে শুরু করে।

সপ্তমদিনের মধ্যরাত্রের কথা। কয়েকদিন আগের পূর্ণচন্দ্র খয়িষ্ণু হতে হতে হতে প্রায় অর্ধেক আকার ধারণ করেছে। তবে এই রাতে যেন সে পৃথিবীর অনেকটা কাছে চলে এসেছে। উত্তর দিগন্তের সামান্য উপরে দেখা যাচ্ছে তাকে। তার আলোয় সমুদ্রের জল রূপোর মতো ঝিকমিকিয়ে উঠছে। এখন বাতাসের জোর একেবারেই নেই। মাঝিরা ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে আছে নৌকার খোলের ভিতরে তাদের কুটুরিতে।

উপল নিবিষ্ট মনে তাঁর সামনে রাখা শালপত্রটিকে পরীক্ষা করছিল। তার গায়ে যাত্রাপথের নকশা আঁকা আছে। দিনের বেলায় দিকনির্ণয় করা যায় না, কারণ সূর্যের তেজে আকাশের কোনও তারাই দৃশ্যমান হয় না। এখন প্রায় কৃষ্ণবর্ণের আকাশের গায়ে নক্ষত্রগুলি জেগে আছে। নিজের হাতে থাকা ছোট ধাতব যন্ত্রটিকে শালপত্রের একটি নির্দিষ্ট অংশে বসিয়ে বারবার মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে দিক পরিদর্শন করছে উপল। তার সামান্য ভুলেও তরণী কয়েক ক্রোশ সরে গিয়ে অন্য পথে যাত্রা করতে পারে।

হাতে সময় বেশি নেই। এতদিন সঠিক পথেই এসেছে তারা, বাকি কয়েকটি দিনেও তার বিচ্যুতি ঘটাতে চায় না উপল। সে ভালো করে পরীক্ষা করে নিয়ে আগামীকালের গন্তব্যের পথ ঠিক করল, তারপর শ্রান্ত শরীরে এগিয়ে গেল নিজের কক্ষের দিকে। এখন তার ঘুমের বড় প্রয়োজন।

রাত্রি তখন কত যাম বোঝা যায় না, অগস্ত্যর ঘুম ভেঙে গেল। গলা শুকিয়ে এসেছে, জল খেতে হবে। পাশ ফিরে সে দেখল ইরতেনসেনু নেই। সামান্য অবাক হল অগস্ত্য। নিজের ছোট্ট কক্ষটি থেকে বেরিয়ে উপরে উঠে এল সে। নৌকার পাটাতনের উপরে শুয়ে আছে ইরতেনসেনু। মৃদু শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে নৌকার উপর দিয়ে, ঢেউয়ের ছন্দে সামান্য দুলছে সিন্ধুযান। চাঁদের নরম আলোয় ইরতেনসেনুকে দেখে মনে হচ্ছে কোনও মৎসকন্যা বুঝি সমুদ্রের জল থেকে উঠে এসে এই নৌকায় সামান্য বিশ্রাম করছে।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ইরতেনসেনুর সৌন্দর্য উপভোগ করল অগস্ত্য। ইরতেনসেনুর পরনের বস্ত্রটি সমুদ্রনীল বর্ণের। কাঁধ থেকে নেমে এসে শেষ হয়েছে হাঁটুর সামান্য নীচে। ইরতেনসেনু অগস্ত্যর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছে। সরু গ্রীবা এসে মিশেছে মসৃণ কাঁধে, সেখান থেকে নেমে এসেছে তন্বী বাহু। বাহু মূলে দুটি রং-বেরং-এর পাথর খচিত চুড়ি। ইরতেনসেনুর বাহুটি এলিয়ে আছে তার ঊরুর উপরে। তার হাঁটু দুটি সামান্য সামনের দিকে ভাঁজ হয়ে আছে। গোড়ালিতে রূপোর নিক্বন, পায়ের পাতা দুটি পদ্মের পাপড়ির মতো পেলব। অগস্ত্য ভাবে, নারী শরীর ঈশ্বরের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। বিধাতার শিল্পবোধ যেন ফুটে উঠেছে এই শরীরের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি বিভঙ্গে।

আগুনের কাছে যেভাবে কীট উন্মাদের মতো ধেয়ে যায়, সেইভাবে পুরুষ আকর্ষিত হয় এই শরীরের প্রতি। কিন্তু এই শরীর যে স্থায়ী নয়, এ যে কর্পূরের মতো। নারীর যৌবন অমর হয় না, সে কর্পূরের মতোই ক্ষয়িষ্ণু। সেই যৌবন লুপ্ত হলে রয়ে যায় তার স্মৃতিটুকু, গন্ধটুকু। কিন্তু সেই নারীর মন? তার বুদ্ধি, মেধা, প্রজ্ঞা? তার খবর কয়জন রাখে? ওই মায়াময় শরীর পেরিয়ে কজন পুরুষ তাকে ছুঁতে পারে? নারীর শরীরই কি তার শত্রু নয়?

ইরতেনসেনু নিঃসন্দেহে সুন্দরী। কিন্তু তার মেধা যে তার শরীরের তুলনায় শতগুণে উজ্জ্বল তা অগস্ত্য জানে, সে পরিচয় সে বহুবার পেয়েছে। কারণ সে অনেক কাছ থেকে দেখেছে তার স্ত্রীকে। এই অসামান্যা নারী যে তার স্ত্রী তা যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারে না সে, আজ এই মনোরম পরিবেশে যেন মনে হল সে স্বপ্নলোকে আছে। ধীর পায়ে সে ইরতেনসেনুর দিকে এগিয়ে গেল। কাছে আসতে সামান্য উঠে বসল ইরতেনসেনু। অগস্ত্যর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসিতে ভরা মুখে সে বলল, 'ঘুম আসছে না, তাই ভাবলাম কিছুক্ষণ এইখানে শুয়ে থাকি।'

'আমাকেও ডেকে নিতে পারতে তো।'

'শিশুর মতো ঘুমোচ্ছিলে তুমি, তোমার ঘুমন্ত চোখের মণিদুটি নড়ছিল, স্বপ্ন দেখছিলে মনে হয়, এমন ঘুম ভাঙাতে মন চায়?'

অগস্ত্য সামান্য হেসে ইরতেনসেনুর পাশে বসল, তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ঘুম নেই কেন? দুশ্চিন্তা করছ?'

'হুম, রানির জন্য চিন্তা হচ্ছে। এভাবে ডেকে পাঠালেন, তাও বার্তাবাহক বাজের মাধ্যমে, গোপনে। কেন?'

অগস্ত্যর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কেন তা আমিও ভেবে চলছি ইরতেনসেনু। রানি নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছেন। তাঁর তো আর শত্রুর অভাব নেই।'

'ফারাওদের কোন কালেই শত্রুর অভাব থাকে না অগস্ত্য। দেশের দক্ষিণ দিকের নুবিয়ার আদিবাসীদের অশান্তি আর দেশের বাইরের অসিরিয়দের আক্রমণের আশঙ্কার মধ্যেই ফারাওদের দিন কাটে। কিন্তু হাতসেপসুতের শত্রু যে তাঁর রাজধানীতে, থীবস শহরেই। এক নারী যে মুখে নকল দাড়ি লাগিয়ে ফারাওয়ের মুকুট পরে দেশ শাসন করবে তা রাজবংশের বাকিরা চায়নি কখনও। ঈশ্বরের আশীর্বাদে তা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য রাজপরিবারের মধ্যেই সদা চক্রান্ত চলতে থাকা অস্বাভাবিক নয়। রাজমন্ত্রী সেনেনমুতকে আমি ভরসা করি, তিনি পিতা। তিনি রানির পাশে আছেন এটা ভেবে মনে বল আসে। তাঁর প্রবল কূটনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে তিনি রানিকে রক্ষা করছেন। তবুও মনে হয় কোথাও একটা গোলযোগ হয়েছে, এমন একটা কিছু যা তাঁর ক্ষমতার বাইরে।'

'অর্থাৎ বিপদটা এমনই যা থেকে উদ্ধার পেতে তোমাকে প্রয়োজন।'

'শুধু আমার একার নয়, তোমারও প্রয়োজন। রানি পরিষ্কার ভাবে লিখে দিয়েছেন যে আমরা দুজনেই যেন মিশরে উপস্থিত হই।'

'ঠিক, সেদিন রাতেই বলেছিলে এ কথা। আমি ভাবছি এমন কী বিপদ যাতে আমাদের দুজনের উপস্থিতিই রানির কাম্য হবে?'

'জানি না অগস্ত্য, তবে আমার মনে কোন এক অজানা আশঙ্কা বাসা বাঁধছে। মিশরের মাটিতে পা রাখার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি।'

'আর কয়েকদিনের মধ্যে তা সম্ভব হবে। উপলের নৌচালনার দক্ষতার পরিচয় তো পেয়েইছ। গতকালের অমন প্রবল ঝড়ের মধ্যেও সে সিন্ধুযানের ভারসাম্য তো বজায় রাখলই, উপরন্তু দিগভ্রষ্টও হতে দিল না। তুমি বরং মনটাকে একটু শান্ত করো, অন্য কোন দিকে প্রবাহিত করো তাকে।'

ইরতেনসেনু অগস্ত্যর দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল, তারপর বলল, 'অন্য দিকে? আচ্ছা।'

ইশারায় অগস্ত্যকে পাশে শুতে বলে ইরতেনসেনুও শুলো। তাদের মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ। সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ইরতেনসেনু বলল, 'এক নারী পুরুষের অধিকারের আসনে আসীন হওয়ার কারণে বিপদের মুখে পড়েছেন। অথচ নারীদের তো পুরুষের সমান হওয়ার কথা ছিল অগস্ত্য। সৃষ্টির শুরুতে তো এমন ভেদাভেদ ছিল না।'

অগস্ত্য এর উত্তরে কিছু বলল না, চুপ করে রইল। ইরতেনসেনু বলল, 'তোমাকে কখনও গেব আর নুতের গল্প বলেছি?'

'না তো।'

'শোন তবে, এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি দেবতা হলেন আতুম। আতুমের দুই সন্তান, শু আর তেফনুত। শু বাতাসের দেবতা আর তেফনুত আর্দ্রতার দেবী। এদের সন্তানদের নাম হল গেব এবং নুত। গেব হলেন পৃথিবীর দেবতা। গেবের শরীরে জন্ম হল নীলনদের, তাঁর পাঁজর থেকে তৈরি হতে থাকল শস্য। গেব খুব জোরে হেসে উঠলে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়, গেবের উষ্মায় তৈরি হয় খরা।

'অপরদিকে নুত হলেন আকাশের দেবী, তাঁর গাত্রে মেঘের জন্ম হয়, বৃষ্টির ধারা হয়ে তা ঝরে পড়ে গেবের উপর। সেই জলে নদী পুষ্ট হয়, জমিতে শস্য ফলে। এই গেব আর নুতের সন্তানরা হল আকাশের এই তারারা। একদিন ভীষণ ক্ষুধার তাড়নায় নুত তাঁর সন্তানদের খেয়ে ফেলেন।

'স্বাভাবিক কারণেই গেব রুষ্ট হলেন। গেবের রাগ কমানোর জন্য তখন নুত গেবের ওপরে ছাতার মতো উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলেন। তাঁর দু'হাত আর দু'পায়ের পাতা স্পর্শ করে থাকল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব আর পশ্চিম দিক। নারী আর পুরুষ এই দুই নিয়ে তৈরি হল এই জগত। ওই দেখ আমাদের মাথার ওপরে নুত

কেমন উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন, তাঁর সন্তানরা তাঁর শরীরে জেগে আছে। আর এই পৃথিবী গেব আমাদের ধারণ করে আছে। এদের একটিকে ব্যতীত অপরটির অস্তিত্ব কল্পনাই করা যাবে না।'

অগস্ত্য এবার বলল, 'চমৎকার এই পুরাণের কথন ইরতেনসেনু। সত্যিই তো! নারী এবং পুরুষের ভেদাভেদ কেবল মাত্র শরীরের বাহ্যিক প্রকাশেই।'

ইরতেনসেনু এই কথার উত্তরে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তারায় ভরা আকাশের দিকে। তারপর প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা অগস্ত্য, মিথ্যা বচন নাকি সত্য গোপন, কোনটা বেশি ক্ষতিকারক বলে মনে হয় তোমার? এদের মধ্যে কোনটা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়?'

ইরতেনসেনুর এমন আকস্মিক প্রশ্নে চমকে উঠল অগস্ত্য। তার হৃদয় কম্পিত হল। এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে চেয়ে রইল ইরতেনসেনুর দিকে।

'তুমি আমার জন্য রাজা বসুমান আর রানি কঙ্কাবতীকে মিথ্যা বলেছিলে, আমিও তখন চুপ করে ছিলাম অর্থাৎ সেই মিথ্যায় সায় দিয়ে ছিলাম। এখনও সেই কথা ভাবলে লজ্জিত বোধ করি। নিজেকে বোঝাই যে সেইদিনের সেই মিথ্যাটির প্রয়োজন ছিল, তা না হলে তোমাকে আমি পেতাম না। তুমি মন্দিরে না গেলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, ভারতবর্ষের মানুষ তোমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে। মিথ্যাচারের ব্যাপারে তোমার কী মত অগস্ত্য, সেই দিন রাজাকে মিথ্যা বলে পরে তোমার মনে কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল?'

অগস্ত্য খানিকক্ষণ নীরব থাকল, তারপর ধীর স্বরে বলল, 'মিথ্যা বললেই যে ঈশ্বরের অবমাননা হয় তা আমি বিশ্বাস করি না ইরতেনসেনু। মিথ্যা অনেক প্রকারের হতে পারে, মিথ্যা শান্ত হস্তির মতো বিরাট আকার ধারণ করেও ক্ষতিহীন হয়ে থাকতে পারে, আবার বৃশ্চিকের মতো ছোট হয়েও এক দংশনে প্রাণহানির কারণ হতে পারে। যে মিথ্যায় অপরের ক্ষতি হয় না তেমন মিথ্যাচারের আমি পক্ষে। লোপামুদ্রা নামে তোমার পরিচয় দেওয়া ছিল তেমন এক মিথ্যাচার। এই মিথ্যার ফলস্বরূপ আমি তোমাকে পেয়েছি, এতগুলি বছর নিঃসন্তান থাকার পর রাজা-রানি কন্যা পেয়েছেন। এমন মিথ্যা আমি আগেও বলেছি, পরেও বলবার সময় আমার গলার স্বর কাঁপবে না।'

'তাহলে যে শুনেছিলাম, সত্যই ঈশ্বর, ঈশ্বর সত্য। এ চিন্তা তাহলে ভুল?'

'ভুল বা ঠিক নয়, এই চিন্তা দার্শনিক। দার্শনিক ভাবনার ঠিক বা ভুল হয় না ইরতেনসেনু। দুটি দর্শন বিপরীতমুখী হয়েও একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে। সত্য অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়, তা আলো দেয়, উষ্ণতা দেয়। কিন্তু অনেক সময় দাবানলের আকার নিতে পারে। একটি ক্ষুদ্র আপাত তুচ্ছ সত্য সম্পর্কের কুঞ্জকে নিমেষে নিঃশেষ করে দিতে পারে। তেমন সত্যবচনে ঈশ্বরলাভ কীভাবে হবে? সত্যের অনুপস্থিতিও কখনও কাম্য হয় বই কী।'

ইরতেনসেনু চুপ করে শুনছিল অগস্ত্যর কথা। সে যেন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অগস্ত্যর বাঁ-হাতের উপরের দিকে একটি কাটা দাগ আছে, অন্যমনস্ক ভাবে ইরতেনসেনু তাতে হাত বোলাচ্ছিল। অগস্ত্য বলে এমন দাগ নাকি উপলেরও বাঁ-কাঁধে আছে। ছোটবেলায় একদিন খেলার সময় পড়ে গিয়ে রুক্ষ পাথরে চোট পায় দুজনে। অগস্ত্যর পিতা তখন সেই ক্ষত সেলাই করে দিয়েছিলেন।

অগস্ত্য খুব ছোটবেলায় তার পিতাকে হারায়। অপরদিকে ইরতেনসেনু তার জন্মদাতা পিতাকে কোনদিন চিনলই না। অনাথ সে, বড় হয়েছে পালক পিতা সেনেনমুতের যত্নে, তাতে স্নেহের উষ্ণতা এতটুকু কম ছিল না। তবুও ইরতেনসেনু তার জন্মদাতা পিতার স্পর্শ কেমন তা জানে না, সেই ভাবনা আজও তাকে কষ্ট দেয়। ইরতেনসেনু খেয়াল করেছে অগস্ত্য কখনও কখনও এই ক্ষতচিহ্নে হাত রেখে চোখ বোজে কিছুক্ষণের জন্য, হয়তো সে তার পিতাকেই স্মরণ করতে চায়। ইরতেনসেনু এই নিয়ে অগস্ত্যকে কোনদিন কোন প্রশ্ন করেনি।

এখন সে অগস্ত্যর কাছে আরও একটু সরে এল, তার বুকে মাথা রেখে বলল, 'তোমার চিন্তার গভীরতা আমাকে অবাক করে। এমন ভাবে আমি ভাবিনি কখনও। আজ যেন এক গুরুভার লাঘব হল আমার বুক

থেকে। এখন একটু ঘুমাই।'

এই বলে ইরতেনসেনু চোখ বুঁজল, ক্ষনিকের মধ্যেই অগস্ত্য বুঝল সে গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছে। ইরতেনসেনুর নিশ্চিন্ত শ্বাসের ধীর উত্থান-পতন অগস্ত্যর বুকে প্রবাহিত হতে লাগল। সে নিজে কিন্তু দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। তার ঈশ্বর সারা রাত তার দিকে চেয়ে রইলেন, জানতে চাইলেন, 'এমন মিথ্যাচার যা ক্ষতিকারক নয় তাকে তুমি ন্যায়সঙ্গত মনে করলে, কিন্তু সত্য গোপনকে কী বলবে অগস্ত্য? সে কি বৃশ্চিকরূপী মিথ্যার চেয়েও অধিক বিষধর নয়?'

এর উত্তর অগস্ত্যর কাছে ছিল না। সে ইরতেনসেনুকে আরও একটু আঁকড়ে ধরে তারায় ঢাকা আকাশের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর নিজের বাঁ-হাতের ক্ষতচিহ্নে হাত রেখে চোখ বুঁজল। কিন্তু সেই রাতে আর ঘুম এল না তার।



১০। নেকেসিয়া

সিন্ধুযান সোপারার বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে কিছুটা পথ উত্তরে গিয়ে তারপর পশ্চিমের দিকে চলে চারদিন ধরে। পঞ্চম দিনে গতিপথ বদল করে দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করে। একটি পূর্ণদিন সেই ভাবে চলে পরের দিন আবার পশ্চিমের পথ নেয়। অষ্টম দিনে নৌকাটি অপেক্ষাকৃত ভাবে ছোট আকারের একটি সমুদ্রে এসে পড়ল। এখানে জলের রঙ আচমকাই যেন বদলে গিয়েছে।

ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী গাঢ় নীল বর্ণের সমুদ্র এখানে এসে যেন রক্তাক্ত এক আভা পেয়েছে। ইরতেনসেনু এই লোহিত সাগরের নাম আগে শুনলেও এই প্রথমবার তা চাক্ষুস করছে। উপল বলল এইখানে সমুদ্র খুব বেশি গভীর নয়, সমুদ্রের জলের মধ্যে কিছু উদ্ভিদ ভেসে বেড়ায়, তাদের কারণেই এখানকার জল এমন বর্ণের। একদিন সেই উদ্ভিদ জল থেকে তুলে রোদে শুকিয়ে নিল মাঝিরা। তারপর তাদের উত্তপ্ত তেলে ভেজে খাওয়া হল। অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনুও তার কিছুটা খেল।

সমুদ্রের জলের লবণাক্ত ভাব এই খাদ্যে বেশ পরিমাণে আছে, তবে তার সঙ্গে একটি মিষ্ট ভাবও রয়েছে। উপল বলল এই জলজ লতা বহু দিকভ্রষ্ট নাবিকের জীবন বাঁচায়। মাঝ সমুদ্রে খাদ্য ফুরিয়ে গেলে এটি জীবনধারণের একমাত্র পথ। এই সমুদ্রের ঢেউ বেশ কম। তবে এখানে বাতাস প্রবাহের জোর যেন আচমকাই বেড়ে গেল। এই অদ্ভুত দর্শন সমুদ্রের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমের দিকে যাত্রা করল সিন্ধুযান।

দ্বাদশ দিনের সকালে তারা বহুদিন পর মাটি দেখতে পেল। বহু দূরে হলুদ বর্ণের ভূমি দেখা যাচ্ছে, সেখানে যেন জেগে রয়েছে দুটি সূঁচের মতো স্তম্ভ। ইরতেনসেনু আনন্দে নৌকার উপরই লাফিয়ে উঠল। নেকেসিয়ার বন্দর দেখা যাচ্ছে!

নেকেসিয়া বন্দরটি মিশরের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বন্দরগুলির একটি। মাঝারি এবং ছোট আকারের কিছু নৌকা এখানে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। মিশরীয়দের নৌকার আকার এবং গঠনপ্রকৃতি ভারতীয় নৌকার থেকে সামান্য আলাদা। তাদের নৌকা ভারতীয় নৌকার তুলনায় কৃশকায় কিন্তু দীর্ঘতর। ভারতীয় নৌকাগুলির গায়ে সাধারণত বাদামী বর্ণের রঙ করা থাকলেও মিশরীয়দের নৌকা হয় উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের।

নৌকার গায়ে দেবদেবীর ছবি আঁকা থাকে। বাণিজ্যের কারণে এই নেকেসিয়ার বন্দরটি ব্যবহৃত হয় না। ছোট ডিঙি নৌকায় করে এখান থেকে সমুদ্রের সামান্য গভীরে গিয়ে মাছ শিকার করে জেলেরা। সমুদ্রের তীরে বাঁধা নৌকাগুলি এখন মন্দ লয়ে দুলছিল। খুব সাবধানে সিন্ধুযানকে এই বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করালো উপল। জলের গভীরতা কমে আসতে আসতে একসময় বোঝা গেল নৌকা নীচের ভেজা বালিতে এসে ঠেকেছে। এখানেই নোঙর ফেলল সে।

সবার আগে নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নামল ইরতেনসেনু। ছোট্ট এক বালিকার মতো সে সমুদ্রতীর দিয়ে ছুটতে লাগল। কত বছর পর তার দেশের মাটি তার পদস্পর্শ করেছে! নীচু হয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে কিছুটা বালি তুলে নিল সে, নাকের কাছে নিয়ে এসে চোখ বন্ধ করে গন্ধ শুঁকতে লাগল।

ততক্ষণে অগস্ত্য এবং উপলও নৌকা থেকে নেমে এসেছে। বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন মাঝি অবাক চোখে দেখছিল ইরতেনসেনুদের। ভিনদেশী মানুষদের সচরাচর এই বন্দরে দেখতে পাওয়া যায় না। তারা সন্দেহের চোখে অগস্ত্যদের দিকে তকিয়ে রইল। ইরতেনসেনু কিছুক্ষণের জন্য যেন এক অস্থির বালিকায় রূপান্তরিত হয়েছিল। অগস্ত্য এবং উপল তার পিছনে এসে দাঁড়াতে তার সম্বিত ফিরল। হাতের বালি ফেলে দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখল তারা কৌতুকময় মুখ নিয়ে চেয়ে রয়েছে ইরতেনসেনুর দিকে। সামান্য

লজ্জিত হল সে। যেন সেই লজ্জা কাটিয়ে ওঠার জন্যই এবারে গলার স্বর গম্ভীর করে বলল, 'তাহলে পরের যাত্রা আবার শুরু করা যাক।'

অগস্ত্যদের কোন কিছু বলার অপেক্ষা না করেই হনহন করে ইরতেনসেনু হাঁটতে থাকল সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝিদের দিকে। অদ্ভুত দর্শন বস্ত্রে সজ্জিতা এই নারী তাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে মাঝিরা যেন সামান্য সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারা একে অপরের দিকে চাইল। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরও কিছু মানুষ তাদের দলের কাছে চলে এল।

মাঝিদের কাছে এসে ইরতেনসেনু বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হাসল। মাঝিরা দেখল এই মেয়েটির পরনের কাপড় ভিনদেশের হলেও তার গলায় শোভিত অলঙ্কারটি মিশরীয়দের মতো। এবার তাদের অবাক করে দিয়ে মেয়েটি মিশরীয় ভাষায় বলে উঠল, 'নমস্কার জানাই আপনাদের, আমি ইরতেনসেনু। ফারাও হাতসেপসুতের রাজধানী থীবসের প্রধান বৈজ্ঞানিক ছিলাম আমি।'

ভিড়ের মধ্যে এক প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে ছিল। তার নাম জেজেত। জেজেত পেশায় জেলে, মাছ ধরে সংসার নির্বাহ করে। ইরতেনসেনুর নামটি শুনতেই জেজেতের মনে পড়ে গেল পাঁচবছর আগের সেই দিনটির কথা। যেদিন আকাশের সূর্য মাটিতে নেমে এসেছিল! রানি হাতসেপসুত দু'হাতে সেই সূর্যকে মাথার উপরে তুলে ধরেছিলেন। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা জনসমুদ্রের একেবারে সামনেই ছিল জেজেত।

ওপেতের উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য সেদিন সে মাছ ধরায় মুলতুবি রেখেছিল। নিজের স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনা সে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছিল। সেদিন তার চোখ গিয়েছিল রানির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সপ্রতিভ নারীটির দিকে। ওপেতের উৎসবের পরে সে শুনেছিল সেই রমনীর নাম ইরতেনসেনু, থীবস শহরের সবচেয়ে বিদুষী মহিলা। পাঁচ বছর আগে দেখা সেই মুখ যেন আবার আজকে জেজেতের সামনে! হ্যাঁ-হ্যাঁ! ভিনদেশী বস্ত্র পরে থাকলেও তো এই যুবতীর মুখ অবিকল সেই ওপেতের উৎসবের দিনে দেখা নারীর মতো!'

ভিড় ঠেলে জেজেত সামনের দিকে এগিয়ে এল। ইরতেনসেনুর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে সে পিছন ফিরে বাকিদের উদ্দেশে বলল, 'তিনি সঠিক পরিচয়ই দিচ্ছেন। তাঁকে আমি দেখেছি ওপেতের উৎসবের দিনে। রাজধানীতে হেন কোন নাগরিক নেই যে ইরতেনসেনুর নাম শোনেনি।'

ততক্ষণে ইরতেনসেনু নিজের কোমরে বাঁধা কাপড়ের ছোট থলিটি থেকে বার করে এনেছে রানি হাতসেপসুতের পাঠানো সেই ধাতব সম্পুটটিকে। সেটি সে জেজেতের হাতে দিল। এই ভাষা মিশরের সাধারণ মানুষ পড়তে না পারলেও এই শীলমোহরটিকে চিনতে কারোর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রাজধানী থীবসের আর কার্নাক শহরের মন্দির গাত্রে এই শীলমোহর সবাই দেখেছে। স্বয়ং ফারাওয়ের পবিত্র নাম খোদাই করা রয়েছে তাতে।

জেজেত এবার দু'পা পিছিয়ে এসে দু'হাত মাথার উপরে তুলে ইরতেনসেনুকে অভিবাদন জানাল, তার দেখা-দেখি বাকি মানুষজনেরাও দুই হাত মাথার উপরে তুলল। জেজেত বলল, 'মহামান্যা ইরতেনসেনু, আমাদের সৌভাগ্য যে এই ছোট্ট বন্দরে আপনার চরণ স্পর্শ করেছে। আপনার আবিষ্কারের সুফল থীবস শহর এখনও ভোগ করে চলেছে। চাষের জমির মাটি কর্ষণের জন্য আপনি যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন তা এখনও ব্যবহৃত হয়। আপনার তৈরি করা রানি হাতসেপসুতের মন্দির 'জেহের জেসেরু'ও তো অপূর্ব সুন্দর! সমগ্র মিশরের গর্ব মন্দিরটি। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম কয়েকবছর আগে আপনি ভিনদেশে গমন করেন।'

'ঠিকই শুনেছিলেন, আমি ভারতবর্ষে ছিলাম গত পাঁচ বছর।'

এবারে পিছন ফিরে অগস্ত্য এবং উপলের দিকে হাত দেখিয়ে ইরতেনসেনু বলল, 'বাঁ-পাশের যুবকটি আমার স্বামী অগস্ত্য, আর ডান দিকের জন আমাদের বন্ধু উপল, সেইই আমাদের জলপথে এখানে নিয়ে এসেছে। আমরা এসেছি ফারাও হাতসেপসুতের জরুরী পত্র পেয়ে।'

ইরতেনসেনুর কথা শুনে বাকিরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করল, ভিড়ের মধ্য থেকে আরও একজন এগিয়ে এল। তার নাম সিথার। এই বন্দরটির পালক হল সিথার। সিথার নৌকাদের হিসাব রাখে, মাছ বিক্রির পর জেলেদের থেকে সাপ্তাহিক খাজনা আদায় করে, প্রতিমাসে সে থীবসে গিয়ে সেই খাজনা জমা করে। এই অঞ্চলে সিথারের প্রতিপত্তি তাই সবচেয়ে বেশি। সিথার খর্বকায়, বয়স পঞ্চাশ বছর হবে হয়তো। তার পরনের কাপড় কালচে রক্তিম বর্ণের। বুকের কাছে সুতোর কাজ করা থীবসের শাসনক্ষমতার প্রতীক।

ফারাওয়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের এই বস্ত্র পরিধান করা বাধ্যতা মূলক। আবার এই বস্ত্রের জন্যই তারা স্থানীয় অঞ্চলে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। সিথার জেজেতের হাত থেকে ধাতব সম্পুটটিকে নিয়ে ভালো করে দেখল, তারপর ইরতেনসেনুকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'নেকেসিয়ার বন্দরে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি সিথার, এই বন্দরের পালক, রাজপুরীর দ্বারা নিযুক্ত। আপনারা দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাদের থীবস শহরে নিয়ে যাব।'

সিথারের পিছু পিছু ইরতেনসেনুরা চলল। কিছুটা এগিয়ে একটি গৃহের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। আশেপাশের বাড়িগুলির তুলনায় এই গৃহটি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে বড়। সিথার বিবাহ করেনি, দুটি পরিচারক তার গৃহস্থলী সামলায়। তাদের সঙ্গে ইরতেনসেনুদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সিথার বলল, 'আজ সন্ধ্যা হয়ে এল। থীবসের পথ এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরের। রাত্রে মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা করলে ডাকাতের ভয় থাকে, রাত্রে ঠান্ডাও খুব বেশি থাকে। আপনারা দয়া করে আজ রাতটুকু বিশ্রাম করুন, আগামীকাল ভোরে আমরা যাত্রা শুরু করব। একটানা পথ চলতে থাকলে আগামীকাল বিকালের মধ্যে আমি আপনাদের থীবস শহর পৌঁছে দিতে পারব।'

ইরতেনসেনুর আর তর সইছিল না, সমুদ্র যাত্রার ক্লান্তি গায়ে নিয়েও সে চাইছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থীবসে হাতসেপসুতের কাছে পৌঁছতে। কিন্তু অগস্ত্য তাকে বোঝাল যে এই স্থানে রাত্রি বাস করাটাই সমীচীন হবে। রাত্রে ভালো করে ঘুমিয়ে নিয়ে সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই ক্লান্তিহীন শরীরে তারা যাত্রা শুরু করে দেবে। বারোদিন এই যাত্রায় ব্যয় হয়েই গেছে, আর একটি রাত্রি তার সঙ্গে জুড়লে তেমন ক্ষতি নেই। বরং দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর আবার রাত জেগে মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করলে শরীর অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ফারাওকে কোনভাবেই সাহায্য করা হবে না তাদের।

সিথারের আবাসে কোনও অতিথি কক্ষ নেই, এই ছোট জনপদে অথিতি আগমনের কথা কেউ ভাবেই না। সিথার তার নিজের শয়ন কক্ষটি অগস্ত্য, ইরতেনসেনু এবং উপলের জন্য ছেড়ে দিয়েছে, অনেক বিরোধ সত্ত্বেও সে ইরতেনসেনুর কথা শোনেনি। ফারাওয়ের নিকটের মানুষেরা তার প্রভুতুল্য। রাতের ভোজনের সমারোহে অগস্ত্যরা মুগ্ধ হয়েছিল। এই জনপদের প্রতিটি গৃহ থেকেই কিছু না কিছু খাবার নিয়ে আসা হয়েছে তাদের জন্য। এত খাদ্য তো তিনজনে খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

লোকালয়ের মানুষদের সঙ্গে বসে তাই ভাগ করে খাবার খেল তারা, সিথারও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। খাওয়ার পর অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু ঘুমাতে গেলেও উপল গেল না। সিন্ধুযানের ক্রমাগত দোলায় অগস্ত্যদের গায়ে ব্যথা হয়ে গেলেও উপলের যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। তার এখনই ঘুম আসছে না।

সিথারের আবাসের বাইরে একটি বেশ বড় ফাঁকা জায়গার মাঝে কাঠের আগুন জ্বালানো হয়েছে, তার চারদিকে গোল হয়ে বসেই তারা একটু আগে আহার সমাধা করল। প্রায় একশত জেলে, মাঝি, সাধারণ মানুষ এখনও এই আগুনের চারপাশে বসে আছে। উপল এবার তাদের নিজের সমুদ্র যাত্রার গল্প বলা শুরু করল। মিশরীয়দের ভাষায় কথা বলতে উপল ভালোই পারে, এই দেশে সে আগেও বেশ কয়েকবার এসেছে।



ভিনদেশের ভাষা না জানলে বাণিজ্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। ভিনদেশী এই দীর্ঘকায় পুরুষ দুটি নেকেসিয়ার মানুষের কাছে ভীষণই আগ্রহের বস্তু। গল্প বলতে উপল খুব ভালোবাসে, তার গল্প বলার সময়ে কাল্পনিক উপাদানের অভাবও হয় না। হাত পা নেড়ে চোখ বড় বড় করে এমনভাবে সে গল্পগুলি বলে যাতে শ্রোতার কাছে তা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।

নিজের নানান চিত্তাকর্ষক অভিযানের কথা বলতে বলতে উপল একসময় বলল, 'আমার সঙ্গে আসা অন্য পুরুষটি কিন্তু যে সে মানুষ নন। স্বয়ং দেবতার অংশ! অসীম ক্ষমতার অধিকারী তিনি। খুব সাধারণ ভাবে থাকেন বলে তাকে আর ফ্যালনা মানুষ ভেবে একদম ভুল কোরো না। একবার কী হয়েছিল জানো!'

অবশ্যই নেকেসিয়াবাসী জানে না কী হয়েছিল, তারা উদগ্রীব চোখ নিয়ে উপলের দিকে তাকিয়ে রইল। উপল বলে চলল, 'ভারতবর্ষের একেবারে উত্তরে হিমালয় পর্বতের কথা তো শুনেইছো মনে হয়, সেখানে দেবতাদের বাস। তাদের সাধারণ মানুষ চোখে দেখতে পান না, কিন্তু তাদের আশীর্বাদেই ভারতবর্ষের আকাশে সূর্য-চন্দ্র ওঠে, নদীতে জল বয়। কিন্তু অগস্ত্য এক মহাঋষি, নিজের তপস্যার বলে তিনি দেবতাদের সমতুল্য হয়েছেন। তিনি সরাসরি দেবতাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

'একদিন তার ঘুম ভাঙিয়ে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র উপস্থিত হলেন। বড়ই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে তিনি অগস্ত্যর কাছে এসেছেন, তার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে অসুররা থাকে বুঝলে। তারা স্থূলকায়, কদাকার, তারা বর্বর। সবসময় তারা দেবতাদের সরিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের দখল নিতে চায়। তাই দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ লেগেই থাকে।

'তেমনই এক অসুরের নাম বৃত্তাসুর। মহাঋষি দধিচি নিজে আত্মত্যাগ করে তার শরীরের হাড়গুলি দেবরাজ ইন্দ্রকে দেন, ইন্দ্র সেই হাড় থেকে তৈরি করেন বজ্র। ওই বজ্রকে তোমরা রাতের আকাশে দেখতে পাও তো? যখন আকাশে মেঘ ডাকে, তার আগে?'

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'আমাদের বজ্রের দেবতার নাম তো বেল। তিনি যুদ্ধ করার সময় বজ্রের প্রহার করেন।'

উপল মনে হয় এতে সামান্য বিরক্ত হল, সে বলল, 'ও হ্যাঁ, তাহলে তাই হবে, তোমাদের আকাশের বজ্রের অধিকার দেবতা বেলের হলেও ভারত ভুখণ্ডে তা দেবতা ইন্দ্রের অস্ত্র। সেই বজ্র দিয়ে ইন্দ্র বৃত্তাসুরকে বধ করেন। কিন্তু বৃত্তাসুরের এক সহচর ছিল, তার নাম কালকেয়। কালকেয় ছিল বৃত্তাসুরের মতোই ক্ষমতাশালী। তার মৃত্যুর পর কালকেয় সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে লুকায়। এবারে বিশাল সমুদ্রের মধ্যে ইন্দ্র কালকেয়কে খুঁজে পাবে কী করে?

'কালকেয়কে না মারতে পারলে অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লুকিয়ে থাকার কয়েক শত বছর পর হয়তো আবার এই কালকেয়ই আরও শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে আসবে, তাই তাকে বধ করা একান্তই প্রয়োজন। ইন্দ্র তাই অগস্ত্যর শরনাপন্ন হলেন, তাঁকে বললেন যেভাবেই হোক কালকেয়কে খুঁজে দিতে হবে। অগস্ত্য তখন কী করলেন জানো?'

ভিড়ের মধ্য থেকে সমস্বরে শব্দ হল, 'কী? কী?'

'অগস্ত্য তখন তাঁর অমিত ক্ষমতা বলে সমুদ্রের সব জল শুষে নিলেন!'

'সব জল! সমুদ্রের তো কোন আদি অন্ত নেই, তার গভীরতার মাপ কেউ জানে না, সেই সমুদ্রের সব জল পান করলেন অগস্ত্য?'

উপলের পাশে বসে থাকা জনৈক মিশরীয় নেকেসিয়াবাসী প্রশ্ন করল। বাকি সবার মতো তার চোখেও বিস্ময় এবং অবিশ্বাস লেগে রয়েছে। উপল তার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'এতে এত অবাক হওয়ার কী আছে? মহর্ষি অগস্ত্য আর কী-কী করেছেন তা জানলে তোমাদের রাতের ঘুম চলে যাবে। ইন্দ্রের বজ্রকে সে একটি ছোট কলসের মধ্যে বন্দি করে রাখতে পারে, প্রায় মৃত মানুষও তার অলৌকিক চিকিৎসায় প্রাণ ফিরে পায়, কিছুদিন আগে এক খরস্রোতা নদীর গতিপথ বদলে দিয়েছেন এই অগস্ত্য। সেখানে সমুদ্রের জল পান করা তো তুচ্ছ। তোমাদের দেবতা সেথও তো দেবতা হোরাসকে খোঁজার সময় নীলনদের জল শুষে নিয়েছিলেন, সে কথা কি আমি জানি না ভাবছ?'

ঠিক কথাই বটে, মিশরের ঈশ্বর এই কাজ পারলে ভারতবর্ষের ঈশ্বররূপী পুরুষ কেন পারবেন না?

'তারপর কী হল শোন। অগস্ত্য তো সব জল পান করে নিলেন, এবারে সমুদ্রের গর্ভের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল কালকেয়। তার আর লুকিয়ে থাকার কোন জায়গা রইল না, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বধ করলেন ইন্দ্র। দেবতাদের জয় হল। ভারতের ভূমিতে শান্তি ফিরে এল।'

'আর সেই সমুদ্রের কী হল, সমুদ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল?'

'না তা হবে কেন? সমুদ্র ছাড়া ভারতবর্ষের মানুষের চলবে নাকি? আমার মত বণিকেরা তাহলে দেশ দেশান্তরে যাবে কী ভাবে? গঙ্গা নদীর নাম তো তোমরা সবাই শুনেছ, হিমালয় থেকে জল বয়ে নিয়ে এসে সেই নদী আবার সমুদ্রের খাত ভরিয়ে ফেলল, সেই কাজ আবার হল অন্য এক মহর্ষির দৈববলে...'

উপলের কথা শেষ হওয়ার আগে সে একটি আওয়াজ শুনতে পেল, গলার ঘড়ঘড় শব্দ। এই আওয়াজটি সে চেনে, মাথা ঘুরিয়ে দেখল অগস্ত্য তার পিছনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে। এতক্ষণে বাকিদের নজরও গেল অগস্ত্যর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রমের ভঙ্গীতে তারা উঠে দাঁড়াল। এই দেবতুল্য মানুষটির জন্য এখন সম্ভ্রম জাগবে বই কী। অগস্ত্য এতে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, নিজের ডান হাত তুলে সবাইকে বসতে বলে উপলের উদ্দেশে বলল, 'অনেক রাত্রি হল, ভোরে আমাদের বেরোতে হবে, এবারে আপনি শয্যায় চলুন।'

উপলও বাধ্য ছেলের মতো তার সঙ্গে চলল, যাওয়ার আগে একবার পিছন ফিরে সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত আকাশে তুলে চিৎকার করে বলল, 'জয় অগস্ত্যর জয়!'

জনতাও মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপলের কথার প্রতিফলন করে বলল, 'জয় অগস্ত্যর জয়!'

অগস্ত্য এবারে প্রবল বিব্রত বোধ করে উপলকে একপ্রকার টানতে টানতেই নিয়ে এল। সিথারের গৃহে প্রবেশ করে উপলকে বলল, 'এই, এগুলোর কি প্রয়োজন ছিল? এত কল্পনার জাল তুমি বোনো কীভাবে?'

উপল একগাল হেসে বলল, 'দারুণ লাগে বুঝলে গল্পগুলো বলতে। মানুষ তো এখনও বিজ্ঞানকে সেভাবে চেনেনি। তাই তোমার আবিষ্কারগুলোর গায়ে একটু এদিক-ওদিকে রঙ মাখালেই এরকম অলৌকিক গল্প তৈরি হয়ে যায়। আমি দেখেছি এই গল্পগুলো মানুষ গোগ্রাসে ভক্ষণও করে। আমারও বলতে খুব ভালো লাগে। মহর্ষি অগস্ত্যর কার্যকলাপ আমি এভাবে যে আর কত দেশে বলে বেড়িয়েছি তার হিসাব নেই।'

এই বলে উপল আবার হাসতে লাগল, অগস্ত্যও উপলের এই কাণ্ড দেখে হাসতে শুরু করল। সত্যি, অদ্ভুত একটা মানুষ বটে উপল। নিজের প্রিয় বন্ধুর সাফল্যে সে গর্বিত তো বটেই, সেই সাফল্যের খবর দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিতেও তার জুড়ি নেই। যদিও সেখানে সে সামান্য কার্পণ্য করলে মনে হয় ভালো হতো।

পরদিন যখন দিগন্তে সবেমাত্র মলিন গেরুয়া আভা ছড়িয়ে পড়ছে তখন অগস্ত্যরা বেরিয়ে পড়ল। চারটি উটের পিঠে চলেছে তারা। মরুভূমির বালির মধ্য দিয়ে দ্রুত চলার জন্য উটের জুড়ি নেই। বহুক্ষণ বিনা বিশ্রামে একটানা চলতেও পারে তারা। নেকেসিয়ার জনপদটি বেশ ছোট। কয়েকদণ্ড চলার পরই তা শেষ

হয়ে মরুভূমি শুরু হল। পথে আরও কয়েকটি ছোট ছোট জনপদ পড়ল, তবে অগস্ত্যরা কোথাও আর দাঁড়ায়নি। সঙ্গে থাকা শুকনো খেজুর আর জল দিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছিল।

সূর্য যখন মধ্যগগনে তখন তারা নীলনদের তীরে এসে পৌঁছল। ইরতেনসেনু দ্রুত উট থেকে নেমে নদীর দিকে ছুটে গেল। আঁজলা ভরে নদীর জল পান করল সে, নিজের চোখে মুখে ছিটিয়ে নিল। তার দেশের নদী! এই নদীর তীরে তার শৈশব, কৈশোর কেটেছে। উচ্ছ্বসিত মুখ নিয়ে ইরতেনসেনু বলল, 'ওই দেখ অগস্ত্য, কার্নাকের মন্দির!'

ডান দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অগস্ত্য দেখল বেশ কিছুটা দূরে একটি অট্টালিকা দেখা যাচ্ছে। এত দূরে থাকার দরুণ সেটিকে পরিষ্কার ভাবে দেখা না গেলেও অট্টালিকার সামনে রাখা স্তম্ভ দুটি চোখে পড়ার মতো। স্তম্ভদুটির মাথাগুলি সূঁচালো। সেই মাথা সোনায় মোড়া। সুর্যের আলো তাতে প্রতিফলিত হওয়ার কারণে সেই চূড়ায় নজর গেলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

'রানি হাতসেপসুত স্তম্ভ দুটি বানিয়েছিলেন, মন্দিরটি আরও কয়েকশো বছরের পুরোনো।'

অগস্ত্যর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ইরতেনসেনু। তার চোখে-মুখে গর্বের ছাপ। মন্দিরটিকে ঘুরে দেখবার ইচ্ছা ছিল অগস্ত্যর। পাঁচবছর আগে আরও কিছুটা দূরে নদীর এই প্রান্তেই অবস্থিত লাক্সরের মন্দিরটিকে এখনও ভোলেনি সে। অনন্যসুন্দর সেই মন্দিরে রানি হাতসেপসুত ফারাওয়ের রূপে অভিষিক্তা হয়েছিলেন। অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনুর তৈরি যন্ত্র থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে থীবসের জনগনকে হতবাক করে দিয়েছিল সেদিন। অগস্ত্য শুনেছে কার্নাকের মন্দিরটিও নাকি ভীষণই সুন্দর। তবে আজ তাদের হাতে সময় কম, ফারাওয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ইরতেনসেনু ভীষণ উৎসুক হয়ে পড়েছে। তাই আজ কার্নাকের মন্দির দর্শন করা হবে না অগস্ত্যর। তারা তিনজনে সিথারের সঙ্গে একটি ছোট নৌকায় চড়ে বসল। সাদা পাল তোলা নৌকাটি নীলনদের বুকের উপর দিয়ে নদীর অন্যপ্রান্তের দিকে চলল।

থীবস শহরটি নীলনদের দু'পাশ জুড়েই অবস্থিত। তবে রানির প্রাসাদটি রয়েছে নদীর পশ্চিম তীরে। নৌকা থেকে নেমে একটি ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চলে তারা তিনজনে প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। রক্ষীরা তাদের পথ আটকে দাঁড়াতে ইরতেনসেনু একজন রক্ষীর হাতে ধাতব সম্পুটটিকে দিয়ে বলল, 'ফারাওয়ের কাছে বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন, এই সম্পুটটি তার হাতে দিলেই তিনি বুঝবেন।'

রক্ষীটি সম্পুটটিকে হাতের মধ্যে নিয়েই সেটির গুরুত্ব বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাসাদের অভ্যন্তরে দৌড় লাগাল। অন্য দুই রক্ষী প্রাসাদের দ্বার আবার বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চল চক্ষে অগস্ত্যদের দিকে তাকিয়ে রইল। অগস্ত্যরা ততক্ষণে ঘোড়ায় টানা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সিথার। তার মাথা অবনত, সে সামান্য কাঁপছে। সে রাজকর্মচারী হলেও ফারাওয়ের প্রাসাদের এত কাছাকাছি কখনও আসেনি, তাই ভয়-সম্ভ্রমে সে হয়তো স্থির থাকতে পারছে না।

বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা উপলের পোষায় না, অধৈর্য ভাবে প্রাসাদের বাইরের পায়চারি করতে করতে সে একসময় রক্ষী দুটির কাছে এগিয়ে গেল, বলল, 'ভাই, এই ভাবে তোমরা অতিথিদের স্বাগত জানাও? এতক্ষণ এই রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছ, একবার একটু জলপান করাবার ইচ্ছাও জাগলো না তোমাদের মনে? এটা নিজের গৃহ হলে এভাবে অতিথিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারতে তো?'

দ্বাররক্ষী দুটি কিছু বলল না, রোষায়িত চোখে শুধু উপলের দিকে চেয়ে রইল।

'চেহারাটা বেশ ভালো বানিয়েছ দেখছি। কিন্তু রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো গায়ের চামড়া পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে ভাই। তোমাদের ফারাওকে একটি ছাউনি বানিয়ে দিতে বলতে পারো তো।'

এই বলেই উপল একটি রক্ষীর কাঁধে হাত রাখল, সঙ্গে সঙ্গে সে এক ঝটকায় হাতটি সরিয়ে দিয়ে উপলকে ঠেলা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে হাতে ধরা বল্লম উঁচিয়ে ওর দিকে তাক করল। অগস্ত্য ছুটে এসে উপল আর রক্ষীর মাঝে দাঁড়াল, উপলকে ধরে মাটি থেকে তুলে সরিয়ে নিয়ে আসতে লাগল। রক্ষী দুটি তখনও বল্লম উঁচিয়ে উপলের দিকে তাক করে রেখেছে। ইরতেনসেনু তাদের শান্ত হওয়ার আবেদন

জানাচ্ছিল। এর মধ্যে উপল বলতে লাগল, 'এভাবে আমাকে মাটিতে ফেলে দিলে তোমরা! জানো আমার সঙ্গে থাকা এই মানুষটি কে? মহামুনি অগস্ত্য! এক্ষুণি তীব্র দৃষ্টি দিয়ে তোমাদের...'

এমন সময় প্রাসাদের দরজা ভিতর থেকে খুলতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষী দুটি ত্রস্ত ভাবে পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আগের রক্ষীটিকে সঙ্গে নিয়ে যিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন তাঁর শরীরের উর্ধাঙ্গ উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের বস্ত্র দিয়ে ঢাকা, তার উপরে থাকা সোনায় মোড়া ধাতব অঙ্গরক্ষক কাঁধ থেকে বুক অবধি বিস্তৃত। কোমরের কাছ থেকে নীল বর্ণের আরও একটি বস্ত্র নেমে এসে হাঁটুর কাছে থেমেছে। তাঁর পায়ে চর্মপাদুকা। দুই বলিষ্ঠ হাতে বাজুবন্ধ। থুতনির নীচের অংশে লাগানো আছে সোনার নকল দাড়ি। ইনি পুরুষের বেশভূষায় সজ্জিত হলেও মুখমণ্ডলের পেলবতা নারীত্বকে লুকিয়ে রাখতে পারছে না। তাঁর মাথার ডিম্বাকৃতি স্বর্ণমুকুট বলে দেয় তিনি ফারাও!

ফারাও হাতসেপসুতের এইভাবে প্রাসাদের বাইরে আসার ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে বলে জানা যায় না। সাধারণত তিনি দ্বিতলের অলিন্দ থেকে মানুষকে দেখা দেন। অথবা প্রাসাদের বাইরে আসার প্রয়োজন হলে তিনি রথে চড়ে আসেন, তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য ঘিরে থাকে সৈন্যদল। রক্ষী দুটি বিমূঢ় অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই হাঁটু ভাঁজ করে মাথা নীচু করে বসে পড়ল। সিথারও সেই ভঙ্গীতে বসে রইল মাটিতে।

হাতসেপসুতের নজর প্রথমেই এসে পড়ল ইরতেনসেনুর দিকে। তাঁর চোখ দুটি খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল। তিনি এগিয়ে গেলেন, ইরতেনসেনুও কিছুটা এগিয়ে এল। সে সামনের দিকে ঝুঁকে ফারাওকে অভিবাদন জানানোর আগেই হাতসেপসুত তাকে বুকে টেনে নিলেন। আলিঙ্গন করে বললেন, 'মিশরের মেয়ে তার জন্মভূমিতে ফিরেছে কত বছর পর। তোমায় আলিঙ্গন করে আমার বুকটা জুড়িয়ে গেল। মনে হচ্ছে কত মাস পর যেন স্বস্তি পেলাম।'

'আমারও মনে একই রকমের আনন্দ হচ্ছে ফারাও। গতকাল দেশের মাটিতে পা রেখে প্রাণ ভরে তার সুগন্ধ নিয়েছি। আজ সকালে নীলনদের জলে মুখ ভিজিয়েছি। মনে হল যেন পাঁচ বছর নয়, মাত্র কয়েকদিনের জন্য এই দেশ থেকে দূরে ছিলাম আমি।'

ইরতেনসেনুর চিবুকে হাত রেখে তার কপালে চুমু খেলেন ফারাও হাতসেপসুত। তারপর অগস্ত্যর দিকে চাইলেন। অগস্ত্য স্মিত হেসে রানিকে অভিবাদন জানালো। রানিও তার অভিবাদন গ্রহণ করলেন, 'আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অগস্ত্য। আমার পত্র পেয়েই আপনারা চলে এসেছেন। আমি আপনার কাছে চিরঋণী থাকব।'

'ঋণ তো আমার ফারাও। আপনার শহরের শ্রেষ্ঠ রত্নটিকে আপনি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমাকে আসতেই হতো।'

এবার অগস্ত্য তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উপল এবং সিথারকে দেখিয়ে বলল, 'এই যুবকটি আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু উপল। এইই আমাদের জলপথে মাত্র বারোদিনে এই দেশে এনেছে। উপলের মতো নাবিক ভারতবর্ষে হয়তো আর দুটি নেই। উপল আমার নিজের ভাইয়ের মতো। আর ইনি হলেন সিথার। ইনি আপনার রাজত্বের এক কর্মচারী, নেকেসিয়ার বন্দরের পালক। সিথার আমাদেরকে বন্দর থেকে আপনার প্রাসাদে নিয়ে এসেছেন।'

হাতসেপসুত বললেন, 'অতি উত্তম। সিথার আপনার কাজের যোগ্য পারিশ্রমিক আপনি পাবেন। এইখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আপনার উপঢৌকন প্রাসাদের ভিতর থেকে আসবে।'

সিথার আনন্দে তখন কেঁদে ফেলেছিল। ফারাওয়ের দর্শন মিশরীয়দের কাছে ঈশ্বর দর্শনের সমান। তারপরে স্বয়ং ফারাওয়ের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া! গতকাল সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়ও সিথার ভাবেনি তার সঙ্গে এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটবে। সে কাঁপা গলায় ফারাওয়ের নামে জয়ধ্বনি করল। ফারাও এবার

ইরতেনসেনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা ভিতরে চলো। এতটা পথ অতিক্রান্ত করে নিশ্চয়ই ক্লান্ত। সামান্য বিশ্রাম করো আগে।'

ফারাও হাতসেপসুতের পাশে ইরতেনসেনু এবং তার পিছন পিছন অগস্ত্য এবং উপল প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করল। প্রাসাদে ঢোকার আগে আবার রক্ষীর কাছে গিয়ে উপল নীচু স্বরে বলল, 'কেমন দেখলে হে, ভিতরে গিয়ে ফারাওকে বলব নাকি তুমি আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে?'

রক্ষীটি এবার সকরুণ দৃষ্টি নিয়ে চাইল উপলের দিকে। কিন্তু উপল পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গুনগুন সুর করতে করতে হাতসেপসুতের প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করল।

১১। বিপদ

রাজকীয় আতিথেয়তায় স্নানাহারের পর অগস্ত্যরা ক্লান্ত শরীর নিয়ে সন্ধ্যাবেলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন তাদের ঘুম ভাঙল তখন ভোর হচ্ছে, টানা প্রায় তিনটি প্রহর ঘুমিয়েছে তারা! তবে এখন যেন শরীরে গ্লানির আর লেশমাত্র নেই। অগস্ত্যর মন বেশ ফুরফুরে লাগছিল। অতিথিশালার ঘরের লাগোয়া অলিন্দের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। কখন যে ইরতেনসেনু তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার খেয়াল নেই। ভোরের এই সময়টায় সামান্য শীতল হাওয়া বয়ে যায় নীলনদের পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমের দিকে।

ইরতেনসেনু সোহাগের বশে অগস্ত্যর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। দিগন্তের দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকতে থাকতে সে বলল, 'আকাশের সূর্য তো একটিই, কিন্তু দু'দেশের সূর্যোদয়ের কেমন তফাত লক্ষ করেছ অগস্ত্য? এই সূর্য রক্তিম লালবর্ণের, তার শরীর থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় নদীর ওই তীরের বালিকে কেমন তরল সোনার মতো লাগছে। আবার ভারতবর্ষের সূর্যোদয় অন্যরকম, কিছুক্ষণ আগে ভারতের পূর্ব আকাশে যে সূর্য দেখা দিয়েছে তার রঙ গেরুয়া। মনে হয় যেন দিগন্তে গাঢ় হলুদ বর্ণের উত্তরীয় কেউ বিছিয়ে রেখেছে।'

'মিশরের শ্রেষ্ঠতমা বিদুষীর চোখে কোন সূর্যটি বেশি সুন্দর?'

ঠাট্টার সুরে বলল অগস্ত্য।

'অবশ্যই এই সূর্যটি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় কত কত বছরের, এই সৌন্দর্যের মুগ্ধতা আমার কোনওদিন কাটবে না। সর্বশক্তিশালী আমুন-রা দিনের কেবল এই সময়টিতেই এমন স্নিগ্ধরূপে দেখা দেন। এই সময়ে মিশরবাসী আমুনের দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারে, কার্নাক আর থীবসের মন্দিরে পূজার শুরু হয়। জানো অগস্ত্য, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন রোজ ভোরেবেলায় কার্নাকের মন্দিরে আমুন-রা'র পূজা দেখতে যেতাম। সূর্যের প্রথম কিরণ যখন মন্দিরের গাত্র স্পর্শ করত তখন মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে ভেসে আসত প্রধান পুরোহিতের জলদগম্ভীর কণ্ঠের মন্ত্রপাঠ। এখনও গায়ে কাঁটা দেয় সেই মুহূর্তের কথা ভাবলে। আমি পরে বিজ্ঞানের সাধক হয়েও মাঝে-মাঝেই আসতাম কার্নাকের মন্দিরে, এই সময়টার যেন আলাদাই জাদু আছে।'

যেন নিজের অন্তরেই বিলীন হয়ে গিয়ে কথাগুলো বলছিল ইরতেনসেনু। আকস্মিক কী যেন মনে পড়ে যেতেই তার মুখে লেগে থাকা প্রশান্তি ম্লান হয়ে গেল। বাস্তবের রূঢ়তা যেন তাকে মাটিতে টেনে নামিয়ে আনল। অধৈর্য্য চোখে ইরতেনসেনু অগস্ত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছিঃ, এখন আমি অতীতের স্মৃতিচারণে ডুবে রয়েছি। এদিকে যে কারণে দেশের মাটিতে ফিরে আসা তাকেই বিস্মৃত হতে বসেছিলাম প্রায়। গতকাল এই প্রাসাদে প্রবেশের পর থেকেই নিজেদের বিলাসেই যেন ব্যস্ত হয়ে আছি। চল অগস্ত্য, আমরা এক্ষুণি ফারাওয়ের দর্শনপ্রার্থী হই, তিনি নিশ্চয়ই অধীর আগ্রহে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

ফারাও হাতসেপসুত সত্যিই অধীরতার সঙ্গে নিজের মন্ত্রণাকক্ষে ইরতেনসেনুর অপেক্ষা করছিলেন। কত রাত ভালোভাবে ঘুমোতে পারেননি তিনি। যে বিপদ তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার উপস্থিতিতে দু'চোখের পাতাকে এক করাও দুরূহ হাতসেপসুতের পক্ষে। এখন তিনি ফারাওয়ের রাজকীয় বেশভুষা পরিহিতা নন, একটি ফিনফিনে শ্বেতশুভ্র বস্ত্র তার গায়ে। ফারাওয়ের মুখে অন্যান্য দিনের মতো প্রসাধন নেই, তাই তার চোখের নীচের কালিমাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন হাতসেপসুতের বর্তমান বয়স চল্লিশ নয়, সত্তর। দুশ্চিন্তার বলিরেখা তাঁর কপালে এবং নাকের দু'পাশে স্পষ্ট।



হাতসেপসুত এই মিশরের অধিপতি। কিন্তু এমনটা যে কোনদিন হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। ফারাও প্রথম তুতমোসের কন্যা হাতসেপসুত। তাঁর মৃত্যুর পর সৎ ভাই দ্বিতীয় তুতমোসে মিশরের সিংহাসনে বসেন, তাঁর সঙ্গে হাতসেপসুতের বিবাহ হয়। কিন্তু মাত্র তিরিশ বছর বয়সেই দ্বিতীয় তুতমোসে প্রাণ হারান। সেই সময় মিশরের সিংহাসনের দাবিদার দু'বছর বয়সি তৃতীয় তুতমোসে। এত ছোট বালক ফারাওয়ের দায়িত্ব সামলাবে কী ভাবে?

প্রতিটি ক্ষণে আশেপাশের শত্রু দেশগুলি মিশরের দিকে নজর রাখছে তখন, সামান্য দূর্বল মুহূর্ত পেলেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে ঝাপিয়ে পড়বে থীবসের রাজধানী দখল করতে। এই সময় এক নিতান্ত বালকের হাতে তো সাম্রাজ্যের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাই হাতসেপসুত এগিয়ে এসেছিলেন। প্রচলিত সব ধারণাকে ভেঙে দিয়ে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন মিশরের ফারাও হিসাবে। তাঁর সময়ে দেশে শান্তি ফিরে এসেছিল। প্রতিবেশী অসিরি আর মিতানিরা ফারাওয়ের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলছিল। হাতসেপসুত ফারাও হওয়ার পর গত পাঁচ বছরে মিশরের শান্তি সমৃদ্ধির কোন অভাব ছিল না, কিন্তু আচমকাই যেন এক বিরাট অভিশাপ নেমে এল ফারাওয়ের সিংহাসনের উপরে।

ইতিমধ্যে হাতসেপসুত বার তিনেক দাসীদের পাঠিয়ে ইরতেনসেনু ঘুম থেকে উঠেছেন কিনা তার খবর নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল, কোনওভাবেই যেন ইরতেনসেনুকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা না হয়। এত দীর্ঘ যাত্রার দরুন ক্লান্ত শরীরে যথেষ্ট বিশ্রামের প্রয়োজন। ফারাও তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। খানিক আগে মন্ত্রণাকক্ষে উপল প্রবেশ করে, তার হাতে ধরা একগোছা আঙুরে কামড় দিয়ে রানির দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে তাঁকে অভিবাদন জানায় উপল। তারপর নিজের মনেই আঙুর খেতে খেতে মন্ত্রণাকক্ষের একটি আসনে বসে পড়ে সে। যেন সেও হাতসেপসুতের মতোই ইরতেনসেনুদের অপেক্ষা করছে।

খানিকক্ষণ পর কক্ষে ইরতেনসেনু এবং অগস্ত্যকে প্রবেশ করতে দেখা যায়। সামান্য লজ্জিত চোখে ফারাওয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল ইরতেনসেনু। হাতসেপসুত হাসি মুখে তাকে বললেন, 'তোমাদের ঘুম কেমন হল? কোনও অসুবিধা হয়নি তো?'

'না মহামান্যা, আমাদের কোনও অসুবিধা হয়নি। শরীর মন দুইয়েই এখন ক্লান্তির রেশমাত্র নেই।'

এই কথা বলার সময় মন্ত্রণাকক্ষে উপস্থিত বাকিদের দিকে চোখ যাচ্ছিল ইরতেনসেনুর। সে উপলকে দেখতে পেল, হাতের আঙুরের গোছা শেষ করে সে তখন সামনে রাখা থালা থেকে একটি ন্যাশপাতি তুলে নিয়ে তাতে কামড় বসিয়েছে। আর একজনকে দেখে সামান্য অবাক হল ইরতেনসেনু। সে হল বাকারি। বাকারির বয়স ইরতেনসেনুর কাছাকাছি, তার আকার মাঝারি। তার চোখ দুটি প্রায় গোলাকার, চোখের মণি নীল বর্ণের। বাকারিকে দেখতে অনেকটা তার পিতার মতো, কিন্তু সেই মানুষটি এই মন্ত্রণাকক্ষে উপস্থিত নেই কেন?

ইরতেনসেনু হাতসেপসুতকে জিজ্ঞাসা করল, 'মন্ত্রী সেনেনমুতকে দেখছি না তো। তিনি কোথায়?'

হাতসেপসুতের মুখে কালো ছায়া এসে পড়ল। তিনি বললেন, 'সেনেনমুতের আত্মা জীবনের অন্য পাড়ে যাত্রা করেছে ইরতেনসেনু।'

মানে! সেনেনমুত মারা গেছেন! ইরতেনসেনু কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল হাতসেপসুতের দিকে, যেন নিজের কানকেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ইরতেনসেনু শৈশবকালের প্রথম কিছু বছর কেটেছিল থীবসের একটি অনাথ আশ্রমে, সেখান থেকে তার সাত বছর বয়সে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন সেনেনমুত। নিজের কন্যার মতো তাকে বড় করেন তিনি।

পিতা ও মাতার যে স্নেহ থেকে ইরতেনসেনু বঞ্চিত হয়েছিল তার কিছুটা যেন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেনেনমুত। সেই মানুষটি না থাকলে ইরতেনসেনু কোনওদিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেত না, তার বিজ্ঞানীসত্তার বিকাশে এই সেনেনমুতের অবদান অপরিসীম। সেই পিতৃসম মানুষটি মারা গেছেন! ইরতেনসেনুর চোখের জল আঝোরে ঝরতে লাগল তার দু'গাল বেয়ে, সে বালিকার মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। হাতসেপসুত সিংহাসন থেকে উঠে ইরতেনসেনুর পাশে এসে দাঁড়ালেন, দু'হাতে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। কান্না থামার পর ধরা গলায় ইরতেনসেনু হাতসেপসুতকে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে? কীভাবে?'

'দু'মাস আগে। এক অজানা রোগ কেড়ে নেয় সেনেনমুতকে। দেশের সেরা চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। এখন তাঁর স্থানে দেশের মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন বাকারি।'

বাকারি সেই সময় ইরতেনসেনুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যথিত গলায় সে বলল, 'পিতার মৃত্যুর আঘাত আমি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি ইরতেনসেনু। তুমি ছিলে তাঁর কন্যাসমা, আমি বুঝতে পারছি তোমার কষ্টটা।'

ইরতেনসেনু বাকারির মুখের দিকে তাকাল, তার চোখে তখনও জল লেগে রয়েছে। অনাথাশ্রম থেকে সেনেনমুতের বাড়ি আসার পর থেকে সে বাকারির সঙ্গে বড় হয়েছে। তাদের দুজনের স্বভাবের অন্তর অনেক। ইরতেনসেনু নিজেকে বিদ্যা এবং বিজ্ঞানে নিয়োজিত করলেও তাতে বাকারির কোন আগ্রহ ছিল না। তার ইচ্ছা ছিল রাজ্য পরিচালনায়, কূটনীতিতে। পিতা সেনেনমুতের মতো মহামন্ত্রী হওয়ার বাসনা তার ছিল ছোটবেলা থেকেই। আজ সে তাই হয়েছে।

চোখের জল মুছে ইরতেনসেনু বাকারিকে তার মন্ত্রীত্বপদ প্রাপ্তির জন্য অভিবাদন জানাল। নিজেকে সামলে নিয়ে আসন গ্রহণ করল সে। সেনেনমুতকে হারানোর শোক কাটতে সময় লাগবে। কিন্তু ফারাওয়ের এখন তাকে প্রয়োজন। সে এবারে ফারাওয়ের দিকে তাকিয়ে বলল।

'আপনার মুখে এবং শরীরে মালিন্যের ছাপ স্পষ্ট। আপনি আমাকে কী কারণে দেশে আসতে বললেন তা যদি এবার অনুগ্রহ করে জানান। আপনার গুপ্ত পত্র পেয়েই আমরা যাত্রা শুরু করে দিয়েছিলাম। গতকালের দিনটি ক্লান্তি নিবারণে কেটে গেল। দয়া করে জানান কী হয়েছে।'

হাতসেপসুত নিজেই ইরতেনসেনুকে ডেকে এনেছেন। কিন্তু ইরতেনসেনুর এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে যেন সামান্য ইতস্তত বোধ করলেন। এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। তিনি জানেন, যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তা থেকে হয়তো একমাত্র ইরতেনসেনুই তাঁকে উদ্ধার করে আনতে পারবেন। তাহলে দ্বিধা কেন? হাতসেপসুত নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্নটি করলেন।

দ্বিধা আসলে তাঁর অন্তরে। তিনি ফারাও, তাঁর ধমনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আমুন-রার আশীর্বাদ। সেই তাঁরই রাজত্বকালে এমন অভিশাপ এই শহরের উপরে নেমে আসবে তা কে জানত। হাতসেপসুত এখন ক্ষণে ক্ষণে নিজেকেই প্রশ্ন করেন, সত্যিই তিনি ফারাও হওয়ার যোগ্য তো? এক নারী হয়ে মিশরের সিংহাসনে বসে তিনি কি আমুন-রাকে অসন্তুষ্ট করেছেন?

ফারাও হাতসেপসুতকে চুপ করে থাকতে দেখে বাকারি মুখ খুলল, 'এক গুরুতর সমস্যার মধ্যে আমরা পড়েছি ইরতেনসেনু। এমন এক সমস্যা যার জন্য মহামান্যা ফারাওকে মিশরের সিংহাসন থেকে সরে দাঁড়াতে হতে পারে। আর কোন মিশরীয়ই হয়তো এই সিংহাসনে আরোহণ করতে পারবে না। খবরটি এখনও পার্শ্ববর্তী দেশগুলির কাছে পৌঁছয়নি, আমরা যতটা সম্ভব গোপন করে রেখেছি তাকে। এমনকী এই

শহরেরও হাতে গোনা কয়েকজন মানুষই জানে এর অস্তিত্বের কথা। কিন্তু আমার ভয় এই গোপনীয়তাকে রক্ষা করতে না পারলে খবরটি দেশের বাইরে পৌঁছতে সময় লাগবে না, তখন প্রতিবেশী শত্রু দেশের আক্রমণ হবে কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

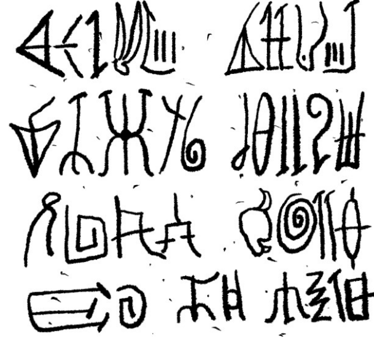
'কিন্তু কী ঘটেছে?'

ইরতেনসেনুর মুখে অস্থিরতার ছাপ স্পষ্ট।

বাকারি এবার আড় চোখে একবার উপলের দিকে তাকাল, অগস্ত্যকে সে আগে থেকেই চেনে, থীবসের সূর্যগ্রহণের দিন ঘটে যাওয়া অলৌকিক কাণ্ডের সাক্ষী ছিল সে। ইরতেনসেনু বলল, 'ওর নাম উপল। ও অগস্ত্যের ভাতৃসম। তার সাহায্য ছাড়া এত দ্রুত আমরা এই দেশে পৌঁছতেই পারতাম না। তুমি নিশ্চিন্তে কথাটি বলতে পারো। গোপনীয়তার শৃঙ্খল এই ঘরের মধ্যেই রক্ষিত থাকবে, আমি কথা দিচ্ছি।'

বাকারি আরও একবার উপলের দিকে সন্দেহভাজন চোখ তাকিয়ে ইরতেনসেনুর দিকে মুখ ফেরাল, তারপর নীচু গলায় কেটে কেটে বলল, 'পুন্তের একটি গাছ মৃত। কোনভাবেই তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে ইরতেনসেনুর মেরুদণ্ড দিয়ে হিমেল স্রোত খেলে গেল। এত বড় সর্বনাশ কীভাবে ঘটল!



১২। পুন্তের বৃক্ষ

সেই দিনের দ্বিতীয় প্রহরে প্রাসাদ থেকে দুটি ঘোড়ায় টানা রথ বেরিয়ে এল। তাদের সামনে পিছনে চলল পঞ্চাশাধিক অস্ত্রধারী সেনারা। একটি রথে অগস্ত্য, উপল এবং ইরতেনসেনু, অপরটিতে স্বয়ং ফারাও হাতসেপসুত এবং বাকারি। সেনা বেষ্টিত শকটদুটি চলল পূর্ব অভিমুখে। তাদের গন্তব্য জেহের জেসেরু।



নদীর তীর থেকে বেশ অনেকখানি ভিতরের দিকে চলে এলে পর জমি আর সবুজ থাকে না। মরুভূমির রুক্ষ আবহাওয়ার মধ্যে বেশ কিছু ছোট ছোট পাহাড় তৈরি হয়েছে এখানে। ক্রমাগত বয়ে চলা শুকনো এবং উষ্ণ বাতাসের ঘর্ষনের ফলে এই পাহাড়গুলি খর্বকায়, এদের গাত্র মসৃণ। পাহাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে জেগে থাকা অনুর্বর জায়গাটির নাম মৃতের উপত্যকা।

এখানে একটি বিরাট বড় কবরখানা আছে। এই কবরখানার বয়স হাজার বছরেরও বেশি। এখানে মাটি, পাথরের নীচে বহুমূল্য রত্নখচিত সমাধি কক্ষের মধ্যে শুয়ে আছেন কয়েকশো ফারাও, তাঁদের স্ত্রী এবং ঘনিষ্ঠ অমাত্যরা। মিশরীয়দের কাছে এই জায়গাটি ভীষণ পবিত্র। এই মৃতের উপত্যকার কাছেই আছে থীবসের কারাগার, পাঁচ বছর আগে বেশ কয়েকদিনের জন্য অগস্ত্যকে এই কারাগারে কাটাতে হয়েছিল।

মৃতের উপত্যকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টির নাম হল আকু। মিশরীয়রা বিশ্বাস করে এই আকু পাহাড়ের চূড়ায় সন্ধ্যাবেলায় দেবী মাত এসে বসেন। তাঁর দুটি পাখা শরীরের দু'দিকে বিস্তৃত করে দেবী মাটির নীচে ঘুমিয়ে থাকা ফারাওদের ছায়া দেন। দিনে দেবতা রা-এর আলোয় ফারাওদের কোন ক্ষতি হয় না, কারণ তারা সবাই রা-এরই সন্তান। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে অপদেবতারা পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসেন। আকাশের চাঁদ আর তারাদের আলো তাদের পথ দেখায়। দেবী মাত সেই আলো থেকে ফারাওদের রক্ষা করেন, যাতে অপদেবতারা তাদের কাছে পৌঁছতে না পারে।

ছ'শো বছর আগে আকু পাহাড়ের দক্ষিণ গায়ে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছিল একটি মন্দিরকে। এই উপত্যকার একমাত্র সৌধ ছিল এটি। ফারাও দ্বিতীয় মেন্তুহোতেপ তৈরি করেছিলেন এই মন্দির। কিন্তু সেই সৌধ খুব বেশি বছর স্থায়ী হয়নি। তৈরি হওয়ার মাত্র পঞ্চাশ বছরের মাথায় তীব্র ভূমিকম্পের প্রকোপে সৌধটি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এখন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটুকু বেঁচে আছে রুক্ষ পাথুরে জমির উপরে।

এই ভেঙে পড়া অট্টালিকা থেকে কিছুটা নীচে পাহাড়ের এই দক্ষিণ গাত্রেই তৈরি হয়েছে ফারাও হাতসেপসুতের সৌধ, তার নাম 'জেহের জেসেরু'। এই কথার অর্থ 'পবিত্রের মধ্যেও পবিত্রতম'। স্বামী

দ্বিতীয় তুতমোসে বেঁচে থাকা কালীন রানি এই সৌধ নির্মাণ শুরু করেন। এই মন্দিরটির নকশা বানিয়েছিল ইরতেনসেনু। সমগ্র মিশর জুড়ে এই মন্দিরটির সমকক্ষ আর একটিও সৌধ নেই। সৌধটি চওড়ায় প্রায় কুড়ি রজ্জুর মতো। দ্বিতল এই মন্দিরের বাইরের দিকে আছে তিরিশটি পাথরের স্তম্ভ, যা দ্বিতীয় তলের ওজনকে ধরে রেখেছে।

মন্দিরের বাইরের গাত্র উজ্জ্বল নীল বর্ণের। স্তম্ভগুলির গায়ে লাল, সবুজ এবং সোনালি রঙে আঁকা আছে হাতসেপসুতের বিভিন্ন ছবি। কোনওটিতে ফারাও দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কোনওটিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট, কোনওটিতে আবার কোনও বিদেশি রাষ্ট্র দূতের হাত থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করছেন। থামগুলির পিছনে মন্দিরের প্রধান প্রবেশ দ্বার। সেই প্রবেশদ্বারের দু'পাশে ফারাও হাতসেপসুত এবং আমুন-রা এর ছবি খোদাই করা। মন্দিরের ভিতরে বেশ কয়েকটি কক্ষ, এখানে দেবদেবীর মূর্তি রাখা আছে। কোনওটিতে আছে জ্ঞানের দেবতা থথ, কোনওটিতে সমৃদ্ধি ও শান্তির দেবী হাথোর, কোনটিতে আবার দেবতা হোরাসের মূর্তি।

মন্দিরের একেবারে ভিতরের দিকে রয়েছে গর্ভগৃহ, সেখানে পুজিত হন মিশরের যুদ্ধের দেবতা মন্তু। দেশের এই একটি মাত্র মন্দিরেই দেবতা রা কিংবা হোরাসের উপরে কোন অন্য দেবতার স্থান। দু'বৎসর আগে এই মন্দির নির্মাণ সমাধা হলে সাধারণ মানুষের জন্য তা খুলে দেওয়া হয়। তবে গত দু'মাস ধরে এই মন্দিরে থীবসের জনগনের প্রবেশ নিষেধ। ফারাওয়ের কঠোর নির্দেশ, মন্দিরের ত্রিসীমানাতেও যেন কাউকে দেখা না যায়!

'জেহের জেসেরু' মন্দিরটি পাহাড়ের গায়ে তৈরি হওয়ায় মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে অবস্থিত। মন্দিরের মাঝখান থেকে পাথরে বাঁধানো একটি সোজা পথ ঢালু ভাবে নেমে এসেছে মাটি অবধি। এইখানে প্রায় চার মানুষ সমান উঁচু একটি প্রাচীর আছে। প্রাচীরের গায়ের চওড়া দরজা দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়। সেই দরজা এখন বন্ধ। তার দু'পাশে দশজন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তারা দিবা রাত্রের প্রতিটি মুহূর্ত এখন এই দরজার সামনে পাহারা দেয়।

ফারাও হাতসেপসুতের শকটটিকে বহু দূর থেকে দেখেও এদের চিনতে অসুবিধা হয়নি। শকটের মাথায় রাখা উড়তে থাকে পতাকায় ফারাওয়ের চিহ্ন দেখেই মাথা নীচু করে দরজার দু'পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পরে প্রহরীরা। হাতসেপসুত রথ থেকে নামার উপক্রম করতেই সঙ্গে আসা সৈন্যরা একটি রক্তবর্ণের বর্ণাঢ্য কাপড় মাটিতে বিছানো শুরু করেছিল, যার উপর দিয়ে ফারাও হেঁটে যাবেন। হাতসেপসুত হাতের ইশারায় তাদের বারণ করলেন।

ততক্ষণে অন্য রথটি থেকে ইরতেনসেনুরা নেমে এসেছে। বাকারি সবার সামনে এগোতে লাগল। প্রহরীরা মন্দির প্রাঙ্গণের ভারী দরজা ঠেলে সামান্য ফাঁক করার পর হাতসেপসুত, বাকারি, অগস্ত্য, ইরতেনসেনু এবং উপল তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। বাকারি এবার পিছনে ফিরে প্রহরীদের নির্দেশ করল আবার দরজা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য।

ঢালু পথটি মন্দিরের মূল প্রবেশ দ্বার দিয়ে নেমে এসে যেখানে মাটির সঙ্গে মিশেছে তার দু'পাশে দুই বিশাল আকৃতির মূর্তি। দুটিই সিংহের, বসে থাকা অবস্থায়, কিন্তু তাদের মাথা দুটি মানুষের। মিশরীয় পুরাণের মতে তারা এই মন্দিরের রক্ষাকর্তা, অতন্দ্র প্রহরী। মূর্তি দুটি হলুদ এবং বাদামি রঙ করা। এই দুটি মূর্তির দু'পাশে পাথরের তৈরি দুটি ছোট ছোট গোলাকার ঘেরা জায়গা। বাঁ দিকের ঘেরা অংশটি থেকে একটি গাছ উঠেছে। গাছটির কাণ্ড বেশ প্রশস্ত, উচ্চতায় তিনটি মানুষের সমান তো হবেই। কাণ্ড থেকে সামান্য উপরে ঝাঁকড়া ডালপালা উঠে গেছে। মূল কাণ্ড এবং তার শাখা প্রশাখাগুলি কণ্টকাকীর্ণ।

গাছটির পাতা গাঢ় সবুজবর্ণের। ছোট ছোট শাখাগুলির গায়ে অজস্র শ্বেতবর্ণের ফুল ফুটে আছে। এমন ফুল অগস্ত্য আগে দেখেনি। ফুলগুলি আকারে বড়, পাপড়িগুলি সামান্য দীর্ঘ, তাদের অগ্রভাগ সূঁচালো। একবার দেখলে মনে হয় অন্তত পঞ্চাশটি পাপড়ি তো আছেই এক-একটি ফুলে। পুষ্পটির মাঝখান থেকে সরু সরু

কয়েকটি সুতার মতো গর্ভাশয় বেরিয়ে আছে। এক অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ যেন ঘিরে রেখেছে এই অঞ্চলটিকে। দরজা দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই গন্ধটি পেয়েছিল অগস্ত্য।

এবারে গাছটির সামনে এগিয়ে আসার সময় যেন সেই গন্ধ আরও তীব্রতর হল। গন্ধটির যেন সম্মোহনী ক্ষমতা আছে। অগস্ত্য পাশ ফিরে দেখল উপলও চোখ বন্ধ করে এই সুগন্ধকে উপভোগ করছে, তার চোখে মুখে প্রশান্তি লেগে রয়েছে। কিন্তু বাকিরা আরও একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ডান দিকের গোলাকার ঘেরা জায়গাটির কাছে। হাতসেপসুত, বাকারির মতো ইরতেনসেনুরও চোখ মুখ থমথমে। অগস্ত্য তাদের দিকে এগিয়ে গেল, যাওয়ার সময় উপলের কাঁধে সামান্য টোকা দিয়ে তাকে ডেকে নিল।

মাথা একটু ঝুঁকিয়ে গোল জায়গাটির মধ্যে তাকিয়ে অগস্ত্য বুঝতে পারল এখানেও বাঁ-দিকের গাছটির মতো আরও একটি গাছ ছিল। কিন্তু এখন কেবল তার খর্বকায় শুকনো কাণ্ডটিকে দেখা যাচ্ছে। কালো রঙের কৃশ কাণ্ডটির গায়ে সামান্যতম সবুজের আভাসও নেই, বোঝা যায় এই গাছটি মৃত। এটিই তবে পুন্তের সেই বৃক্ষ, যার জন্য ফারাও এমন বিচলিত। মিশরের রাজপরিবার এই বৃক্ষটির জন্যই এখন ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাসাদ থেকে জেহের জেসেরুর দিকে আসার সময় ইরতেনসেনু এই বৃক্ষের কথা বলেছিল অগস্ত্য এবং উপলকে।

'এই দুই বৃক্ষের বয়স প্রায় ছ'শো বছর। এই দেশের দক্ষিণ দিকে নুবিয়া অঞ্চলে রয়েছে কুশের সাম্রাজ্য। কুশ সাম্রাজ্যের অধিপতিরা কখনও ফারাওয়ের অনুগত ছিল না, বরং তাদের সদাচেষ্টা থাকত উত্তর মিশরের এই থীবসের রাজত্বকে ধ্বংস করা। সেই কারণে ফারাওদের সঙ্গে কুশ সাম্রাজ্যের রাজাদের যুদ্ধ লেগেই থাকত। কিন্তু ফারাওরা বারবার কুশেদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেও কখনও তাদের একেবারে হারিয়ে দিতে পারেনি।

'ফারাও মেন্তুহোতেপই প্রথম তার সৈন্যদল নিয়ে দক্ষিণের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং এক প্রবল যুদ্ধের পর কুশেদের পরাজিত করেন। তার সময় প্রথম বারের জন্য উত্তর এবং দক্ষিণ মিশর ফারাওয়ের অধীনে এক হয়। এই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর ফারাও এবং তার সৈন্যদলেরা এক আশ্চর্য জন্তুর কথা বলতে থাকে। সেই জীব নাকি ফারাওয়ের সঙ্গে কুশেদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। জীবটির নাম ছিল কামারু।'

'আশ্চর্য এক জন্তু ফারাওয়ের হয়ে লড়াই করে? কিন্তু জন্তুটা এল কোথা থেকে?' উপল জিজ্ঞাসা করেছিল।

'পুন্ত থেকে। ফারাও যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে পর দেখা যায় তাঁর সঙ্গে ফিরেছেন দুই ভিনদেশি যুবক। তাদের বেশভুষা একেবারেই মিশরীয়দের মতো নয় আবার নুবিয়দের মতোও নয়। মিশরের দক্ষিণে অনেক গভীরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে নাকি রয়েছে এক আশ্চর্য জনপদ, তার নাম পুন্ত। ফারাও থীবসে ফিরে আসার পর কুশেদের সঙ্গে ঘটা যুদ্ধ নিয়ে অনেক জনশ্রুতি শোনা যায়। যুদ্ধ চলাকালীন ফারাও নাকি প্রায় হারতে বসেছিলেন, কুশেদের ক্রমাগত আক্রমণে কোণঠাসা অবস্থা হয়েছিল মিশরীয় সেনার।

'সেই যুদ্ধ আরও কয়েকদণ্ড চললে নাকি শুধু ফারাও মেন্তুহোতেপই নন, একটিও মিশরীয় সেনা প্রাণ হাতে নিয়ে থীবসে ফিরে আসত না। ঠিক এই সময়েই যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভুত হয় এক বিকট দর্শন জন্তু। তার শরীরটা চিতাবাঘের মতো, কিন্তু গলার কাছ থেকে মাথা অবধি নাকি ছিল একটি ময়াল সাপ। সেই অদ্ভুত দর্শন জন্তুটি নিমেষের মধ্যে কুশেদের সৈন্যদের নির্মম ভাবে হত্যা করতে থাকে, সেই সঙ্গে ফারাও খেয়াল করেন ভিনদেশী আরও কিছু যুবক যুবতী তাঁর হয়ে লড়াই করছে। জন্তুটি যেমন ভাবে এসেছিল ঠিক তেমন ভাবেই অকস্মাৎই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। ততক্ষণে কুশেদের বাহিনী পরাজিত হয়েছে। সেই ভিনদেশিরা নিজেদের পরিচয় দেয় পুন্তের নাগরিক হিসাবে। তাদের কাছ থেকেই ফারাও জানতে পারেন এই জন্তুটির নাম কামারু।'

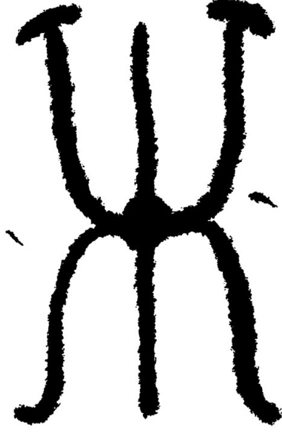
এই সময় অগস্ত্য বলেছিল, 'কিন্তু এই যুদ্ধের সঙ্গে এই বৃক্ষ দুটির কী সম্পর্ক?'

‘হ্যাঁ এবারে সেই কথাতে আসছি। পুন্তের সেই দু’জন নাগরিক বেশ কয়েক মাস ছিল থীবসে। তারপর ফারাও মেন্তুহোতেপ তাদের সঙ্গে পুন্তের নগরে যান। শুধুমাত্র মেন্তুহোতেপকেই সেই নগরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্মত হয়েছিল ভিনদেশিরা। ফারাও দু’মাসের জন্য থীবসে ছিলেন না, তাঁর জায়গায় তাঁর সিংহাসন সামলান জ্যেষ্ঠপুত্র তৃতীয় মেন্তুহোতেপ। দু’মাস পর ফারাও যখন পুন্ত থেকে ফিরে আসেন তখন যেন তিনি অন্য রকমের এক পুরুষ। যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর আর আগ্রহ ছিল না।

‘ফারাও ফিরে আসার সময় নিজের সঙ্গে করে এনেছিলেন দুটি কিশলয়কে। তিনি কিশলয় দুটিকে মাটিতে রোপণ করেন, তারপর সেই দুটি গাছের পিছনে খানিকটা দূরে পাহাড়ের গাত্রে বানান নিজের সৌধ। মেন্তুহোতেপ সেই সময় ঘোষণা করেন যে যুদ্ধের দেবতা মন্তু কামারু নামের দানবের আকার ধারণ করে কুশের যুদ্ধে মিশরীয়দের জিত সুনিশ্চিত করেছেন এবং ফারাওকে রক্ষা করেছেন। মন্দিরটি ফারাও দেবতা মন্তুকে উৎসর্গ করেন।

‘মেন্তুহোতেপ সেই সময় আরও বলেন যে পুন্তের নগরীতে এক আশ্চর্য মন্দিরের সন্ধান পান তিনি। সেই মন্দিরের উদ্যান থেকে তিনি এই কিশলয় দুটিকে তুলে নিয়ে এসেছেন, স্বয়ং দেবতা মন্তুর আশীর্বাদধন্য এই গাছ দুটি। এরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন দেবতা মন্তু মিশরীয়দের বহিরাগত শক্তির আক্রমণ থেকে প্রতিহত করবেন। কয়েক বছরের মধ্যেই গাছ দুটি বেড়ে ওঠে এবং শ্বেতপুষ্পের জন্ম দিতে থাকে।’

অগস্ত্য পাথরে ঘেরা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ফারাও হাতসেপসুত তাঁর মন্দিরটি বানাবার সময় এই গাছ দুটির পিছনে মন্দিরটিকে বানান। কয়েকশো বছর আগের ভূমিকম্পের ফলে মেন্তুহোতেপের মন্দিরটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণও যে এই দুটি গাছ অবধি বিস্তৃত ছিল তা বোঝা যায়। ফারাও-এর উৎকণ্ঠার যথেষ্ট কারণ আছে।



শ্বেতপুষ্পের গাছদুটির একটিও মরে যাওয়ার অর্থ দেবতা মন্তুকে রুষ্ট করা। যে কোন মুহূর্তে কোন একটি প্রতিবেশী দেশ আক্রমণ করলে সেই যুদ্ধে দেবতার আশীর্বাদ আর পাওয়া যাবে না! হার নিশ্চিত! ছ’শো বছরেও যা হয়নি অকস্মাৎ সেই শ্বেতপুষ্পের গাছের মৃত্যুতে দেশের মানুষ ফারাওয়ের দিকেই আঙুল তুলবে, কারণ মর্তবাসীদের মধ্যে তিনিই ঈশ্বরের সবচেয়ে নিকটের। তাঁর কোনও ভুলেই হয়তো দেবতা মন্তুর অভিশাপে গাছটি মারা গেল। এই অবস্থায় মিশরবাসীরা রাজদ্রোহও করে বসতে পারে।

মৃত গাছের কাণ্ডটির দিকে তাকিয়ে থেকেই অগস্ত্য বলল, ‘কবে মারা গেছে গাছটি?’

বাকারি উত্তর দিল, ‘এক মাস হল।’

‘কী ভাবে? কোন জরার লক্ষণ দেখেছিলেন গাছটির মধ্যে? অনেক সময় জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বৃক্ষের কাণ্ড শুকিয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে বেশ কয়েক মাস ধরে দেখা যাবে যে গাছের পাতাগুলি হলুদ বর্ণের

হয়ে যাচ্ছে অথবা কোন ফুল আর ফুটছে না। তেমন কিছু খেয়াল করেছিলেন আপনারা?'

'না সেরকম কিছু ঘটেনি। একদিন ভোর বেলায় হঠাৎই এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এসে খবর দেন যে একটি শ্বেতপুষ্পের গাছ মৃত! খবরটি পেয়ে আমি আর কালক্ষেপ করিনি, নিজে পরিদর্শন করতে আসি। দেখি যে গাছটি সত্যিই মৃত, এক রাতের মধ্যে যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তার সমস্ত জীবন রস শুষে নিয়েছে। বৃক্ষটির সব কটি পল্লব ঝরে গেছে, ফুলগুলি নষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সেইদিন থেকে এই মন্দিরে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ করি। কয়েকজন রক্ষী, যারা সেইদিন ভোরে মন্দিরের বাইরে পাহারা দিচ্ছিল, তারা এই ঘটনাটির কথা জানতে পেরেছিল। মোটা উপঢৌকন দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা হয়েছে। মন্দিরের পুরোহিত এই কথা গোপন রাখবেন জানি। তিনি ঈশ্বরের অভিশাপের ভয়ে ভীত হয়ে আছেন।'

উপল এবারে বলল, 'আচ্ছা এই বাম পাশের গাছটি থেকে আরেকটি ছোট কিশলয় বানানো যায় না? তাহলেই তো এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।'

'না সেটি সম্ভব নয়, এই অঞ্চলে আর একটিও এত বড় বৃক্ষ লক্ষ করেছেন? এই রুক্ষ পরিবেশে শুষ্ক মাটিতে ছোট ছোট কিছু গুল্ম ছাড়া আর কোন উদ্ভিদই জন্মায় না, সেখানে এই দুটি বৃক্ষ এতগুলো বছর ধরে বেঁচে থাকাই বিস্ময়ের। এই বৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র শাখাও কেউ ভাঙতে সাহস করে না, এর পুষ্পকে কেউ স্পর্শ করে না, স্বয়ং ফারাওয়েরও সেই অনুমতি নেই। পুষ্প যখন মাটিতে ঝড়ে পরে তখন শুকিয়ে যায়, সুতরাং তা থেকেও যে-কোনও নতুন কিশলয় তৈরি করা সম্ভব এমনও নয়।'

'হুম, বুঝলাম। তাহলে পুন্তে গিয়ে এমন আরেকটি বৃক্ষ নিয়ে এলে এই সমস্যার সমাধান হবে।'

উপলের এই কথায় ফারাও হাতসেপসুত ম্লান হাসলেন। এবার তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সেটিই একমাত্র উপায়।'

অগস্ত্য বলল, 'তাহলে তো সেই নগরীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেই হয়।'

'সেই নগরী যে কোথায় তা কেউ জানে না অগস্ত্য। একমাত্র একজনই জানতেন এর হদিস, তিনি ছিলেন ফারাও মেন্তুহোতেপ। সেই হারিয়ে যাওয়া গুপ্তনগরীর সন্ধান করার জন্যই আমি ইরতেনসেনুকে এই দেশে আসতে বলেছিলাম।'

ইরতেনসেনু ফারাওয়ের এই কথায় অবাক হয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকাল। সে কীভাবে পারবে হাতসেপসুতকে সাহায্য করতে? পুন্ত শহরের নাম সে অন্য থীবসবাসীদের মতোই শৈশবকাল থেকে শুনে এসেছে। কিন্তু সেই শহর কোথায় সে কীভাবে জানবে? ছ'শো বছর পর সেই শহরের অস্তিত্ব আজও আছে কি না তাই তো জানা নেই।

ফারাও ইরতেনসেনুর দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন, বললেন, 'এখান থেকে রাজকীয় পাঠাগারে যাব আমরা, আমি তোমাকে কিছু দেখাতে চাই।'

অগস্ত্য এই সময় বলল, 'আপনি বাকারির সঙ্গে প্রাসাদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করুন ফারাও। আমরা কিছুক্ষণ পরে আসছি, এই জায়গাটি আরেকটু ভালো করে দেখে নিতে চাই। কথা দিচ্ছি খুব বেশি বিলম্ব করব না, আমরা প্রাসাদে পৌঁছেই আপনার সঙ্গে পাঠাগারে দেখা করব।'

হাতসেপসুত এবং বাকারি রথ নিয়ে চলে গেলেন, তাদের সঙ্গে আসা সৈন্যরাও প্রাসাদের উদ্দেশে যাত্রা করল। অগস্ত্যদের জন্য একটি অশ্বশকট দাঁড়িয়ে রইল মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে। ইরতেনসেনু তখনও মাটির দিকে তাকিয়ে এক মনে ভেবে চলেছে, সে রানিকে কীভাবে সাহায্য করবে? তাকে রানি এত দূর থেকে ডেকে যখন এনেছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু ভেবেছেন। ইরতেনসেনুর চমক কাটল অগস্ত্যর কথায়, 'এখানে কোন আগ্নেয়গিরি আছে?'

ইরতেনসেনু পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখল অগস্ত্য মাটির কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। পাথরে ঢাকা জায়গাটির সামান্য মাটি হাতে নিয়ে নাকের কাছে এনে তার গন্ধ শুঁকছে। অগস্ত্যর মুখ বিকৃত, যেন কোন

তীব্র গন্ধ তার নাকে এসে লেগেছে। ইরতেনসেনু অগস্ত্যর প্রশ্নটি ভালোভাবে শোনেনি, সে বলল, 'কী বলছ?'

'বলছি এখানে, মানে এই দেশে কোন আগ্নেয়গিরি আছে?'

'না তো।'

'হুম, ব্যাপারটা তাহলে বড়ই অদ্ভুত লাগছে। উপল, একবার এই জায়গাটিতে দেখো।'

উপল অগস্ত্যর দেখাদেখি তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল, অগস্ত্যর এগিয়ে রাখা তর্জনী লক্ষ্য করে কিছুটা মাটি হাতে তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকল, সঙ্গে সঙ্গে তারও মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। অগস্ত্য তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বুঝছ?'

'এই গন্ধ খুব চেনা লাগছে কেন?

'চেনা লাগা স্বাভাবিক, আমাদের দেশে কোন কোন ঔষধে এই গন্ধ পাও না?'

অগস্ত্যর এই কথায় উপলের ভ্রু সামান্য কোঁচকালো, পরক্ষণেই উত্তেজিত হয়ে সে বলল, গন্ধক! এই গন্ধটি তো গন্ধকের!'

'একদম তাই, গন্ধক মিশে আছে এই মাটিতে।'

কিছুটা মাটি এবারে ও ইরতেনসেনুর সামনে নিয়ে এসে ধরল, ইরতেনসেনুও এবারে গন্ধকের তীব্র গন্ধ পেল। অগস্ত্য বলল, 'এই মাটির কণার খুব কাছে চোখ নিয়ে এসে দেখো, হলুদ বর্ণের সূক্ষ্ম দানা দেখতে পাবে, ওগুলো গন্ধক। কিন্তু এখানকার মাটিতে গন্ধক আসবে কী করে?'

সে দ্রুত পায়ে হেঁটে গেল বাম দিকের গাছটির দিক, গাছটির নিচের মাটি হাতে নিয়ে তার ঘ্রাণ নিল, তারপর বলল, 'না, এতে তেমন কোন গন্ধ নেই। তাহলে ওই দিকের গাছটির মাটিতে গন্ধক মেশানো হয়েছে, কেউ নিশ্চয়ই মিশিয়েছে। গন্ধক অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করে ঔষধ তৈরি করা যায়, কিন্তু অতিরিক্ত গন্ধক আবার বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।'

ইরতেনসেনুর চোখ দুটি বিস্ফারিত হল। সে বিস্ময় মাখানো সুরে বলল, 'তার মানে কেউ এই মাটিতে গন্ধক মিশিয়ে দিয়েছিল! যাতে বৃক্ষটি মরে যায়!'

'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র!'

উপল উত্তেজনার বশে সামান্য উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল। অগস্ত্য এর উত্তরে উপরে নীচে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'খুব সম্ভবত তাইই, ফারাও হাতসেপসুতকে কেউ সিংহাসনচ্যুত করতে চায়। কিন্তু কে? রাজপরিবারের কেউ? এ এখনই বোঝা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের সাবধান থাকতে হবে। যে বা যারা এই কাজটি করেছে তারা নিশ্চয় আমাদের উপরেও নজর রাখবে।'

এবার অগস্ত্য আবার ইরতেনসেনুর দিকে ফিরল, 'আর একটি ব্যাপার ইরতেনসেনু। ফারাও মেন্তুহোতেপের সৌধের ধ্বংসস্তুপটি একবার দেখতে চাই। তুমি নিশ্চয়ই পথ চেনো।'

হাতসেপসুতের মন্দিরটিকে পিছনে ফেলে ইরতেনসেনুরা পাহাড়ের গা বেয়ে আরও একটু উপরের দিকে উঠতে লাগল। পাহাড়ের ছোট বড় নুড়ি পাথরের উপরে সাবধানে পা ফেলতে লাগল তারা। বেশ কিছুটা উপরে ওঠার পর একটি সমতল ক্ষেত্রে এসে পড়ল তারা। নীচ থেকে দেখে বোঝা যায় না এই জায়গাটির অস্তিত্ব। তবে ধ্বংসাবশেষের অবস্থা দেখে বোঝা যায়, এখানেও কোনও এক সময় একটি সৌধ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকত।

এখন শুধুমাত্র তার খিলানের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে মাটির উপরে। চারদিকে ভাঙা বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ছ'শো বছর আগের দেবালয় এখন কেবল ইতিহাসের অংশবিশেষ। মন্দির গাত্রের একটি মাত্র প্রাকারের কিছুটা অক্ষুণ্ণ, সেই অংশটি এখনও মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। অগস্ত্যরা প্রাকারটির দিকে এগিয়ে গেল।



প্রাকারটি উচ্চতায় দু'মানুষ সমান। তবে প্রস্থে খুব বেশি নয়, কারণ দু'পাশের বেশিরভাগটাই ভেঙে গিয়েছে। অগস্ত্য দেখল সেটির গায়ে কিছু ছবি খোদাই করা রয়েছে। সেখানেও ফাটল ধরেছে এবং রোদ-জল-তাপে রং বিবর্ণ হয়ে এসেছে। তবু বোঝা যায় প্রাকারের দু'পাশে আঁকা হয়েছিল দুটি ছবি। বাম পাশের ছবিতে দুটি শ্বেতপুষ্প গাছ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আছে, গাছ দুটির মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক পুরুষ। তার পরনের বেশভুষা আর মাথার মুকুট দেখে বোঝা যায় তিনি ফারাও মেন্তুহোতেপ ব্যতীত আর কেউ নন।

ডানদিকে চোখ ফিরিয়ে অন্য ছবিটির দিকে তাকাতেই যেন হাড় হিম হয়ে গেল অগস্ত্যর। মনে হল সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে! এতশত বছরে এই ছবির রং চটেছে---জল, হাওয়া, বাতাসে ক্ষয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, কিন্তু তবুও যেন আজও এই ছবি একই রকমের ভয় এবং সম্ভ্রমের উদ্রেক করতে পারে মানুষের মনে। অগস্ত্যর সামনের ছবিটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক দানব। তার শরীর চিতাবাঘের, কাঁধের উপরের অংশের জায়গায় একটি ভয়াবহ ময়াল সাপ যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন চকিতে সে শিকারকে তার নাগপাশে আবদ্ধ করতে উদ্দ্যত। তবে এই সেই কামারু! দেবতা মন্তুর দানবিক রূপ! মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই ছবির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অগস্ত্য, উপল এবং ইরতেনসেনু।

১৩। মেন্তুহোতেপের প্যাপিরাস

প্রাসাদে ফিরে আসার পর এক পরিচারিকার সঙ্গে গ্রন্থাগারে এল অগস্ত্যরা। ফারাও এবং বাকারি কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হলেন, অগস্ত্যদের পৌঁছনোর খবর তাঁরা পেয়েছিলেন। হাতসেপসুত তাঁর বর্ণাঢ্য অঙ্গবস্ত্র ছেড়ে এখন একটি হালকা হলুদ বর্ণের বস্ত্র পরে আছেন, তাঁর অঙ্গশোভা বিহীন চিন্তান্বিত মুখের কালিমা দেখে আরও একবার বুকের মধ্যে কষ্ট অনুভব করল ইরতেনসেনু। এক নারী হয়েও আজ হাতসেপসুত যে উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যেতে পেরেছেন তার কথা যুগ যুগান্তর ধরে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

মিশরের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাঁকে বারবার নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়েছে। এমনকি নিজের অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও রাজদরবারে হাতসেপসুতকে সোনার তৈরি নকল দাড়ি পরতে হয়। ফারাও যে কেবলমাত্র এক পুরুষই হতে পারবে এমন ভাবনা যেন মিশরের মানুষের মনের অবচেতনে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি যে বুদ্ধিতে এবং সাহসে কোন পুরুষের চেয়ে কম নন তা হাতসেপসুত বারবার প্রমাণ করেছেন।

মিশরে ফেরার পর ইরতেনসেনু শুনেছে যে হাতসেপসুতের কূটনৈতিক বুদ্ধিবলে হিতাইত জাতির সঙ্গে বহুবছরের শত্রুতার পর প্রথমবার সন্ধিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে আবার তিনি নাকি সম্মুখে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে কঠোর হাতে পশ্চিম মিশরের একটি দাঙ্গাকে দমন করেছেন। কিন্তু নিয়তির লিখন হয়তো অন্যরকম ছিল, নারী হওয়ার জন্যই কি এখন তাকে আরও একবার এমন কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে?

'মন্দিরে অনুসন্ধান করে কিছু অনুমান করতে পারলে?' হাতসেপসুত ইরতেনসেনুর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন।

'না ফারাও, তেমন কিছু না। অগস্ত্যরা আগে কখনও জেহের জেসেরু দেখেনি তো, আমিও এই মন্দির তৈরি হওয়ার সময়টুকু দেখেছিলাম। তাই আজ একটু মন্দিরটি ঘুরে দেখলাম।'

মাটিতে গন্ধক পাওয়ার কথা ইরতেনসেনু বলল না, তারা ঠিক করে নিয়েছিল যে, বিষক্রিয়ার কারণে শ্বেতপুষ্পের গাছের মৃত্যুর কথাটা তারা ফারাওকে জানাবে না। কারণ তারা নিজেরাই এখনও নিজেদের অনুমানের উপরে সন্দিহান। আর এখন এই কথা জানিয়ে ফারাওকে আরও বিচলিত করে দেওয়াও ঠিক হবে না।

ইরতেনসেনুর কথায় ম্লান হাসলেন হাতসেপসুত, 'তোমার তৈরি নকশায় বানানো জেহের জেসেরু। মিশরে এমন অপরূপ মন্দির আর দ্বিতীয়টি নেই। তবুও কোথাও কোনও কারণে হয়তো ভগবান আমার উপরে রুষ্ট হয়েছেন।'

এই বলে কিছুক্ষণ মাথা নামিয়ে চুপ করে থাকলেন। ফারাওয়ের এই কথার কোনও উত্তর ইরতেনসেনুর কাছে ছিল না, সেও চুপ করে রইল। নিস্তব্ধ গ্রন্থাগারের মধ্যে আরও একটি অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার সৃষ্টি হল যেন। সেটিকে কাটাবার জন্যই সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে উপল বলল, 'আপনি আমাদের কিছু একটা দেখাবেন বলেছিলেন ফারাও। যে কারণে ইরতেনসেনুকে এখানে ডেকে আনা।'

উপলের কথায় হাতসেপসুতের যেন সম্বিত ফিরল, তিনি এবার বললেন, 'হ্যাঁ, আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।'

হাতসেপসুত আর বাকারির পিছনে গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগল ইরতেনসেনুরা। থীবস শহরের জনসাধারণের জন্য একটি আলাদা গ্রন্থাগার থাকলেও প্রাসাদের অভ্যন্তরে এই গ্রন্থাগারটি কেবলমাত্র বিশেষ

কয়েকজনের জন্য উন্মুক্ত। ফারাও এবং তাঁর রাজসভার অমাত্যরা ছাড়া দেশের মন্দিরগুলির প্রধান পুরোহিতরাই কেবল এই গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে পারেন।

গ্রন্থাগারটি আকারে বেশ বড়। দৈর্ঘ্যে প্রায় আশি হাত লম্বা, প্রস্থে কুড়ি হাতের মতো। ঘরের দু'পাশে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে বড় বড় কাঠের তৈরি দেরাজ। তাদের মধ্যে রাখা আছে অসংখ্য কুণ্ডলী পাকানো প্যাপিরাস, পোড়ামাটি আর পাথরের পট্ট। মিশরীয়রা লেখালিখির জন্য এই তিনটি মাধ্যম ব্যবহার করে। একসময় নিজের গবেষণার তেমন কোনও কাজ না থাকলে দিনের প্রায় গোটাটাই ইরতেনসেনু এখানে কাটাতো। এই দেশের কত জ্ঞানী মানুষের হস্তে লিখিত কত মূল্যবান পাণ্ডুলিপি যে এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে তার সঠিক হিসাব মনে হয় কেউ জানে না।

পাণ্ডুলিপিগুলির বিষয়ও নানা রকমের। কোনওটির বিষয় হয়তো বিজ্ঞান, কোনটি আবার দেশের বিশেষ কোনও ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছে। আবার কোন পাণ্ডুলিপিতে দেশের ভূগোল, জল, মাটি, বায়ু নিয়ে লেখা আছে। পাথর এবং পোড়ামাটির পট্টগুলির বেশিরভাগ কোন আগের ফারাও-এর দেশের জনগনের জন্য তৈরি নিয়মাবলী। রাজত্ব পরিচালনার সময়ে কখনও কখনও মহামন্ত্রী বা ফারাওদের এই প্রাচীন পট্টগুলির দ্বারস্থ হতে হয়।

হাতসেপসুত ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। এখানে দেওয়ালের গায়ে একটি অংশে মাটি থেকে কিছুটা উপরে একটি ছোট কাঠের দরজা আছে। দরজাটির আকার দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তার পিছনে কোন কুঠুরি অবস্থিত। দরজাটি বাদামি বর্ণের, তার গায়ে সোনার পাতের উপরে তৈরি ফারাওয়ের প্রতীক লাগানো রয়েছে। এই ছোট্ট কুঠুরিতে রক্ষিত যা কিছু তা ফারাওয়ের নিজের সম্পত্তি।

ইরতেনসেনু বরাবর দরজাটিকে বন্ধ অবস্থাতেই দেখে এসেছে। কাঠের গায়ে ডান দিকে একটি ছোট ছিদ্র রয়েছে। রানি হাতসেপসুত তাঁর মাথার চুলের খোঁপা থেকে একটি লম্বা সরু শলাকা বার করে আনলেন। কুমিরের দাঁত থেকে তৈরি শলাকাটি একটি আঙুলের মতো লম্বা, শ্বেতবর্ণের। কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায় শলাকাটির গায়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব ছেড়ে বেশ কিছু খাঁজ কাটা আছে। হাতসেপসুত শলাকাটি দরজার গায়ের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করালেন। তারপরে শলাকাটিকে সামান্য ঘোরালেন। খুট করে একটি শব্দ হল। দরজাটি খুললেন ফারাও। গ্রন্থাগারের দেওয়ালে লাগানো একটি মশাল খুলে নিয়ে এসে কুঠুরির কাছে ধরল বাকারি।

অগস্ত্য, উপল এবং ইরতেনসেনু সামনের দিকে ঝুঁকে এল। ডান হাত কুঠুরির মধ্যে ঢুকিয়ে একটি প্যাপিরাসের কুণ্ডলী বার করে আনলেন হাতসেপসুত। তারপর কোন কথা না বলে সেটিকে ইরতেনসেনুর হাতে দিলেন। ইরতেনসেনু সেটিকে নিয়ে কাছেই রাখা একটি ত্রিপদীর সামনে এসে দাঁড়াল। খুব যত্ন নিয়ে প্যাপিরাসের কুণ্ডলীটিকে দেখতে দেখতে বলল, 'এর গায়ে তো ফারাও মেন্তুহোতেপের সিলমোহর লাগানো আছে।'

'হ্যাঁ, এই প্যাপিরাসটি মেন্তুহোতেপের নিজ হস্তে লেখা। তবে সিলমোহরের গায়ের হরফগুলি মিশরীয় হলেও ভিতরের ভাষা মিশরীয় নয়।'

ইরতেনসেনু অবাক চোখে হাতসেপসুতের দিকে তাকাল, তারপর সাবধানে শীলমোহর সরিয়ে প্যাপিরাসের কুণ্ডলীটিকে খুলতে লাগল। হাতসেপসুত বলে চললেন, 'ফারাও মেন্তুহোতেপ পুন্ত থেকে ফেরবার পর কিছু একটা লিখে রাখেন এই প্যাপিরাসে। তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল যে সর্বদা এটি যেন ফারাওয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহেই থাকে। আর অন্য কেউ যেন ফারাওয়ের অনুমতি ব্যতীত এই প্যাপিরাসকে স্পর্শ না করে। কিন্তু এর ভাষা মিশরীয় ছিল না। দু'বছর দক্ষিণের সেই নগরীতে কাটিয়ে তাদের ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন মেন্তুহোতেপ। সেই হরফে লেখা এই প্যাপিরাস।'

ইরতেনসেনু কুণ্ডলীটিকে খুলেই তার হরফগুলিকে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন চলে গেল প্রায় কুড়ি বছর আগের এক সন্ধ্যাবেলায়। এক কিশোরী প্রবল মনযোগ দিয়ে একটি অদ্ভুত ভাষাকে আয়ত্ত করার চেষ্টায় রত। তাকে তার পালক পিতা এই শিক্ষা প্রদান করেন প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায়। কাজটি মোটেই সহজ

নয়, এই অদ্ভুত ভাষার হরফগুলিকে শিখতে কিশোরীকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। অথচ সে দেখে যে তার আশে পাশের কেউ এই ভাষায় কথা বলে না, এই হরফে লেখা কোনও প্যাপিরাস অথবা মন্দির গাত্রের কোনও মন্ত্র সে পড়েনি। অনুশীলনের প্রয়োজন ব্যতীত আর কোথাও সে এই ভাষার অস্তিত্ব দেখতে পায় না। তাই একদিন সে তার পালক পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই ভাষাটি আমি কেন শিখছি? এর ব্যবহার তো আমাকে কোনদিন করতে হয় না।'

ইরতেনসেনুর আজ মনে পড়ল আবার, সেদিন তার সেই প্রশ্নে সেনেনমুতের মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। নিজের স্বাভাবিক শান্ত স্বরে তখন তিনি বলেছিলেন, 'প্রিয় কন্যা, এই ভাষা তোমাকে আয়ত্ত করতেই হবে। এই ভাষার পাঠ এই দেশে একমাত্র আমি করতে পারি, সেই জ্ঞান আমি কেবল তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। ঈশ্বর করুন এই ভাষার সম্মুখীন যেন তোমাকে কখনও না হতে হয়। যদি কখনও তেমন দিন আসে তাহলে জানবে, এই ভূখণ্ডের উপরে মহাবিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে। সেদিন তোমার এই বিদ্যা কাজে আসবে।'

তাহলে আজই সেই দিন! কৈশোরের সেই শিক্ষার দিনগুলির কথা ইরতেনসেনু বিস্মৃত হয়েছিল। আজ এই প্যাপিরাস হাতে নিয়ে যেন সেই সন্ধ্যাগুলিকে স্পষ্ট দেখতে পেল সে। আজ সত্যিই এই দেশের ভবিষ্যত অনিশ্চিত, শিয়রে বিপদ এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের সমস্ত স্নায়ুকে একত্র করে প্যাপিরাসটির উপরে ঝুঁকে পড়ল ইরতেনসেনু। দেশের দায়িত্ব এখন তার কাঁধে।

ফারাও মেন্তুহোতেপ এই প্যাপিরাসের কোথাও পুন্তের হারানো সেই শহরের কথা লিখে থাকলে সেই শহরে পৌঁছনোর পথের কথাও নিশ্চয়ই লিখে গেছেন। মশালের কমলা-হলুদ আলোয় প্যাপিরাসের গায়ে লেখা হরফগুলিকে পড়ার চেষ্টা করতে শুরু করল সে। বহু বছর আগে শেখা ভাষাটি একেবারে ভুলে যায়নি সে, হরফগুলিকে চিনতে পারছে একটু একটু করে।

ইরতেনসেনুর দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল অগস্ত্য এবং উপল। তারা দুজনেই মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে হরফগুলিকে দেখতে লাগল। এই ভাষার চিহ্নগুলি কিছু সাংকেতিক ছবি এবং কিছু দাগের সমন্বয়ে তৈরি। সংকেতগুলি জীবের, সেগুলি যেন কিছু মাছ, পাখি এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো। তার সঙ্গে মিলে মিশে থাকা দাগগুলি রয়েছে উল্লম্ব এবং পাশাপাশি। দাগগুলি সরল রেখাতে হলেও তাদের কোনওটির মাথার কাছে সামান্য চওড়া এবং কৌনিক একটি করে দাগ দেওয়া রয়েছে। অগস্ত্য এবং উপল পরস্পরের মুখের দিকে চাইল, তাদের দুজনের চোখেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। পরক্ষণেই আবার তারা প্যাপিরাসটির দিকে তাকাল।



ইরতেনসেনু বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্যাপিরাসটি নিরীক্ষণ করে চলল। হঠাৎই তার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হল, ফারাওয়ের দিকে চেয়ে সে বলল, 'মহামান্যা ফারাও, আপনি দয়া করে আজকের রাতটুকু আমাকে দিন। বহু বছরের অনুশীলন না থাকার কারণে সবক'টি হরফ চিনতে আমার অসুবিধা হচ্ছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার স্মৃতি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আজ রাতের মধ্যেই এই প্যাপিরাসের পাঠোদ্ধারে সক্ষম হব আমি। হয়তো এতেই খুঁজে পাব পুন্ত শহরে পৌঁছনোর উপায়। কিন্তু আপনি কীভাবে জানলেন যে আমি এই ভাষাটি পড়তে পারব?'

হাতসেপসুত কিছু বলার আগে বাকারি বলল, 'পিতা মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন আমাকে বলে গিয়েছিলেন, পুন্ত শহরের ভাষা তুমিই কেবল জানো, কোনও প্রয়োজনে যেন তোমার সাহায্যপ্রার্থী হই। সেই দিনটি যে এত দ্রুত চলে আসবে তা ভাবিনি।'

সেনেনমুত যে জীবিত নেই সেই চিন্তা যেন আরও একবার ইরতেনসেনুকে আঘাত করল। তার হৃদয় আর্দ্র হয়ে এল। কিন্তু পরক্ষণেই মনকে শক্ত করে নিল সে। সেনেনমুত তাকে যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তা সে পালন করবেই। অগস্ত্য এবং উপলের সঙ্গে সে অতিথিশালায় ফিরে এল। সঙ্গে করে নিয়ে এল প্যাপিরাসটিকে। রাত্রের আহারের শেষে অগস্ত্য এবং উপল শুয়ে পড়লেও ইরতেনসেনু জেগে রইল, নিমগ্ন হল প্যাপিরাসটির পাঠোদ্ধারে। এই নিস্তব্ধ রাত্রি তার একমাত্র সঙ্গী। সেনেনমুতের আত্মাও যেন এই সময়ে ইরতেনসেনুর পিছনে এসে দাঁড়ালেন, তাকিয়ে রইলেন তার পালিত কন্যাটির দিকে। ইরতেনসেনুর একাগ্র অধ্যয়ন চলতে লাগল।

১৪। প্রহেলিকা

ভোরবেলায় ইরতেনসেনুর ঠেলায় অগস্ত্যর ঘুম ভেঙে গেল। তার পাশাপাশি ধড়ফড় করে উঠে বসল উপলও। উত্তেজিত গলায় ইরতেনসেনু তখন বলে চলেছে, 'আমি পেরেছি! আমি পেরেছি! মেন্তুহোতেপের প্যাপিরাসের পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি আমি!'

তার কুড়ি বছর পূর্বে প্রাপ্ত শিক্ষার সামান্য অংশও যে সে আদতে ভোলেনি এই ভাবনায় ইরতেনসেনুর চোখমুখ ঝলমল করছিল। তার হাতে এখন ধরা আছে অন্য আরেকটি প্যাপিরাসের টুকরো, যাতে সে মিশরীয় ভাষায় লিখে রেখেছে মেন্তুহোতেপের লিখে যাওয়া কথাগুলিকে। অগস্ত্য ঘুম জড়ানো গলায় বলল, 'কী পেলে? পুন্তের শহরের হদিস পাওয়া গেল তাতে?'

ইরতেনসেনুর মুখের ঔজ্জ্বল্য যেন কিছুটা কমে এল। এবারে নিষ্প্রভ গলায় সে বলল, 'না কোনও দিক নির্দেশ নেই। ফারাও মেন্তুহোতেপ একটি প্রহেলিকা লিখে রেখে গেছেন।'

চোখে মুখে জল দিয়ে অগস্ত্য এবং উপল আবার ইরতেনসেনুর পাশে এসে বসল। ঘুম এখন কেটে গেছে, মস্তিষ্ক পরিষ্কার। উপল জিজ্ঞাসা করল, 'কী লেখা আছে তাহলে প্যাপিরাসটিতে, বলো তো।'

এই কথাটি লেখা আছে এতে, 'উল্টো হয়ে শুয়ে থাকা সর্পের মস্তক তুষারে আবৃত। সেখানে কামারু রক্ষা করেন আমুন-রাকে।'

'আর কিছু লেখা নেই?'

'না, আর কিছু নেই। শুধু এইটুকু।'

অগস্ত্য, ইরতেনসেনু এবং উপল এরপর কিছুক্ষণ নীরব রইল। কারোর মুখে শব্দ নেই। এমন প্রহেলিকার সামনে পড়ে তিনজনেই স্তব্ধ। নীরবতা ভঙ্গ হল ইরতেনসেনুর জন্য, রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি জড়ানো গলায় সে বলল, 'এই দুটি বাক্য যে পুন্তের শহরের দিক নির্দেশ করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

অগস্ত্য বলল, 'হ্যাঁ ঠিক। কামারু রক্ষা করেন...কামারু পুন্তের দেবতা তা তোমার মুখে গতকালই শুনলাম, মেন্তুহোতেপকে যে জন্তু নাকি দক্ষিণের যুদ্ধে জিতিয়েছিল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সর্পের মস্তক? তুষার? আমুন-রা?'

'এগুলিরই কোন অর্থ বুঝতে পারছি না।' এই বলে ইরতেনসেনু বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল। হাতদুটিকে শরীরের দু'পাশে টানটান করে ছড়িয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। অগস্ত্যও উঠে দাঁড়াল।

ইরতেনসেনুকে লক্ষ করে বলল, 'অনিদ্রার ক্লান্তি তোমার চোখে মুখে লেগে রয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নাও ইরতেনসেনু। আমি আর উপল ততক্ষণ ভাবছি না হয় এই প্রহেলিকার অর্থ।'

সামান্য হেসে এর প্রত্যুত্তরে ইরতেনসেনু বলল, 'এখন আর ঘুম আসবে না অগস্ত্য। ফারাও এত আশা করে আছেন আমার উপরে। তাঁর চোখের দিকে আমি তাকাতে পারছি না, একটা অস্বস্তি আমাকে গ্রাস করছে। শুধু মনে হচ্ছে এই প্রহেলিকার অন্য প্রান্তে রয়েছে পুন্তের ঠিকানা, সেইটুকু জানতে পারলেই আমরা শ্বেতপুষ্পের বৃক্ষটিকে সংগ্রহ করে আনতে পারি।'

'সেই হারিয়ে যাওয়া শহর এখনও আদৌ বিদ্যমান কি না তাইই কিন্তু আমরা জানি না ইরতেনসেনু।'

'কিন্তু এতটুকু আশা তো বুকের মধ্যে রাখতেই হবে, যে পুন্তের শহর এখনও বেঁচে আছে, সেখানে এখনও শ্বেত পুষ্প ফোটে। এই আশাটুকুর আলোও না থাকলে থীবসের ভবিষ্যত যে অন্ধকার! খবরটিকে কতদিনই বা আর গোপন করে রাখতে পারবেন ফারাও? যে কোনওদিন রাজ্যের সাধারণ মানুষরা জানতে পারবেন শ্বেতপুষ্পের একটি বৃক্ষ মৃত, দেবতা মন্তু আর রক্ষা করছেন না এই দেশকে। ফারাওয়ের

সেনাবাহিনীর উপরে এর প্রভাব কী হবে ভাবতে পারছ? তারা মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে, এরপর যে কোন বহিরাগত আক্রমণে...'

উপল এইসময় বিছানায় আবার শুয়ে পড়েছিল। তার ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু চোখ বুজে শুয়ে থেকেও তার কর্ণে অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনুর কথোপকথন পৌঁছচ্ছিল। ইরতেনসেনুর কথা শেষ হল না, তার আগেই উপল লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'শ্বেতপুষ্প! ঠিক ঠিক! তখন থেকে আমি ভেবে চলেছি মিশরের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তুষার আসবে কীভাবে! পাহাড়ের গায়ে জমে থাকা তুষারের বর্ণ শুভ্র। শুভ্র পুন্তের বৃক্ষের ফুলগুলিও!'

'ঠিক!'

চঞ্চল গলায় অগস্ত্য বলল, 'তাই তো। তাহলে তুষারে আবৃত অংশটিতে খুব সম্ভবত পুন্তের এই বৃক্ষরাজির কথাই বলা হয়েছে। একটি নয়, হয়তো কয়েক সহস্র বৃক্ষ, যাদের কাণ্ডে, শাখা-প্রশাখায় ফুটে থাকা অজস্র পুষ্পকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন তুষারই!'

ইরতেনসেনুর গলাতেও যেন এবারে সামান্য উচ্ছ্বাসের ঝলক দেখা গেল, 'ফারাওয়ের মন্দিরের বাইরে বৃক্ষদুটি কিন্তু গত ছ'শো বছর ধরে বেঁচে ছিল। আমাদের সন্দেহ অনুযায়ী তাদের একটিকে বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা না করা হলে সেটিও আজ মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকত শ্বেতপুষ্পের সমারোহে। অর্থাৎ পুন্তের সেই শহর হারিয়ে গেলেও, তাতে বসবাসকারী মানুষেরা সেখানে আর না থাকলেও সেই বৃক্ষরাজি নিশ্চয় এখনও আছে! প্রকৃতির নিজের খেয়ালে হয়তো কিছু কিশলয়েরও দেখা মিলতে পারে সেখানে! আশা তাহলে আছে অগস্ত্য! আশা আছে!'

'কিন্তু সর্প? আমুন-রা?'

উপল এবার বলল, 'এই দুটি জায়গাতেই আটকে যাচ্ছি আমরা। নাহ, এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে থেকে আমরা আর বেশি কিছু ভাবতে পারব না। বাইরের পরিবেশ এখন হয়তো অতি মনোরম। ভোরের এই সময়টায় সূর্যের তেজ কম থাকে। চল, আমরা একটু হেঁটে আসি।'

উটের উষ্ণ দুধ আর কিছু খেজুর দিয়ে প্রাতরাশ সেরে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়াল অগস্ত্যরা। কিছুক্ষণ আগেই ভোর হয়েছে। থীবস শহর সবেমাত্র জাগা শুরু করেছে। ফারাওয়ের প্রাসাদটি একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কোন অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ মিশরের রীতি। এতে বহুদূর থেকে আগত সেনার গতিবিধির উপরে নজর রাখা যায়।

পাহাড়টির পূর্ব কোলের সমতল অংশে প্রাসাদটি তৈরি হয়েছে। প্রাসাদের পিছনের পাহাড় আরও অনেকটা উপরের দিকে উঠে গেছে। তার চূড়াতে একটি পর্যবেক্ষণ কক্ষ অবস্থিত। এখানে সৈন্যরা দিবারাত্র পাহারারত অবস্থায় থাকে। এখান থেকে চারটি দিকেই নজর রাখা যায়। ইরতেনসেনুরা সরু পাকদণ্ডী বেয়ে সেই চূড়ার দিকে উঠতে লাগল। এই রাস্তা সাধারণের নিত্য চলাচলের যোগ্য নয়। সৈন্যরা ছোট বড় পাথর সরিয়ে ভেঙে কোনরকমে যাওয়ার একটি পথ তৈরি করেছে। প্রথমে ইরতেনসেনু, তার পিছনে অগস্ত্য এবং উপল এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে চলতে লাগল।

চূড়ায় পৌঁছতে বেশ বেগ পেতে হল তাদের, এই পথে আসার জন্য যে পাদুকার প্রয়োজন তা তাদের তিনজনের কারোর পায়েই ছিল না। কিন্তু চূড়ায় পৌঁছে যে দৃশ্যের সম্মুখীন তারা হল তাতে এত পরিশ্রম যে সার্থক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দিগন্তে উজ্জ্বল রক্তবর্ণের সূর্যকে দেখা যাচ্ছে। দিনের এই সময়টায় তার দিকে চোখ মেলে তাকানো যায়। সূর্যের নরম আলোয় নীচে থীবস নগরীকে যেন ঘুমন্ত মায়াবিনীর মতো লাগছে, সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়ায় সে যেন একটু একটু করে জেগে উঠছে।

নগরীর বাসিন্দাদের কক্ষে রাত্রে প্রদীপের আলো জ্বলে, সরণীগুলির ধারে জ্বলতে থাকে মশাল। এখনও তাদের সবক'টি নিভে যায়নি। এত উপর থেকে সেই ক্ষীণ আলোর বিন্দুগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে ঘুমন্ত এই

মায়বিনীর অঙ্গে যেন স্বর্ণের ঝলকানি। শহর ছাড়িয়ে উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণের দিকে যতদূর চোখ যায় ততদূরই ধূ-ধূ মরুভূমি। পূর্বে অনেকটা দূরে বয়ে চলেছে নীলনদ। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে প্রাণ ভোরে শ্বাস নিল তারা তিনজন। পর্যবেক্ষণ কক্ষটি থেকে একজন পাহারাদারী সেনা বেরিয়ে এসেছিল।

ইরতেনসেনুদের দেখে মাথা নীচু করে কুর্নিশ জানিয়ে সে আবার কক্ষে ফিরে গেল। ফারাওয়ের প্রাসাদে আগত তিন অতিথির কথা সে শুনেছিল, তাদের মধ্যে একজন প্রাক্তন রাজ-উপদেষ্টা এবং বৈজ্ঞানিক ইরতেনসেনু তা সে জানে। একটি প্রশস্ত পাথরের উপরে ইরতেনসেনুরা তিনজন বসল। এই পরিবেশে মন অনেকটা শান্ত লাগছে। এতে যেন চিন্তাগুলিকেও কেন্দ্রীভূত করা যায় ভালো ভাবে। উপল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, ‘সর্প, ফারাও মেন্তুহোতেপ কোন সর্পের কথা বলে গেছেন তা বুঝতে পারছি না। এই দেশে কেমন ধরণের সর্প দেখতে পাওয়া যায় ইরতেনসেনু?’



‘তিন-চার প্রকারের সর্প আছে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগকেই দেখা যায় মরুভূমিতে। সবচেয়ে বিষধর সর্প হল গোখরো। এদের মাথার দু’পাশে চোখের ঠিক উপরে ছোট ছোট দুটি শৃঙ্গ থাকে। এদের একটি ছোবলেই মৃতু নিশ্চিত। এছাড়া আছে বালির ময়াল সাপ। এগুলি বিষধর নয়, কিন্তু এরা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে গোখরোর তুলনায় বেশ কয়েকগুণ বড়। এরা শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে তার শ্বাসরোধ করে দেয়। মরুভূমিতে ছোট হরিণ বা পক্ষীকে শিকার করে অনায়াসে এরা গিলে ফেলতে পারে। আর নগরীর মধ্যে গৃহস্থের ভিটার আনাচে কানাচে থাকে কিছু বেলে সাপ, এরা নির্বিষ।’

‘হুম, এই সাপগুলির একটির কথাই কি বলেছিলেন ফারাও মেন্তুহোতেপ?’

‘জানি না উপল, মেন্তুহোতেপ কেন সর্পের কথা বলছেন তা কিছুতেই আমার বোধগম্য হচ্ছে না।’

অগস্ত্য এবার বলল, ‘আচ্ছা, কোনও সর্পদেবের কথা বলা হয়নি তো ওই প্রহেলিকায়? যেমন কামারু এবং আমুন-রা এর কথা বলা আছে?’

‘সেটা হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কারণ আমাদের পুরাণে সর্প কোন দেবতা নয়, দানব। তার নাম আপেপ। সে মাটির নীচের জগতে বাস করে। আমুন-রা দিনের শেষে যখন দিগন্তে মিলিয়ে যান তখন রাত্রির সময়ে মাটির নীচে যাত্রা করেন। পরের দিনের ভোরে আবার আমুন-রা তাঁর যাত্রা শেষে আকাশে দেখা দেন। রা-এর এই যাত্রাকালে তাঁর নৌকাকে আক্রমণ করে যে বিশালাকায় সর্প তার নাম হল আপেপ। আপেপ মিশরীয়দের কাছে অমঙ্গলের সূচক। কোন সাধারণ নগরবাসী খুব সহজে আপেপের নাম মুখেও আনবে না, কোনওভাবে অসাবধানতা বশত সেই নাম জিহ্বার অগ্রে এসে গেলেও সে আমুন-রাকে স্মরণ করবে।

‘সুতরাং রাজা মেন্তুহোতেপ কোনওভাবেই তাঁর প্রহেলিকায় আপেপের কথা বলবেন না। আপেপ ছাড়া আরও একটি সর্পের কথা মিশরীয় পুরাণে আছে বটে, তার নাম নেহেবকাউ। সেই সর্পটিও দানব প্রকৃতির। পরে রা তাকে নাকি বশ মানিয়ে দেবতায় পরিণত করেন। মৃত্যুর পর বিয়াল্লিশ জন দেবতা মৃতের আত্মার

পরীক্ষা নেন, এদের মধ্যে নেহেবকাউ একজন। তবে নেহেবকাউয়ের উল্লেখ খুব বেশি আর কোথাও নেই। এই দেশে নেহেবকাউয়ের কোন মন্দিরও নেই। আরেকজন সর্পদেবতা আছেন, নাম আনহুর। কিন্তু তাকে পূজা করে মিশরীয়রা নয়, নুবিয়ার অধিবাসীরা। ফারাও এই দেবতাদের উল্লেখ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নথিতে করবেন বলে মনে হয় না।'

'তাহলে সর্পটি কী? তা উল্টো ভাবেই বা শুয়ে আছে কেন?'

অগস্ত্যর এই প্রশ্ন যেন স্বগোতক্তির মতো শোনাল। তারা তিনজন আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে প্রস্তর খণ্ডটির উপরে বসে রইল। একসময় কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবেই ইরতেনসেনু বলল, 'ফারাওয়ের প্রহেলিকাটি আমাদের যথেষ্ট ভাবাচ্ছে বটে। পুন্ত নগরীর হদিশ যাতে খুব সহজে কেউ না পায় তার জন্যই এর সৃষ্টি সেটি বুঝতে আমাদের আর বাকি নেই। তবে ফারাও যে সেই শহরের ভাষাকে পুরোপুরি ভাবে রপ্ত করতে পারেননি তা বুঝেছিলাম।'

'কীভাবে বুঝলে? হরফগুলির আকার দেখে?'

'না না, সেগুলিকে বেশ যত্ন নিয়েই এঁকেছিলেন মেন্তুহোতেপ। কিন্তু একটি স্থানে চিহ্ন ভুল ছিল। অথবা বলা যায় ভুল চিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন তিনি।'

'আচ্ছা? কোন স্থানে?'

'যেখানে চারটি চিহ্ন মিলে সর্প শব্দটিকে তৈরি করছে। সেখানে পাঁচটি চিহ্ন ছিল। বাকি চারটির সঙ্গে এটি থাকায় প্রথম দিকে এই অংশটির পাঠোদ্ধার আমি কিছুতেই করতে পারছিলাম না। তারপর মনে হল এই একটি চিহ্ন কোনওভাবেই পুন্তের ভাষারীতিতে নেই। সেটিকে বাদ দেওয়ার পরই বাকি চারটি চিহ্ন মিলে তৈরি করল সর্প শব্দটিকে।'

'ইরতেনসেনু তুমি নিশ্চিত যে ওই চিহ্নটি পুন্তের নয়?'

অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করল।

'আমি একেবারেই নিশ্চিত। আমার স্মৃতি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। গতরাত্রের চেষ্টায় পুন্ত নগরীর ভাষার সবক'টি হরফই আমার মনে পড়েছে নির্ভুল ভাবে।'

এবারে অগস্ত্যর কপালে ভাঁজ দেখা দিল। ফারাও মেন্তুহোতেপ এই ভুলটি করবেন? এত প্রয়োজনীয় একটি নথি, যাতে প্রহেলিকার আড়ালে লুকিয়ে রাখা আছে একটি আশ্চর্য নগরীর কথা, সেই নথিতে ভুল থাকবে? মাত্র দুটি বাক্য লেখার সময় ফারাওয়ের মনোযোগ বিঘ্নিত হবে? কোথাও যেন এটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না অগস্ত্যর। সে বলল, 'চিহ্নটিকে এঁকে একবার দেখাতে পারবে তুমি?'

ইরতেনসেনু সামান্য চিন্তা করে বলল, 'হ্যাঁ পারব। দাঁড়াও।'

এই বলে সে উঠে গেল। সামান্য নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিল একটি শুকনো গাছের শাখাকে। তারপর তা দিয়ে মাটির উপরে আঁক কাটতে লাগল। শুষ্ক, নরম মাটিতে এবার অস্পষ্ট একটি চিহ্ন দেখা দিল। ঝুঁকে দেখলে সেটিকে অপেক্ষাকৃত ভালো ভাবে বোঝা যাচ্ছে। মাটির কাছে বসে চিহ্নটিকে পরীক্ষা করছিল অগস্ত্য এবং উপল। উপল এবার বলল, 'চিহ্নটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

একটি উল্লম্ব দাগ। তার মাঝখানটি সামান্য স্ফিত, সেখান থেকে দু'পাশে মোট চারটি দাগ বেরিয়েছে। এদের দুটি উপরের দিকে উঠেছে এবং দুটি নীচের দিকে বেঁকে নেমে এসেছে। চিহ্নটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের মস্তকটিকে সামনে পিছনে আন্দোলিত করছিল উপল। অগস্ত্য জানে উপল কোনও কিছুকে মনে করার চেষ্টা করলে এমন আচরণ করে। একসময় উঠে দাঁড়াল সে। তারপর পরিষ্কার গলায় বলল, 'আমি নিশ্চিত এই চিহ্নটিকে দেখেছি। এবং কোথায় দেখেছি তাও মনে পড়েছে এখন। ফারাও মেন্তুহোতেপের সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আমরা গতকাল দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানের একটি মাত্র অবশিষ্ট দেওয়ালে মেন্তুহোতেপ, শ্বেতপুষ্পের গাছ এবং কামারুর ছবি ছিল। মনে করে দেখো, সেখানেই ফারাওয়ের পায়ের কাছে এই চিহ্নটি খোদাই করা ছিল।'

উপল বলার সঙ্গে সঙ্গেই অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনুরও খেয়াল হল। সত্যিই তো এই চিহ্ন গতকাল তারা দেখেছে। প্রহেলিকার পাঠোদ্ধারের সময়ে ইরতেনসেনুর মস্তিষ্ক পুন্তের হরফ চেনাতেই ব্যস্ত ছিল। তাই এই চিহ্নটিকে একটি নিছক ভুল বলে ভ্রম হয় ইরতেনসেনুর। মেন্তুহোতেপ তাহলে হয়তো ইচ্ছা করেই সর্প শব্দটির মধ্যে চিহ্নটিকে রেখেছিলেন!

কিন্তু এই চিহ্নের অর্থ কী?

'মেন্তুহোতেপের যে-কোনও মূর্তির গাত্রে এই চিহ্নকে দেখতে পাবে। ফারাও মেন্তুহোতেপই মিশরের প্রথম রাজা যিনি সমগ্র উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরকে এক করতে পেরেছিলেন। এই চিহ্নের মধ্যের উল্লম্ব দণ্ডটি ফারাওয়ের রাজদণ্ডের প্রতীক। দু'দিকের বাঁকানো অংশ দুটি উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরের প্রতীক। এই দুই অংশ এসে মিশেছে দণ্ডের মাঝখানে।'

'কিন্তু এই দু'দিকের অংশ বাঁকানো কেন?'

'কারণ এই অংশদুটি উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরের স্থলভাগকে বোঝায় না। বোঝায় নীলনদের উত্তর এবং দক্ষিণ অংশকে।'

এই কথা বলেই সঙ্গে সঙ্গে ইরতেনসেনু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বুঝতে পেরেছি! ফারাও মেন্তুহোতেপের সর্প মরুভূমির গোখরো কিংবা আপেপ নয়! নীলনদ!'

তাদের তিনজনের চোখের সামনে তখন বহুদূরে সুতোর মতো সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে নীলনদ। এতক্ষণ তাদের চোখের সামনেই ছিল সে। কিন্তু ফারাও যে সর্প বলতে নীলনদকে বোঝাবেন তা কেউ ভাবতেই পারেনি। অগস্ত্য যেন ইরতেনসেনুর কথায় এখনও সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে বলল, 'কিন্তু উল্টো হয়ে শুয়ে থাকা সর্প? নীলনদ উল্টো হয়ে থাকার অর্থ কী?'

ইরতেনসেনু আনন্দের আবেশে অগস্ত্যর দিকে এগিয়ে এল। তার উজ্জ্বল মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। অগস্ত্যের দু'কাঁধে দু'হাত রেখে উত্তেজনায় ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে বলল, 'নীলনদ তো উল্টোই অগস্ত্য! এই নদীর গতি বিপরীতমুখী। অন্যান্য নদীর মতো এর জন্ম উত্তরে নয়, এই দেশের দক্ষিণে। সেখানে তৈরি হয়ে নীলনদ উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। তাই উল্টানো সর্প নীলনদই!'

এবারে অগস্ত্যর বুঝতে আর বাকি রইল না, 'তাহলে সর্পের মস্তকে অর্থাৎ নীলনদের উৎসে রয়েছে তুষার, যা কিনা আসলে শ্বেত পুষ্পে আবৃত বৃক্ষের দল! সেখানেই আছে হারিয়ে যাওয়া শহর পুন্ত! ধন্য ফারাও মেন্তুহোতেপ! ধন্য তার মেধা!'

সত্বর ফারাও হাতসেপসুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল ইরতেনসেনুরা। খুশিতে আন্দোলিত গলায় ইরতেনসেনু ফারাওকে জানালো মেন্তুহোতেপের প্রহেলিকার কথা এবং তার অর্থ। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে ফারাওকে প্রহেলিকার মধ্যে লুকিয়ে থাকা মেন্তুহোতেপের চিহ্নের ব্যাপারেও জানালো।

'পুন্ত শহরের খোঁজ আমরা এবারে পাবই ফারাও! সেই স্থান থেকে শ্বেতপুষ্পের কিশলয় নিয়ে আসা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা!'

ইরতেনসেনুর দক্ষতায় ফারাও যে যারপরনাই খুশি হয়েছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তার প্রীত মুখেই তা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু ইরতেনসেনুর বাঁধভাঙা আনন্দের স্রোতে যেন তবুও হাতসেপসুত ভেসে যাচ্ছিলেন না। তার কপালের অস্পষ্ট একটি ভাঁজ ইরতেনসেনুর চোখ এড়ায়নি। সে এবারে বলল, 'আপনি মনে হয় এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না যে আমরা এই প্রহেলিকার সমাধান করেছি। আমরা কিন্তু নিশ্চিত যে নীলনদের উৎসেই রয়েছে হারিয়ে যাওয়া সেই পুন্ত নগরী।'

'না ইরতেনসেনু, তোমাদের মেধার উপরে আমি বিন্দুমাত্র সন্দিহান নই। পুন্তের যে শহরের কথা আজ অবধি কেবল মাত্র লোকগাথাতেই সীমাবদ্ধ ছিল সেই শহর যে আদতে কোথায় রয়েছে তা তোমরা খুঁজে বার করেছ। এখন তা আবিষ্কারের অপেক্ষা। কিন্তু আরও একটি বড় প্রশ্ন যে এখন তোমাদের সামনে

আবির্ভূত হয়েছে। তার অস্তিত্ব হয়তো তোমাদের কাছে অজ্ঞাত, কিন্তু তুমি খবরটি আমাকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে সেই প্রশ্নটিকে একটি পর্বতের মতো দেখতে পেয়েছি। যা অলঙ্ঘনীয়।'

'সেটি কী ফারাও? জানান আমাদের। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

ফারাও হাতসেপসুত এবারে ইরতেনসেনুর কাছে এগিয়ে এলেন, স্নেহের ছোঁওয়ায় নিজের ডান হাত দিয়ে ইরতেনসেনুর কপালের অবিন্যস্ত চুলগুলিকে ঠিক করতে করতে বললেন, 'এই দেশের সন্তান হিসাবে তোমার তো জানার কথা ইরতেনসেনু। নীলনদের উৎসে আজ অবধি কোন মিশরবাসী পৌঁছতে পারেনি। সেই পথ অগম্য।'

সঙ্গে সঙ্গে ইরতেনসেনুর বুকের মধ্যে একটি দীপ যেন কোনও এক হাওয়ার দমকে নিমেষে নিভে গেল। ফারাও যা বলছেন তা সঠিক। আনন্দের আতিশয্যে এই কঠোর বাস্তবিক সত্যটিকে ইরতেনসেনু ভুলে গিয়েছিল। মিশরের চারহাজার বছরের ইতিহাসে একটি মাত্র মানুষও নীলনদের উৎসে পৌঁছতে পারেনি। এই নদী যে কীভাবে তৈরি হয়েছে তা মিশরবাসীর কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে। এই বাধা অলঙ্ঘনীয়, কোন মানুষের সাধ্য নয়। সে মাথা নামিয়ে নিয়ে চুপ করে রইল। তার মুখমণ্ডলের আলোকিত ভাব তখন অন্তর্হিত হয়েছে।

হাতসেপসুতের বলা কথাগুলি অগস্ত্যর কানে গিয়েছিল। সে এবার বলল, 'কেন? সেই পথ অগম্য কেন?'

'তার কারণ সেই অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান। নীলনদ দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। নদী উত্তরে সাগরে মিশে যাওয়ার আগে তিন ভাগে বিভক্ত হলেও তার আগে অবধি একটিই খাতে বয়েছে। রাজধানী থীবসের দক্ষিণে এই নদীর অববাহিকা বরাবর পঞ্চাশ যোজন দক্ষিণে একটি জলপ্রপাত অবস্থিত। এই অঞ্চলেই রয়েছে নুবিয়দের রাজ্যের সীমারেখা। নদীটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হলেও এর উপরের বায়ু বিপরীত মুখে বয়। সেই বায়ুর বলে নৌকা নিয়ে প্রথম জলপ্রপাত অবধি পৌঁছে বাকিটা পথ যাওয়া যায় স্থলভূমির উপর দিয়ে, ঘোড়ায় বা উটের পিঠে।

'মেন্তুহোতেপের সময় থেকেই নুবিয়রা ফারাওয়ের বশ্যতা স্বীকার করেছে, তাই সেই রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়াটা খুব কঠিন হবে না। কিন্তু তার পরের অংশেই দুর্গম এক অরণ্য শুরু হয়েছে, এর নাম সেশেনু। এই সেশেনুর জঙ্গল সমতলে নয়, পাহাড়ের গায়ে, গিরিখাতে বিস্তৃত। এই জঙ্গলে নুবিয়রা প্রবেশ করে না। তাদের বিশ্বাস সেখানে এক অপদেবতা বাস করে। কিছু বছর আগে সাহসে বলিয়ান হয়ে বেশ কয়েকজন মিশরীয় এবং নুবিয় অভিযাত্রী সেশেনুর অরণ্যে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ফিরে আসেনি। ফারাও মেন্তুহোতেপ কোনও এক গোপন পথে ওই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পুন্তে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল তার সঙ্গে সেই শহরের দুই নাগরিক থাকার কারণে। মেন্তুহোতেপ তার প্রহেলিকায় সেই পথের কোনও বিবরণ তো দিয়ে যাননি।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন হাতসেপসুত। অগস্ত্য এর প্রত্যুত্তরে বলল, 'অপদেবতায় আমি বিশ্বাসী নই ফারাও। সেশেনুর জঙ্গলে প্রবেশ করার পর নীলনদের অববাহিকা ধরে হাঁটলেই তো উৎসে পৌঁছনো যাবে।'

'সেটি সম্ভব নয় অগস্ত্য। কারণে যে স্থানে সেশেনুর জঙ্গল শুরু হচ্ছে সেখানেই রয়েছে নীলনদের বুকে সৃষ্ট দ্বিতীয় এবং বৃহত্তম জলপ্রপাতটি। এই জলপ্রপাতের দু'পাশেই এমন ভাবে দুটি পাহাড় রয়েছে যে নদীর অববাহিকায় পৌঁছনোই যায় না। সেই কারণে পাহাড়ে এড়িয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বারে বারে সেই স্থানে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছিলেন অভিযাত্রীরা।'

অগস্ত্যের কপালে এবারে চিন্তার ভ্রুকুটি পড়ল। সত্যিই কী তাহলে কোন উপায় নেই? শ্বেতপুষ্পের সন্ধান পেয়েও তার কাছে পৌঁছতে পারবে না তারা? সে মাথা নীচু করে বলল, 'আমাদের কিছুটা সময় দিন ফারাও।'

হাতসেপসুত ক্লান্তির হাসি হেসে বললেন, 'অবশ্যই।'

ফারাওয়ের চোখ দেখে বোঝা গেল তিনি কোনওরকম আশা রাখছেন না। এখন কোনও এক চমৎকারের অপেক্ষা করা দিবাস্বপ্ন দেখারই সমান।

১৫। নীলনদ

সেই ঘটনার পর একটি দিন কেটে গেছে। অগস্ত্য, ইরতেনসেনু এবং উপল তিনজনেই নিজেদের ঘরে বন্দি করে রেখেছিল। তিনজনের মনেই হতাশা চেপে বসেছে। ইরতেনসেনুর মনে অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। তার বারবার মনে হচ্ছে সে পারল না ফারাও হাতসেপসুতকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে, পারল না তার দেশকে আগত অন্ধকার সময়ের হাত থেকে রক্ষা করতে।

পরের দিন বিকালের দিকে বাকারি এল তাদের সঙ্গে দেখা করতে। সে প্রায় জোর করেই তাদের প্রাসাদের বাইরে নিয়ে এল, যদি বাইরের হাওয়ায় ইরতেনসেনুদের অবসন্ন মন সামান্য হলেও স্বস্তি পায়। কার্নাকের মন্দির অগস্ত্য এবং উপল আগে দেখেনি, তাই সেই মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিল বাকারিরা। ঠিক হল মন্দির দর্শন করে সন্ধ্যাবেলায় আবার তারা প্রাসাদে ফিরে আসবে।

একটি ছোট নৌকায় নীলনদ পার হল তারা। চওড়া নদীর উপর দিয়ে নৌকাটি যখন ধীরে ধীরে অন্য প্রান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ততক্ষণে উপলের মন কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে, নদীর ঠান্ডা হাওয়া তার চোখেমুখে এসে লাগছে। নদীর দুই তীরের শস্য ক্ষেত্রে যে ভুট্টার চাষ হয়েছে তার সোনালি আভায় এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ভুট্টার খেতের মাঝে মাঝে সবুজ উদ্ভিদের জঙ্গল, নদীর জল এই জঙ্গলের কিছুটা ভিতরে ঢুকে এসেছে। এই উদ্ভিদগুলি আকারে এক একটি সরু নলের মতো। জলের ভিতর থেকে কয়েক হাত উপরের দিকে উঠে গেছে এরা। এদের পাতাগুলি আবার ছড়ানো, তাদের প্রান্ত বেশ কয়েকটি সুঁচালো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।

ওইগুলি প্যাপিরাস গাছ। এই গাছ থেকে কীভাবে লেখার জন্য পুঁথি তৈরি হয় তার বর্ণনা উপলকে দিচ্ছিল বাকারি। অগস্ত্য আর ইরতেনসেনুর কানে কিন্তু সেই কথাগুলি পৌঁছচ্ছিল না। নদীর উপর দিয়ে এই যাত্রা যেন তাদের দুজনেরই অসহ্য লাগছিল। যেন নদীর স্রোতের কুলুকুলু শব্দ আসলে মৃদ্যহাস্যে তাদের বিদ্রুপ করে চলেছে। থীবসের এই শান্ত নদীই যে দক্ষিণে কিছু যোজন পরে বিরাট জলপ্রপাতের আকার ধারণ করেছে তা অনুমান করাই যায় না।

অগস্ত্য একটি বার ইরতেনসেনুর দিকে তাকাল, ইরতেনসেনুও তাকাল অগস্ত্যর দিকে। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হলেও কেউ কোনও কথা বলল না, কিন্তু দুজনেই বুঝল যে তাদের মনের মধ্যে চলা ঝড়ের উৎস একই। এই নীলনদ।

নদীর অপর প্রান্তে পৌঁছে তীর বরাবর কিছুটা সময় হেঁটে তারা এসে পৌঁছল কার্নাকের মন্দিরে। কিছুদিন আগে যখন তারা থীবসের প্রাসাদে পৌঁছবার জন্য নদীর এই প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন বহুদূরের এই মন্দিরটি দেখতে পেয়েছিল অগস্ত্য। আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কিছুটা সামনে দু'পাশে রয়েছে সেই সুউচ্চ দুটি স্তম্ভ, তাদের মাথা দুটি সূঁচালো। সেটি খাঁটি সোনার পাতে মোড়া।

সেদিন সূর্যের আলোয় এই চূড়া দুটিকেই উজ্জ্বল রূপে দেখেছিল অগস্ত্য। আজকে বিকালের নরম সূর্যের আলোয় যেন তাদের বেশ কিছুটা মলিন লাগছে। অগস্ত্যর মন ভালো নেই, কিন্তু সে ঠিক করল কার্নাকের মন্দিরটি খুঁটিয়ে দেখবে, যদি এতে মনের গতিপথ কিছুক্ষণের জন্য হলেও অন্যদিকে ধাবিত হয়। সে ইরতেনসেনুকে বলল, 'তুমি আমাকে আর উপলকে এই মন্দিরটি ঘুরিয়ে দেখাও। এই মন্দিরের গল্প বলো। আজ তো আমাদের কোনও তাড়া নেই।'

ইরতেনসেনু অগস্ত্যকে চেনে। সে জানে তার স্বামী বাকারিকেও বলতে পারত মন্দির দেখাবার কথা। কিন্তু তাকে বলল কারণ সে চায় ইরতেনসেনু এখন ব্যস্ত হয়ে পড়ুক। ইরতেনসেনু নিজেও তাই চায়, সে চায় যেন

এক্ষুণি তার ঘুম ভেঙে যাক এবং সে জানুক যে এতদিন অবধি হয়ে চলা সব কিছুই একটি দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু হায়, তা তো আর হওয়ার নয়। কার্নাকের মন্দিরে নিজের মনকে ডুবিয়ে দিল ইরতেনসেনু।

মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র ফুল, গুগগুলের গন্ধে যেন এক লহমায় সবার মন শান্ত হয়ে গেল। হাসি মুখে ইরতেনসেনু অগস্ত্য এবং উপলকে কার্নাকের মন্দির ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল। তাদের সঙ্গে চলল বাকারি।

কার্নাকের মন্দিরটি আকারে লাক্সরের মন্দিরের থেকেও কিছুটা বড়। চৌকো আকারের এই মন্দিরের বাইরের সূচিমুখ স্তম্ভদুটি মন্দিরের প্রবেশ পথকে নির্দেশ করে। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে অগস্ত্যরা একটি খোলা জায়গায় এসে পড়ল। বর্গাকার এই স্থানের চারটি বাহু বরাবর রয়েছে পাথরের আমুন-রা এর মূর্তি। বুকের উপরে দু'হাত জড়ো করে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।



প্রায় সব কটি মূর্তির মুখ আগের কোনও না কোনও ফারাওয়ের মুখের আদলে তৈরি। কারণ এই পৃথিবীর মাটিতে দেবতা আমুন-রা এবং ফারাও তো একই। খোলা আকাশের নীচে এই জায়গাটি আমুন-রা এর উপাসনাক্ষেত্র। এখান থেকে উত্তরের দিকে গেলে পড়বে দেবতা মন্তুর পূজার ঘর, আর দক্ষিণে গেলে পড়বে ন্যায় এবং শান্তির দেবী মাত এর উপাসনাকক্ষ। অগস্ত্যরা প্রথমে মন্তু তারপরে মাত এর মন্দিরগুলি ঘুরে দেখল। দেবী মাতের মন্দিরের গা বেয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে উপরের দিকে। এই সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের ছাদে যাওয়া যায়। ইরতেনসেনুর পিছনে বাকি তিনজন সেই সিঁড়ি ভেঙে মাতের মন্দিরের ছাদে এসে দাঁড়াল।

খানিক আগে সূর্যাস্ত হয়েছে। পশ্চিম দিগন্তে এখনও রক্তিম আভা ছড়িয়ে আছে। ওদের সামনেই কিছুটা দূরে বয়ে চলেছে নীলনদ। এমন সময় এক অনির্বচনীয় দৃশ্যের সাক্ষী হল তারা। আকাশ জুড়ে পাখির দল তাদের বাসায় ফিরে চলেছে। দলটি একটি তীরের ফলার মতো আকার ধারণ করেছে। পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠল মন্দির চত্বর। ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে তারা মিলিয়ে গেল নদীর দক্ষিণ অভিমুখে। যতক্ষণ পাখিগুলিকে দেখা গেল ততক্ষণ মুগ্ধ নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল ইরতেনসেনু। সহসাই যেন তার চমক ভাঙল। সে বাকারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফারাও হাতসেপসুত বলেছিলেন না যে নদী দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হলেও নদীর উপরের বায়ু প্রবাহিত হয় বিপরীত মুখে?'

'হ্যাঁ তাই হয় তো। সেই কারণে থীবস থেকে দক্ষিণের আবিদোস নগরে যে নৌকাগুলি যায় তাদের মাঝি মাল্লাদের তেমন কাজ থাকে না, শুধু পাল তুলে দিলেই হয়। আবার আবিদোস থেকে ফেরার সময় বাতাসের সাহায্য পাওয়া যায় না কিন্তু নদীর স্রোতের অভিমুখে থাকার দরুণ দাঁড় টেনে থীবসে ফিরে আসা যায়।'

বাকারি এই কথা বলার সময়ে উপল তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটি পাখির পালককে তুলে নিল, তারপর ছাদের প্রান্তে এসে পালকটিকে শূন্যে ভাসিয়ে দিল। ইরতেনসেনুরা দেখল পালকটি বাতাসের মধ্যে হেলেদুলে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চলেছে। ইরতেনসেনু এবার উজ্জ্বল চোখে তাকাল অগস্ত্যর দিকে, অগস্ত্য ভ্রুকুটি করে কয়েক পলের জন্য ইরতেনসেনুর চোখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করল। তারপরেই যেন কোন কিছুর সন্ধান পেয়ে সোল্লাসে এগিয়ে গেল ইরতেনসেনুর দিকে, জড়িয়ে ধরল তাকে।

অগস্ত্য ইরতেনসেনুর এহেন অকস্মাৎ মতি পরিবর্তনের কারণ বাকি দু'জনের বোধগম্য হল না। তারা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে ইরতেনসেনু বলল, 'নদীর দক্ষিণে যদি যেতে হয় তাহলে নদী

বক্ষেই যে নৌকা ভাসাতে হবে তার প্রয়োজন নেই!'

উপল বলল, 'মানে? শুনলে তো যে স্থলপথেও নদীর তীর ধরে চলাটা অসম্ভব কুশের রাজ্যের পরে।'

'আমরা স্থলপথেও যাব না।'

এর কী অর্থ তা উপলের বোধগম্য হল না। এই প্রহেলিকায় বাকারি সামান্য বিরক্ত হয়েছে মনে হল, সে বলল, 'স্থলপথেও যাবে না, জলপথেও নয়, তাহলে কি...'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই অগস্ত্য বলে উঠল, 'আকাশপথে! ওই পাখিদের মতো!'

'আপনার কি মতিভ্রম হয়েছে অগস্ত্য? আকাশপথে কীসের বলে যাবেন? জাদুমন্ত্র জানেন নাকি?'

অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু একে অপরের দিকে তাকাল। দুজনের মুখেই যেন প্রশান্তির হাসি ফুটে আছে, যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ যাত্রা করার পর আলোর সন্ধান পেয়েছে তারা। ইরতেনসেনু বলল, 'জাদুমন্ত্র নয়, বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বলে আমরা এই পথ পাড়ি দিতে পারি।'

'বাতাসে ভাসমান হয়ে? এও কি সম্ভব?'

'আমাদের ধারণা তা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য চাই লোকবল এবং বেশ কিছু দ্রব্যাদি। কাজটি সমাধা করতে কিছুদিন সময় লাগবে। চলো আমরা এক্ষুণি ফারাওয়ের কাছে যাই। তার সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন এখন।'

ফেরার সময় উপল এবং বাকারিকে অন্ধকারেই রেখে দিল অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু। তারা নিজেদের মধ্যে কোনও জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে রইল। প্রাসাদে পৌঁছেই ফারাওয়ের কক্ষে এল তারা। ফারাও কোনও নথি পরীক্ষা করছিলেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একজন অমাত্য। আগাম সাক্ষাৎ প্রার্থী না হয়ে আচমকাই ইরতেনসেনুরা কক্ষে প্রবেশ করাতে সামান্য অবাক হলেন তিনি। অমাত্যটিকে বিদায় দিয়ে বললেন, 'শুনেছিলাম তোমরা কার্নাকের মন্দির দর্শনে গেছ। কী হয়েছে? তোমাদের উত্তেজিত লাগছে কেন? আবার কোনও বিপদ হল নাকি?'

ইরতেনসেনু সামনের দিকে এগিয়ে গেল, বলল, 'না ফারাও। বিপদ নয়। একটি আশার ক্ষীণ আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমার এবং অগস্ত্যের মনে হয় পুন্তের নগরীর উদ্দেশে যাত্রা করাটা সম্ভব। কীভাবে সেটি আপনাকে জানাতে চাই, পরিকল্পনাটি একেবারেই অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের অনুরোধ আপনি দয়া করে শুনুন সবটা।'

হাতসেপসুত শান্ত স্বরে বললেন, 'অবশ্যই। তোমাদের বুদ্ধির বলে ছ'বছর আগে আমার হাতে সূর্যের আলো নেমে এসেছিল। এ কথা শুনতে অবাস্তব লাগলেও তা সত্য। তোমরা বলো, শুনছি।'

এবারে ইরতেনসেনু এক নিঃশ্বাসে বলে চলল, 'ছ'বছর আগে অগস্ত্য যে যন্ত্রের মাধ্যমে আমার তৈরি গোলকে আলোর উৎপাদন করে সেই যন্ত্রটিকেই আবার ব্যবহার করব আমরা, তবে এবারে অন্য ভাবে। সেই যন্ত্রের সাহায্যে জলকে বায়ুতে পরিণত করা যায়।'

এখানে ইরতেনসেনুকে আর বলতে না দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উপল বলতে আরম্ভ করল, 'ঠিকই তো! অগস্ত্যের এক অলৌকিক কাণ্ড আছে জানেন! সমগ্র ভারতবাসীকে এক বিপদের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল অগস্ত্য! কালকেয় নামের এক অসুর এক সাগরের নীচে লুকিয়েছিল, অগস্ত্য তার শক্তিবলে সেই সাগরের সব জল পান করে নেয়! তারপর...'

অগস্ত্য এবারে উপল কাঁধে হাত রেখে তাকে থামাল, 'এখন এই গল্পকথার সময় নয় উপল।' তারপর ফারাও-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার এই বন্ধুটি সুযোগ পেলেই এই কাল্পনিক ঘটনার বর্ণনা শুরু করে দেয়। তবে বাস্তবে অন্য রকম কিছু ঘটেছিল। বেশ কিছু বছর আগের কথা, এই দেশে আসবারও আগে আমার তৈরি যন্ত্রটিকে নিয়ে আমি একটি পরীক্ষা করি। আমার যন্ত্রের সাহায্যে একটি বড় কুয়ার সমস্ত জলকে বায়ুতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল। উপল কালক্রমে সেই ঘটনায় দেবতা, অসুর, সমুদ্রকে নিয়ে এসেছে। তবে আসল সত্যটি এটিই।

আমি যে কলসটিকে আমার বিজ্ঞানাগারে বানিয়েছিলাম তা থেকে উৎপাদিত শক্তি আমি জলের মধ্যে প্রবাহিত করি। তাতে দেখি যে জল বায়ুতে পরিণত হয়েছে এবং সেই বায়ু দু'প্রকার। একটি বায়ুতে প্রাণী শ্বাস নিতে পারে, তা আগুন জ্বলতে সাহায্য করে, এর নাম আমি দিয়েছিলাম প্রাণবায়ু। অপর বায়ুটি এই দুটির কোনটিই করে না, কিন্তু এর একটি অদ্ভুত ধর্মের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম। এটি বাতাসের চেয়েও হালকা, তাই সদা ঊর্ধ্বমুখী। এই বায়ুর নাম আমি দিয়েছিলাম উড়ানবায়ু। গত কয়েক বছর ধরে এই বায়ুটিকে নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা আমি এবং ইরতেনসেনু করেছিলাম। তার ফল স্বরূপ আমরা কাপড়ের তৈরি এমন একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করি যার মধ্যে এই উড়ানবায়ুকে ধরে রাখলে যন্ত্রটি বাতাসে বেশ কিছুক্ষণ ভেসে থাকে।

এবার ইরতেনসেনু অগস্ত্যর কথার রেশ ধরে বলল, 'আমরা এমন একটি বায়ুযান এবার তৈরি করতে চাই ফারাও। কিন্তু তা হবে আকারে অনেক বড়। আমাদের ধারণা সেই যন্ত্রের বলে আমরা বাতাসে ভেসে থাকতে পারব। নীলনদের উপরে বাতাস বয় নদীর উৎসের অভিমুখে, দক্ষিণে। বায়ুযানটিকে তৈরি করতে পারলে ওই বাতাসের বলেই বলিয়ান হয়ে আমরা যাত্রা করব দক্ষিণে, হারানো শহর পুন্তের উদ্দেশে!'

হাতসেপসুত চুপ করে রইলেন। ভাবনাটি তাঁর কাছে অলীকই বটে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষমতার পরিচয় তিনি আগে পেয়েছেন এবং এই দুই নারী এবং পুরুষের অসামান্য বুদ্ধির উপরে তাঁর ন্যূনতম সংশয় নেই। তিনি স্মিত হেসে বললেন, 'বলো, এই কার্যে কী কী প্রয়োজন তোমাদের?'

১৬। বায়ুযান

যে নীলনদ কয়েক দিন আগে যেন অজ্ঞাতে ইরতেনসেনুদের বিদ্রুপ করছিল সেই নদীই আজ তাদের বিরাট কর্মযজ্ঞে প্রাণস্থাপন করেছে। নীলনদ থেকে বেশ কিছু খাল কেটে জল নিয়ে আসা হয় নদীর অববাহিকার দু'পাশে। এই জল কৃষিতে সেচের কার্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটি খালের কর্মপদ্ধতি কেবল ভিন্ন।

এই খালটি এসে মিশেছে রাজপ্রাসাদের সামান্য দূরে অবস্থিত একটি মাঝারি আকারের নিলয়ে। এই নিলয়টি আসলে একটি স্নানাগার। শহরের উচ্চবিত্ত মানুষেরা এটি ব্যবহার করেন। নদীর জল খালের মাধ্যমে এসে এই স্নানাগারে প্রবেশ করে। তিনটি বেশ বড় আকারের কৃত্রিম জলাধারে জমা হয় এই জল। এই জলাধারের নীচের ছোট কক্ষে আগুন জ্বালিয়ে এর জলকে উষ্ণ রাখা হয় যাতে ধনীরা আরামে স্নান করতে পারেন।

খালটি থাকার কারণে এই জলাধারগুলির জল সদা প্রবাহিত, যাতে শরীর প্রক্ষালিত নোংরা জল এতে জমা না হয়, সেই জল স্নানাগার থেকে অন্য একটি পথে বেরিয়ে ভূগর্ভে মিশে যায়। সাতদিন আগে ফারাও-এর পক্ষ থেকে একটি আকস্মিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় শহরে। তাতে জানানো হয় যে স্নানাগারটিকে এখন থেকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা অবধি অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবেন না। ফারাওয়ের অতিথি অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু তাদের কোনও এক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে স্নানাগারটির অধিকারী হবে। এরপর শহরের মানুষ অবাক হয়ে দেখল এক অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে স্নানাগারটিকে ঘিরে এবং তার কয়েক পা দূরে নদীর তীরে।

স্নানাগারটির চারদিকে বিরাট আকারের অসংখ্য কলস রাখা। তাদের এক একটির মধ্যে অনায়াসে দু'জন মানুষ স্থান নিতে পারবে। অগস্ত্য এবারে তার শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রটিকে আরও বড় আকারে তৈরি করেছে। কলসের মধ্যে রাখা আছে একটি তামা এবং একটি দস্তার পাত। এই দুটি পাতের মাঝখানে আছে কাঠের গুঁড়ো, কলসের নীচের অংশ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি করে সরু তামার তৈরি তার। দুটি কলসকে রাখা আছে স্নানাগারের মুখ্যদ্বারের সামনে। এই দুই কলস থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটি অপেক্ষাকৃত স্থূল তামার তার, তারগুলি স্নানাগারের ভিতরে ঢুকে গেছে।

স্নানাগারের একটি জলাধারের উপরে উল্লম্ব ভাবে রাখা আছে দুটি বেশ বড় আকারের লোহার পাত। এর মধ্যে একটি লোহার পাতের উপরে তৈরি করা হয়েছে একটি কক্ষ। এই কক্ষের কোন দরজা বা জানালা নেই, নিশ্ছিদ্র এই কক্ষের একটি মাত্র অংশে একটি ছোট ফাঁকা স্থান আছে, সেই খান থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি লম্বা ধাতব নল। নলটি এগিয়ে গেছে নদীর তীরের দিকে। সেখানে আরও এক আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে। তার তদারকিতে আছে ইরতেনসেনু।

নদীর তীরের একটি বড় অংশকে ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পঞ্চাশ জন স্ত্রী-পুরুষ মিলে দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বানিয়েছেন একটি নরম কাপড়। কাপড়টির সুতো আসে ভারতবর্ষ থেকে। সাধারণত বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এই সুতো। কাপড়টি দৈর্ঘ্যে প্রায় বারো মানুষ এবং প্রস্থে আট মানুষের সমান। বড় অদ্ভুত উপায়ে একে প্রস্তুত করা হয়েছে। মিশর দেশে এক প্রকারের বৃক্ষ পাওয়া যায়, যার স্থানীয় নাম মকোন।

এই বৃক্ষের কাণ্ডে আঘাত করলে দুধের মতো সাদা আঠালো রস বেরিয়ে আসে। সেই রস শুকিয়ে গেলে যে পদার্থের জন্ম হয় তা ভীষণ ভাবে স্থিতিস্থাপক। মিশরীয়রা মকোন গাছের এই রস ব্যবহার করে আসবাবপত্র তৈরির কাজে। এই রসের মধ্যে কাপড়টিকে প্রথমে নিমজ্জিত করে রাখা হয়েছিল। এর ফলে

কাপড়ের দু'দিকেই শুকিয়ে যাওয়া রসের দুটি পাতলা আস্তরন তৈরি হয়েছে। তারপরে সেটিকে আবার নিমজ্জিত করা হয় নেসের নামের আরেকটি বৃক্ষজাত রসে, এই রসের বর্ণ হালকা হলুদ এবং এর একটি ঝাঁঝালো গন্ধ আছে।



নেসেরের রস কাপড়ের গাত্রে শুকিয়ে যাওয়ার পর তার উপরে লাগানো হয়েছে মোম, গুঁড়ো চিনি এবং চুনামাটির মিশ্রন। এতে কাপড়টি বেশ শক্তপোক্ত তো হয়েইছে এবং তার সঙ্গে হয়েছে নিশ্ছিদ্র, আবার এর নমনীয় ভাবও নষ্ট হয়নি। কাপড়টির প্রান্তগুলিকে মোটা সুতো দিয়ে সেলাই করা হয়েছে এমন ভাবে যে সেটি ছোট হয়ে একটি বৃত্তাকার অংশে পরিণত হয়েছে। এই গোলাকার অংশের ব্যস এক হস্ত। এই অংশে স্নানাগার থেকে বের হওয়া ধাতব নলটি প্রবেশ করেছে।

কাপড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে একশোটি শক্ত রজ্জু। সেই রজ্জুগুলি এসে লেগেছে একটা আয়তকার চুপড়ির গায়ে। চুপড়িটি তৈরি করা হয়েছে প্যাপিরাস গাছের শুকনো কাণ্ড এবং খড় দিয়ে। এই চুপড়িতে অনায়াসে ছয়-সাতজন মানুষ পাশাপাশি বসতে পারবে। এটিই তাদের বায়ুযান।

গোটা কর্মকাণ্ডটি সম্পন্ন হতে সময় লাগল দশদিন। দশমদিনের সন্ধ্যাবেলায় অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু ফারাও হাতসেপসুতের সাক্ষাৎপ্রার্থী হল।

'থীবসের মানুষ অস্থির হয়ে উঠেছে ইরতেনসেনু। জনগনের মধ্যে আমি চর মারফত এই খবর প্রচার করেছি যে, এক আশ্চর্য জাদুবিদ্যা তুমি এবং অগস্ত্য রপ্ত করে এই দেশে এসেছ। সেই জাদু দেখাবার জন্যই এই কাণ্ড করা।'

'তাদের কৌতূহল স্বাভাবিক ফারাও। তবে জাদুর জন্য তাদের আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।' হাসিমুখে বলল ইরতেনসেনু।

'আমাদের কার্য সমাধা হয়েছে। আপনার আশীর্বাদ পেলে আমরা আগামীকালই যাত্রা করতে পারি।'

'অতি উত্তম, মহান দেবী হাথোর তোমাদের সহায় হোক। কখন যাত্রা শুরু করবে তোমরা?'

'আগামীকাল ভোরেই। আমি, অগস্ত্য, উপল এবং বাকারি যাব।'

'বাকারি?'

'হ্যাঁ ফারাও। বাকারি নিজেই যেতে চেয়েছে। আমরা এখানে এসে পৌঁছনোর পর থেকে সে আমাদের প্রভূত সাহায্য করছে। তার মতে এই যাত্রায় মিশরের রাজপরিবারের একজন প্রতিনিধির অন্তত থাকা উচিত। সে হয়তো আমাদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। পুন্তের বৃক্ষ সে নিজ দায়িত্বে এই ভূখন্ডে ফিরিয়ে আনতে চায়। আমরা তার ভাবনায় কোন ভুল দেখি না। তাই তার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছি।'

'বেশ, তাই হোক তবে। তোমাদের আর কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে জানিও আমাদের।'

'না ফারাও, আপনার প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া এই বায়ুযানটি তৈরি করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। যাত্রাপথের জন্য কিছু শুকনো খাবার এবং জল আমরা নিয়ে নিয়েছি।'

'তবু একটি চিন্তা আমাকে পীড়িত করছে ইরতেনসেনু। তোমরা এই বায়ুযানে করে যদি নদীর উৎসে পৌঁছেও যাও তাহলেও ফিরবে কীভাবে? তোমাদের কথা মতো একমাত্র বায়ুর গতির অভিমুখেই এই যান চলতে পারে। ফেরার সময় বিপরীতমুখী বায়ুতে একে ব্যবহার করবে কী করে?'

'আপনার এই চিন্তা অমূলক নয়। যদি ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা পুন্ত নগরীতে পৌঁছে যাই তাহলে সেখানে আমাদের এই যানকে পরিত্যাগ করতে হবে। যাত্রাপথে উপল নদীর গতিপথ এবং অববাহিকার নকশা আঁকতে থাকবে। আমাদের আশা সেই নকশা ধরে আমরা ফিরে আসতে পারব।'

'আশা?'

হাতসেপসুতের গলার স্বর হতোদ্যম শোনাল। ক্ষনিকের জন্য ইরতেনসেনুর মুখের আলো নিভে গেল, সে বলল, 'হ্যাঁ ফারাও। এইটুকুর উত্তর এখনও আমাদের কাছে নেই। এখন যেকোন ভাবে পুন্ত নগরী পৌঁছনোই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য।'

'কিন্তু সেশেনুর অরণ্যের প্রবেশ করে আজ অবধি কেউই ফিরে আসেনি ইরতেনসেনু। অরণ্যের মধ্যে নদীর গতিপথ নির্দিষ্ট করলেও তোমরা ফিরতে পারবে?'

হয়তো শেষ বারের মতো ইরতেনসেনুর মুখখানি দেখছেন, এই আশঙ্কায় হাতসেপসুতের চোখে মুখে কাতরতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাঁর চোখের কোণে জলের ফোঁটা জমতে শুরু করল। ইরতেনসেনু এগিয়ে এসে তাঁর বাহু স্পর্শ করে বলল, 'স্বয়ং দেবী হাথোরের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছেন। বিজ্ঞান সব কিছুর উত্তর দিতে পারে না। আমার বিশ্বাস শুধুমাত্র বুদ্ধির বলে আমরা আজ এই স্থানে এসে পৌঁছতে পারতাম না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের সহায়। বিপদে তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।'

অগস্ত্য এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে বলল, 'এখন আমাদের বিদায় নিতে হবে ফারাও। শেষ মুহূর্তের কিছু কাজ এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে। আগামীকাল ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা যাত্রা শুরু করে দেব। তবে বিদায় নেওয়ার আগে আপনাকে একটি প্রশ্ন আমি করতে চাই। প্রশ্নটি এই যাত্রার সঙ্গে একেবারেই সংযুক্ত নয়, বলতে পারেন আমার অনুসন্ধিৎসু মনের অকারণ কৌতূহল থেকেই এর জন্ম। আপনি অভয় দিলে প্রশ্নটি করতে পারি আমি।'

'অবশ্যই বলো।'

'প্রশ্নটি প্রাক্তন মহামন্ত্রী সেনেনমুতের প্রসঙ্গে। আপনি নিশ্চয় বহু বছর ধরে তাঁকে চিনতেন।'

'অবশ্যই, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ সেই কবেকার। সেনেনমুত ত্রিশ বছর বয়সে এই দেশে আসেন। নিজের পরিচয় দেন এক ভিনদেশি নাগরিক হিসাবে, যে এই দেশে বসবাস করতে চায়। তখন আমার বয়স মাত্র পনেরো। ভিনদেশি হলেও সেনেনমুত মিশরীয় ভাষায় দক্ষ ছিলেন, দারুণ বুদ্ধিমানও ছিলেন। তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমার পিতা প্রথম তুতমোসে তাঁকে রাজমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন।

'পিতার মৃত্যুর পর আমার স্বামী দ্বিতীয় তুতমোসের রাজত্বকালেও একই পদের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। সেনেনমুতের মতো প্রজ্ঞাবান এবং সৎ ব্যক্তি আমি এই জীবনে আর দুটি দেখিনি। আমি এক নারী হয়েও যে মিশরের ফারাও রূপে অধিষ্ঠিত হলাম, এটি সেনেনমুতের সাহায্য এবং বুদ্ধি ছাড়া সম্ভব ছিল না।'

হাতসেপসুতের কথায় অগস্ত্য কিছুটা অবাক হল। সেনেনমুত জন্মসূত্রে মিশরীয় ছিলেন না? এক ভিনদেশি? যেমন অগস্ত্য এবং উপল? যারা বিদর্ভে বসবাস করলেও তাদের জাতির উৎস অন্যত্র। এই চিন্তা মনে এলেই পীড়াবোধ করে অগস্ত্য, সেইসঙ্গে এক হীনমন্যতা যেন গ্রাস করতে চায় তাকে। তাই এই চিন্তার অঙ্কুরকে আর বাড়তে না দিয়ে পরের প্রশ্নটি করল সে, 'আপনি সেনেনমুতকে তাঁর মৃত্যুর আগে দেখেছিলেন?'

এই প্রশ্নে রানির মুখশ্রী করুণ হয়ে এল। 'রোগশয্যায় তাঁকে আমি দেখেছি।'

'ক্ষমা করবেন রানি। অনুমান করতে পারছি সেনেনমুতের মৃত্যু আপনাকে কতটা কষ্ট দিয়েছে। তবু একটি কথা আমার জানা প্রয়োজন।'

'বলো।'

'সেনেনমুতের কী রোগ হয়েছিল সেটা কী বলতে পারবেন?'

'না, পারব না। থীবসের প্রধান বৈদ্যও বুঝতে পারেননি রোগটা।'

অগস্ত্য যেন এবারে একটু অবাক হল, 'কী ধরণের উপসর্গ ছিল তাঁর?'

'সেনেনমুত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু হঠাৎই একদিন শুনি তিনি উদরের বেদনায় ভুগছেন, তাই সভায় আসতে পারেননি। এমন করে কয়েকদিন গত হওয়ার পর আমি তাঁর গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেদিন তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। গোটা দেহ গাঢ় হলুদ বর্ণের ছিল, যেন কেউ ভারতীয় হরিদ্রা লেপন করেছে তাঁর সর্বাঙ্গে।

'শয্যা থেকে মাথা তুলতে পারছিলেন না। এর কিছুদিনের মধ্যে মারা যান সেনেনমুত। বাকারি সেই সময় দিনরাত জেগে পিতার সেবা করেছে, অমন সন্তান পাওয়া যে-কোনও পিতার কাছে সৌভাগ্যের। তুমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারো। পিতার অসুস্থতার ব্যাপারে অবশ্যই আরও ভালো ভাবে বলতে পারবে।'

হাতসেপসুতের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার সময় ইরতেনসেনু খেয়াল করল অগস্ত্যর চোখ মুখ থমথমে। কিছু পথ হেঁটে আসার পর সে রাস্তার মাঝে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, 'আমি একটু আসছি। তুমি উপলের সঙ্গে আগামীকালের যাত্রার তদারকি করো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব।'

ইরতেনসেনু এর প্রত্যুত্তরে কিছু বলার আগেই অগস্ত্য যন্ত্রচালিতের মতো পিছনে ফিরে হাঁটা লাগাল।

১৭। মৃতের সঙ্গে দেখা

অতিথিশালার ঘরে ইরতেনসেনু ফিরে আসার পর দেখল উপল বসে আছে। তার সামনে রাখা আছে অনেকটা চওড়া একটি আয়তকার পাত্র। পাত্রের মধ্যে বালি ভরা। তার উপরে একটি সরু এবং লম্বা শণের কাঠি দিয়ে আঁকিবুকি কাটছে উপল। এই দেশে লেখালিখির জন্য প্যাপিরাস থাকলেও তার যোগান খুব বেশি নয়। তাই কোন প্রয়োজনীয় নথি তৈরি ব্যতীত এর ব্যবহার হয় না।

ছোটখাটো লেখালিখি বা হিসাবনিকেশ যা স্থায়ী হবে না তার জন্য ব্যবহার করা হয় এই বালি ভর্তি আয়তকার পাত্রটিকে। মিশরীয়রা একে বলে সালো। শণের কাঠি দিয়ে আঁকাজোকা করে নিয়ে আবার মসৃণ কাঠের টুকরো দিয়ে সালোর বালির উপরিভাগকে সমতল করে নেওয়া যায়, তারপর আবার তার উপরে আঁক কাটা হয়। এ দেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরাও এই সালোর উপরে হস্তলিপি এবং অঙ্কের অনুশীলন করে। ইরতেনসেনু উপলের পাশে এসে দাঁড়াল, বলল, ‘আপনার কাজ কতদূর নাবিক মহাশয়?’

উপল তার দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে হাসল, ‘প্রায় সম্পূর্ণ। তবে তোমাদের বায়ুযানে ওঠার আগে অবধি তো বুঝতে পারছি না আমার গণনা কার্যকরী হবে কি না।’

যতদিন ধরে অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু বায়ুযান তৈরিতে ব্যস্ত ছিল ততদিন উপলও মন দিয়েছিল নিজ অংশের দায়িত্ব পালনে। বায়ুযান একবার শূন্যে ভাসমান হলে বাতাসের বলে ধাবিত হবে। বাতাস এখানে উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়, কিন্তু পাহাড়ের গাত্রে ধাক্কা লেগে সেই বাতাস ডাইনে বা বাঁয়ে দিক বদল করতে পারে। আবার নীলনদের গতিপথও সোজা নয়, সর্পিল। তাই নদীপথ ধরে এগোতে হলে বায়ুযানের অভিমুখ প্রায়শই বদল করতে হবে। সেই কাজ কীভাবে সম্পন্ন হবে তার ভার উপলের উপরে।

এই কয়েক দিনে সে একবার নীলনদের দক্ষিণে গমন করেছে, যতটা পথ যাওয়া যায় ততটাই আর কী, সেশেনুর অরণ্যের প্রান্তদেশ অবধি। নদীর গতিপথের একটি নকশা সে এঁকে নিয়েছে, তার সঙ্গে খেয়াল করেছে নদীর বিভিন্ন বাঁকে বায়ুর অভিমুখ। সেশেনুর অরণ্যের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি পর্বত। উপলের বিশ্বাস এই পর্বতের মাঝে একটি গিরিপথ থাকবেই, তবে সেই অংশে বায়ুর গতিপথও অনেক বেশি হবে। সেখানে বায়ুযানের ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে তা নিয়ে উপল এখনও চিন্তিত। সেই অঙ্ক কষার সময়ই ইরতেনসেনুর আবির্ভাব হল।

উপল তার হাতে ধরা শণের কাঠিটিকে নামিয়ে রাখল। অনেক হয়েছে, এখন আর দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, নিজের মনকে শান্ত রাখতে হবে। ইরতেনসেনু উপলের পাশে এসে বসল। উপল নিজের মুখে হাসি রেখে বলল, ‘অনেক হয়েছে। আগামীকাল কী হতে চলেছে তা নিয়ে ভেবে আজকের দিনটা আর নষ্ট করব কেন? এই কয়েক দিনে যথেষ্ট শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম হয়েছে। এখন মনকে একটু আনন্দ দেওয়ার প্রয়োজন। চলো কিছু সুখাদ্যে উদরপূর্তি করা যাক। আমার বন্ধুটি কোথায়? সে কি এখনও তার যন্ত্রের কলসিগুলির মধ্যে কাঠের গুঁড়ো ভরে চলেছে?’

ইরতেনসেনু সংক্ষেপে উপলকে বলল হাতসেপসুতের সঙ্গে হওয়া কথোপকথনের কথা। উপল ভাবলেশহীন মুখে শুনল, তারপর বলল, ‘অগস্ত্যকে আমি চিনি। বিজ্ঞান তাকে অনুসন্ধিৎসার অভ্যাস দিয়েছে। কিন্তু সেনেনমুতের মৃত্যু নিয়ে সে কেন এতটা ভাবছে বুঝতে পারছি না। যাই হোক, চলো, এই বদ্ধ ঘরে আর বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না।’

এই বলে একপ্রকার জোর করেই ইরতেনসেনুকে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে এল উপল। তাদের গন্তব্য একটি সরাইখানা। সরাইখানাটি প্রাসাদ থেকে হাঁটা পথে কিছুটা দূরে। সন্ধ্যের সময় সেখানে খুব বেশি ভিড় ছিল

না। ইরতেনসেনুদের দেখেই তাদেরকে সাদর আমন্ত্রণে সরাইখানার ভিতরে একটি সুদৃশ্য আসনে বসানো হল। শহরের সবাই এখন উপলকেও চেনে। আগামীকালের অদ্ভুত জাদুকে চাক্ষুস দেখার জন্য শহরবাসী মুখিয়ে আছে। সরাইখানার কর্তাটি পরম আগ্রহে একের পর এক সুস্বাদু খাবার উপল আর ইরতেনসেনুর সামনে পরিবেশন করছিল। তার মধ্যে ছিল আঙুর পাতায় মোড়া সিদ্ধ মাংস, আগুনে পোড়ানো শূকরের নরম মাংস, সদ্য উনুন থেকে নামানো যবের রুটি, ভুট্টা ভাজা, আরও কত কী।

ঘরটির এক পাশে ঢোলকের মতো দেখতে একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল এক মধ্যবয়সি পুরুষ, সেই বাজনার তালে নাচ্ছিল একজোড়া নর্তক-নর্তকী। কিছুক্ষণের জন্য সব চিন্তা, ক্লেশ ভুলে গিয়েছিল ইরতেনসেনু। সে খাওয়া থামিয়ে বাজনার তালে তালে দু'হাতে তালি বাজিয়ে নাচিয়েদের উৎসাহিত করছিল। এই সুর, এই নাচ, এই সুগন্ধী খাদ্যের স্বাদ, এও তো জীবন। এর মধ্যে ডুবে থাকতে ভালো লাগছিল তার। একসময় কাঁধে হালকা টোকা পড়তে সে পিছন ফিরে তাকাল, দেখল অগস্ত্য দাঁড়িয়ে।

উপল শশব্যস্ত হয়ে অগস্ত্যর হাত ধরে টেনে তাকেও ভোজনের আসনে বসিয়ে দিল। অগস্ত্যর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এখন এই খাদ্যদ্রব্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কোনও রকমে কিছুটা খেয়েই সে বলল, 'চলো এবারে ওঠা যাক, একটি ছোট কার্য এখনও বাকি আছে।'

কার্যটি যে কী তা অগস্ত্য বলল না, তার থমথমে মুখ দেখে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহসও হল না ইরতেনসেনুর। তার পিছু পিছু এসে তিনজনে একটা ঘোড়ায় টানা শকটে উঠল। সহিসের হাতে দুটি তামার মুদ্রা দিয়ে অগস্ত্য বলল, 'গোকের কর্মশালায় যাব।'

অগস্ত্যর মুখের কথা শুনে ইরতেনসেনু চমকে উঠল।

গোকের নাম এই শহরে শোনেনি এমন মানুষ নেই। তার বয়স নব্বই এর আশেপাশে। কিন্তু তাকে দেখলে মনে হয় সে কেবল ষাটটি বসন্তেরই সাক্ষী থেকেছে। গোকের কর্মশালাটি শহরের বাইরে। বাকুর পাহাড়ের পাদদেশে। নদী থেকে বেশ কিছুটা দূরে হওয়ায় এই অঞ্চলের বাতাসে আর্দ্রতা অনেকটাই কম। এমন কর্মশালার জন্য শুষ্ক আবহাওয়ার ভীষণ প্রয়োজন। কারণ এই আবহাওয়াতে চামড়া, মাংস শুকাতে সুবিধা হয়, জীবানুর আক্রমণে তা নষ্ট হয়ে যায় না। গোকের কর্মশালায় মমি তৈরি হয়।

মমি তৈরির কর্মশালায় অগস্ত্যর কী প্রয়োজন তা জিজ্ঞাসা করাতে সে শুধু বলেছিল, চলো দেখতে পাবে। এইটুকু বলেই চুপ করে গিয়েছিল। পথে উপল কেবল আরেকটি প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি জানলে কী করে যে আমরা ওই সরাইখানাতেই আছি?'

'অতিথিশালায় পৌঁছে খবর পেলাম তোমরা সান্ধ্যভোজন সেখানে করনি। কয়েকদিন আগে ওই সরাইখানায় শূলপক্ক শুকরের মাংস খেয়ে এমন গুণগান গাইছিলে যে মনে হল যাত্রার আগে নিশ্চয়ই ওখানেই আরও একবার খেতে যাবে। তোমাকে আমি চিনি ভালো করেই।'

উত্তরে বলেছিল অগস্ত্য। তারপর আবার সবাই চুপচাপ।

মমি তৈরির কর্মশালাটি একতলীয়। বাইরের দরজা দিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করার পর অগস্ত্যরা একটি বেশ চওড়া উঠোনে এসে পড়ল। উঠোনের এক পাশে কয়েকটি চৌবাচ্চা রয়েছে, সেগুলির মুখ কাঠের চওড়া পাটাতন দ্বারা বন্ধ করা, এক ভারি ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে রয়েছে উঠোন। গন্ধটি প্রথমবার নাকে এসে লাগার পর মিষ্ট মনে হলেও তারপর সেই গন্ধের মধ্যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অগস্ত্য কাজ করতে থাকা একটি শ্রমিককে কাছে ডেকে এনে বলল, 'গোকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমাদের রাজ চিকিৎসক বেবতি পাঠিয়েছেন।'



এই বলে তার হস্তে একটি ছোট সম্পুট দিল। লোকটি একটি ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হল। অগস্ত্যরা অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘদেহী এক প্রৌঢ় বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে অগস্ত্যর সম্পুটটি। তিনি ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমিই গোক, বলুন কী ভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি।'

এটি বলার সময় গোকের চোখ পড়ল ইরতেনসেনুর উপরে। তিনি ইরতেনসেনুকে চিনতে পেরে মাথা নীচু করে সম্ভাসন জানালেন। ইরতেনসেনুও প্রতি নমস্কার জানাল তাঁকে। অগস্ত্য এবারে বলল, 'একটি প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছিলাম।'

'হ্যাঁ বলুন।'

'মহামন্ত্রী সেনেনমুতের মমিটি আপনি প্রস্তুত করছেন। সেটি যদি একবার দেখা যেত তাহলে ভালো হতো। তিনি ছিলেন ইরতেনসেনুর পালক পিতা, সে তাকে শেষবারের জন্য দেখতে চায়।'

ইরতেনসেনু চমকে উঠল! এই কারণে অগস্ত্য তাকে এই স্থানে নিয়ে এসেছে! তাহলে যাত্রাপথে এই কথা সে জানাল না কেন? কোন গর্ভে ইরতেনসেনুর জন্ম তা সে জানে না, সেনেনমুতই তার পিতা এবং মাতা, দুই-ই ছিলেন। তাঁর মৃতদেহ সে দেখতে পারবে? প্রাণহীন পালক পিতার শরীরটির দিকে তাকাতে পারবে সে? ইরতেনসেনুর গলার কাছে একটি কষ্ট দলা পাকিয়ে উঠল, নিজের চোখের জল ঢাকতে সে মাথা নামিয়ে নিল।

অগস্ত্যর এই আকস্মিক কাজে সে আহত হয়েছে, কোথাও গিয়ে যেন তাদের মধ্যের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উপলও এতে যারপরনাই বিরক্ত তা বোঝা যায় তার মুখমণ্ডলের ভাব দেখে। সে জানে তার বন্ধুটির সংবেদনশীলতা কম, বিজ্ঞানের সঙ্গে বসবাস করতে গিয়ে তার হৃদয়ের এই আপাত শুষ্কতার পরিচয় সে আগেও পেয়েছে। কিন্তু ইরতেনসেনুর সঙ্গে তার এমন ব্যবহারের কী সত্যই কোনও প্রয়োজন ছিল? উপল গম্ভীর গলায় বলল, 'ইরতেনসেনু তার পিতার মৃত্যুতে গত কয়েকদিন ধরেই মূহ্যমান হয়ে রয়েছেন। এই অবস্থায় তাকে সেনেনমুতের মৃতদেহের সামনে নিয়ে আসার কি খুব প্রয়োজন ছিল?'

অগস্ত্য এবারে অস্বস্তিতে পড়ল। গোক তার দিকে এক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু অগস্ত্য কিছু বলার আগেই ইরতেনসেনু বলল, 'হ্যাঁ, আমিই অগস্ত্যকে বলেছিলাম যদি একটি বারের জন্য পিতাকে দর্শন করতে পারি। তাকে আমার শেষ প্রণাম জানাবার সুযোগ পাব তাহলে।'

এবারে যেন গোক সামান্য আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'অবশ্যই অবশ্যই। কিছুক্ষণ সময় দিন আমাকে। ভিতরে মহান সেনেনমুতের দেহটিকে নিয়ে কর্মরত ছিল আমার কারিগরেরা। তারা ব্যবস্থাটা একটু গুছিয়ে নিক, তারপর আমি দর্শনের সুযোগ করে দেব।'

এই বলে গোক ঘরের ভিতরে আবার প্রবেশ করলেন। ইরতেনসেনুর কথায় অগস্ত্য এবং উপল দুজনেই চমকে গিয়েছিল। অগস্ত্য ইরতেনসেনুর দিকে চেয়ে দেখল সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। দ্রুত মাথা নামিয়ে নিল অগস্ত্য। উপলের মুখে তখনও বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট, সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিনজনের মধ্যে একটিও বাক্য বিনিময় হল না। খানিকক্ষণ পর গোক বাইরে এলেন,

বললেন, 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তারপরই আমরা সেনেনমুতের দর্শন করতে পারব। আপনারা আগ্রহী হলে ততক্ষণ এই কর্মশালাটি ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।'

অগস্ত্য বলল, 'অবশ্যই।'

এই অস্বস্তিকর পরিবেশে দাঁড়িয়ে থাকার তুলনায় কর্মশালার মধ্যে হাঁটা বেশি শোভনীয়। গোকের পিছন পিছন তারা তিনজন চলতে লাগল। অগস্ত্য গোককে জিজ্ঞাসা করল, 'মিশরের মমি তৈরির প্রক্রিয়ার কথা আমি আগে শুনে থাকলেও তা কখনো চাক্ষুস দেখার সৌভাগ্য হয়নি। বিজ্ঞানকে সম্বল করে আপনারা যে অসাধ্য সাধন করেছেন তা সমগ্র পৃথিবীর কাছে বিস্ময়কর। আচ্ছা গোক, এই প্রক্রিয়ায় আপনারা মৃত মানুষের শরীরকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এতে তার চেহারার কোনও পরিবর্তন হয়?'

'না, বাইরে থেকে দেখলে কোন রকমের পরিবর্তন বুঝতে পারবেন না আপনারা। এই প্রক্রিয়াকে আয়ত্তে আনতে কয়েক সহস্র বছর ধরে গবেষণা করতে হয়েছে আমার পূর্বজদের। আমি শুধু তার সুবিধা লাভ করছি।'

'তাহলে মৃতের চর্মও একই রকম থাকবে?'

'হ্যাঁ, প্রায় একরকম থাকবে। একশত বছরের পুরোনো মমিকে যখন সমাধি থেকে তুলে এনে অন্য সমাধিতে স্থানান্তরিত করা হয় তখনও আমি লক্ষ করেছি, মৃতের দেহ প্রায় একইরকম অবিকৃত থেকে যায়। তবে এই পদ্ধতিটি বেশ জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। এই দেখুন।'

এই বলে গোক একটি চৌবাচ্চার কাছে এনে দাঁড় করালেন অগস্ত্যদের। চৌবাচ্চার উপরিভাগ কাঠের একটি পাটাতন দ্বারা ঢেকে রাখা আছে। ইরতেনসেনুর পা দুটি যেন ভারী হয়ে গেছে, চলতে তার ইচ্ছা করছে না। কিন্তু তার মন যেন কোথাও বলছে অগস্ত্যর এ হেন আচরণের কোন এক যথার্থ কারণ আছেই। গোক কাঠের পাটাতনটি কিছুটা সরিয়ে দিলেন, তারপর চৌবাচ্চার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, 'দেখুন।'

অগস্ত্যরা সামান্য একটু ঝুঁকে চৌবাচ্চার ভিতরে তাকাল। চৌবাচ্চাটির ভিতরে লবণ ভর্তি করে রাখা আছে। তার মধ্যে শোয়ানো আছে এক বৃদ্ধকে। তার বয়স আনুমানিক ষাট হবে। বৃদ্ধের পেটের উপরে একটি কাটা দাগ, সেটিকে সুতার দ্বারা সেলাই করা। গোক বললেন, 'তিনি থীবসের একজন বিত্তশালী পুরুষ। তাঁর মৃত্যু কতদিন আগে হয়েছে বলে আপনাদের মনে হয়?'

মৃতদেহটিকে আরও একবার ভালো করে দেখল অগস্ত্যরা। বৃদ্ধের দেহের চামড়া সজীব, দুই হাতের উপরে শিরা উপশিরার উপস্থিতি স্পষ্ট লক্ষ করা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন বৃদ্ধ ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন, সামান্য টোকা দিলেই উঠে বসবেন। বেশ কিছুক্ষণ একটানা তাকিয়ে থাকলে মনে হয় বুকটি বোধ হয় শ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে। গোকের প্রশ্নের উত্তরে উপল বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে আজ সকালেই হয়তো ইনি গত হয়েছেন।'

গোক তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'তিনি পরলোকের অনন্ত যাত্রায় গমন করেছেন আজ সকালে না, একটি মাস আগের অন্য এক সকালবেলায়।'

গোকের কথায় উপলেরা যারপরনাই অবাক হল। একটি মাস আগে এই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে! তাহলে এখনও এর ত্বক এত সজীব, এত প্রাণবন্ত থাকে কী করে! এ কেমন জাদু!

এমন সময় একটি ভৃত্য এসে জানাল যে সেনেনমুতের দেহ ইরতেনসেনুর দর্শনের জন্য প্রস্তুত। গোকের পিছনে হেঁটে এবারে অন্য একটি ঘরে এল অগস্ত্যরা। ঘরটিতে প্রবেশের আগে তাদের তিনজনের হাতে তিনটি মুখোশ তুলে দিলেন গোক, বললেন, 'এই ঘরে প্রবেশের আগে এগুলিকে পরে নিন।'

অগস্ত্য দেখল তার হাতের মুখোশটি একটি শিয়ালের। গাঢ় বাদামী বর্ণের মুখোশটির চোখের কাছে গোল গর্ত করা, নাকের অংশটি সামনের দিকে এগোন। অগস্ত্য এতে বেশ অবাক হল। উপল জিজ্ঞাসা করল,

'শুনেছি মিশরের পুরাণের মতে দেবতা আনুবিসই প্রথম মমি তৈরি করেন। সেই মমি ছিল দেবতা ওসাইরিসের। এমন লোককথার জন্যই কি এই মুখোশ?'

'না, এর একটি বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। যে ঘরে আমরা এখন প্রবেশ করতে চলেছি তাতে মমি তৈরির শেষ ধাপটি সম্পন্ন হয়। এখানে মৃতের দেহে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করি আমরা। এই বস্তুগুলি থেকে যে বায়ু উদ্গত হয় তা শ্বাসের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই কারণেই মূলত এই মুখোশের ব্যবহার। খেয়াল করে দেখুন এর নাকের অংশটি অনেকটাই সামনের দিকে এগিয়ে আছে। এই অংশের মধ্যে থাকে একটি সিক্ত কাপড়ের টুকরো, এর ভিতরে থাকে কাঠ কয়লা। ঘরের বাতাস এই কাপড়ের টুকরোর মধ্য দিয়ে গমন করার সময় শোধিত হয়, তাই নাকে যে বাতাস এসে পৌঁছয় তাতে কোন শারীরিক ক্ষতি হয় না।'

মুখোশটি পরিধানের পর তারা একে একে সেই ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটি অন্যান্য ঘরগুলির থেকে অনেকটা আলাদা। প্রথমত এটি আকারে বড়, দ্বিতীয়ত এই ঘরে কোনও রকমের জানালা নেই। দেওয়ালে লাগানো মশালের আলোয় ঘরটি আলোকিত হয়ে রয়েছে। ঘরের মেঝের উপরে শোয়ানো রয়েছে চারটি বেশ প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ড। তাদের তিনটি ফাঁকা হলেও অন্যটিতে এক ব্যক্তিকে যে শোয়ানো আছে তা বোঝা যায়। তার সামনে আনুবিসের সেই মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনজন কারিগর। সেইদিকে এগিয়ে গেল অগস্ত্যরা।

প্রস্তরখণ্ডটির উপরিভাগ সমতল। তার উপরে শোয়ানো আছে মহামন্ত্রী সেনেনমুতের নিথর দেহ। একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তার কটিদেশ ঢাকা, বাকি উন্মুক্ত। কয়েক পক্ষকাল আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, অথচ তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তিনি এখনও জীবন্ত! ঘুমিয়ে রয়েছেন কেবল। ইরতেনসেনু একদৃষ্টে সেনেনমুতের দিকে চেয়ে রইল। যে পিতাকে ত্যাগ করে পাঁচ বছর আগে সে ভিনদেশে যাত্রা করেছিল তাঁকে এভাবে কখনও দেখতে হবে এমন সে দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

সেনেনমুতের মুখ যেন যন্ত্রণাক্লিষ্ট। তাঁর সবল শরীর যেন শুকিয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর আগেই। শরীরে একটি গাঢ় বাদামী-হলুদ রঙের আভা। ইরতেনসেনু আর তাকিয়ে থাকতে পারল না, চোখের জল ঝাপসা করে দিল তার দৃষ্টি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। অগস্ত্য তার কাঁধে হাত রাখল। গতবারে যখন সে এই দেশে এসেছিল তখন সেনেনমুতের সঙ্গে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল তার। কিন্তু সেই সাক্ষাৎই যে শেষ দেখা হবে তা কেই বা জানত!

অগস্ত্য এবারে সেনেনমুতের দেহের কাছে এগিয়ে এল, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখল, তারপর গোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহামন্ত্রীর দেহে কালো বর্ণের গোলাকার কিছু চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। বুক এবং উদরের উপরে সেই চিহ্নের সংখ্যা বেশি। একমাত্র খুব কাছ থেকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এদের উপস্থিতি। এগুলি কি মমি তৈরির প্রক্রিয়ার কারণে হয়েছে?'

'না, সেনেনমুতের দেহ যখন এই কর্মশালায় আসে তখনই আমি খেয়াল করেছিলাম যে তাঁর সর্বাঙ্গে যেন অজস্র ক্ষত। এই অংশগুলিতে চামড়া ভীষণই পাতলা হয়ে ফুলে উঠেছিল, পরে যখন লবণের চৌবাচ্চায় দেহটিকে প্রবেশ করানো হয় তখন দেখলাম ক্ষতগুলি ফেটে গিয়ে জলের মতো কিছু একটা বেরিয়ে এল, তারপর চর্মের ক্ষতগুলি ধীরে ধীরে এমন কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে।'

অগস্ত্য এবারে আবার ইরতেনসেনুর পাশে এসে দাঁড়াল। মৃদুস্বরে বলল, 'তুমি বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। আমরা আসছি।'

ইরতেনসেনু কোন কথা না বলে ঘর থেকে প্রস্থান করার পর অগস্ত্য গোকের দিকে আবার ফিরে তাকাল, বলল, 'আশ্চর্য বিজ্ঞানের আশীর্বাদের অধিকারী আপনি গোক। মৃতের শরীরে প্রাণ না থাকলেও যেন তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার দৃষ্টিতে আপনিও একজন বৈজ্ঞানিক। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন। একটি শেষ অনুরোধ আছে আপনার কাছে, সেটি জানাতে পারি?'

প্রীত স্বরে গোক বললেন, 'হ্যাঁ বলুন।'

'আমি শুনেছিলাম যে মমি প্রস্তুত করার সময় মৃতের যকৃত, ফুসফুস, পাকস্থলী এবং নাড়িকে বার করে নিয়ে চারটি পাথরের পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। সেগুলিকে দেখা যেতে পারে?'

গোক এবারে তাদের অন্য একটি কক্ষে নিয়ে এলেন। আনুবিসের মুখোশটি ততক্ষণে তারা খুলে রেখেছে। এই ঘরটি অনেকটাই ছোট। এখানে কাঠের পাটাতনের উপরে সারি দিয়ে রাখা আছে পাথরের তৈরি কিছু পাত্র। পাত্রগুলি আকৃতিতে খুব ছোট কলসের মতো। তাদের মাথার ঢাকনাগুলি এক-একটি পশু বা পাখির মুখের আদলে বানানো। গোক একটি নির্দিষ্ট পাটাতনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সামনে রাখা পাত্রগুলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এইগুলিতে সেনেনমুতের অঙ্গগুলি রাখা আছে। এই বাঁদরের মুখওয়ালা পাত্রে রাখা আছে ফুসফুস। শিয়ালের মুখ যে পাত্রে আছে তাতে আছে পাকস্থলী, মানুষের মুখের পাত্রে আছে যকৃত এবং বাজপাখির মুখের আদলে তৈরি পাত্রে আছে নাড়ি। আমরা বিশ্বাস করি এই প্রতিটি পাত্রকে রক্ষা করেন এক একজন দেবদেবী। যেমন এই মানুষের মুখের আকৃতির পাত্রটিকে রক্ষা করেন দেবী আইসিস।'

অগস্ত্য বলল, 'এই পাত্রেই যকৃতটি রাখা আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কি একবার দেখতে পারি যকৃতটিকে? কীভাবে একটি অঙ্গকে সংরক্ষণ করেছেন আপনারা তা দেখার প্রবল আগ্রহ আমার।'

গোক এবারে সেই পাত্রটিকে খুললেন। হাতে ধরা একটি মাঝারী আকারের ধাতব চিমটার সাহায্যে সেনেনমুতের যকৃতটিকে বার করে এনে অন্য একটি পাত্রের উপরে রাখলেন। অগস্ত্য একটু এগিয়ে এসে যকৃতটিকে পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর বলল, 'ধন্য আপনাদের প্রজ্ঞাকে। যকৃতটির আকার একেবারেই অবিকৃত রয়েছে! আচ্ছা এটিকে যখন শরীর থেকে বার করেন তখন কোন গন্ধ পান আপনারা?'

'না, এখন যে তিব্র মিষ্ট গন্ধটি আপনি পাচ্ছেন তা সংরক্ষণের কার্যে ব্যবহৃত রাসায়নিকের জন্য। মৃতের শরীরের ভিতরের অঙ্গে যে গন্ধ লেগে থাকে তা রক্তের। সেই গন্ধের বর্ণনা দেওয়া মুশকিল। তবে শরীরের কোন অংশে চোট লেগে রক্তপাতের পরে এমন গন্ধ আমরা প্রায় সবাই পেয়ে থাকি। কিন্তু সেনেনমুতের যকৃতে এক অন্য প্রকারের গন্ধ আমি পেয়েছিলাম। এখন আবার মনে পড়ল।'

'সেটি কেমন গন্ধ ছিল?'

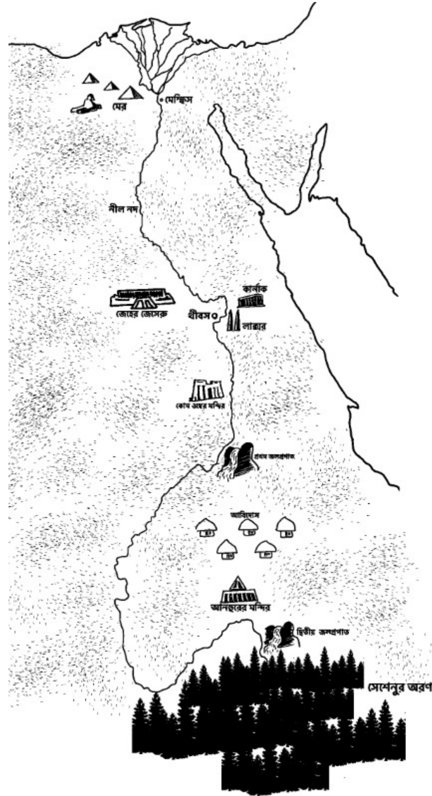
অগস্ত্য যেন খুবই অগোছালো ভাবে প্রশ্নটি করল। গোক বললেন, 'গন্ধটি বড়ই অদ্ভুত ছিল, হাঁসের ডিমের মধ্যে পচন ধরলে এমন গন্ধ পাওয়া যায়।'



কর্মশালা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার পর অগস্ত্য দেখল ইরতেনসেনু অশ্ব শকটের ভিতরে বসে আছে। অগস্ত্য এবং উপল শকটের উপরে উঠে বসল। অগস্ত্য বসল ইরতেনসেনুর পাশে। উপলের ইশারায় শকটটি চলতে লাগল অতিথিশালার অভিমুখে। অগস্ত্য ইরতেনসেনুর ডান হাতটি নিজের বাম হাতের মধ্যে নিল। খেয়াল করল ইরতেনসেনু হাত তার হাতের তালুকে জড়িয়ে ধরল না, আলগা ভাবে নিজের তালুটিকে রেখে

দিল। অগস্ত্য মাথা নীচু করে বলল, ‘আমাকে ক্ষমা করো। অতিথিশালায় ফিরে গিয়ে সবটা জানাব তোমাদের।’

১৮। ষড়যন্ত্র



অতিথিশালার কক্ষে ফিরে আসার পর দরজা ভিতর থেকে লাগিয়ে দিল অগস্ত্য। ইরতেনসেনু এবার তার চোখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার কাছে সত্যগোপন করার কী প্রয়োজন ছিল তোমার? কেন আমাকে জানাওনি যে তুমি আমাদের পিতার মৃতদেহের কাছে নিয়ে চলেছ?'

অগস্ত্য সন্তাপ জড়ানো স্বরে বলল, 'আমার ভুল হয়ে গেছে ইরতেনসেনু। আমি যদি তোমাকে আগে থেকে বলতাম তাহলে হয়তো তুমি কর্মশালায় যেতে চাইতে না। তোমার স্থানে আমি থাকলেও আমিও মৃত পিতার সম্মুখীন হতে চাইতাম না। কিন্তু তোমাকে ছাড়া সেনেনমুতের মৃতদেহ দেখা সম্ভবও ছিল না আমার পক্ষে। তাই এই গোপনীয়তা।'

উপল এখনও অগস্ত্যর উপরে রুষ্ঠ হয়ে আছে। রাগত স্বরে সে বলল, 'সেনেনমুতের মৃতদেহ দেখার জন্য এত আগ্রহী ছিলে কেন তুমি? তুমি যে সংবেদনশীল নও তা আমি জানি, কিন্তু তার জন্য ইরতেনসেনুকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার খুব প্রয়োজন ছিল? আমাকে তোমার ভাই বলো, আমাকেও তো জানাওনি একবারের জন্যও।'

'আমি দুঃখিত উপল। আমার জীবনে যে দুজন মানুষ আমার সবচেয়ে কাছের, আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় তারা হল ইরতেনসেনু এবং তুমি। কথাগুলো যে একান্তে তোমাকে বলব তার সুযোগ পাইনি।'

'কিন্তু সেনেনমুতের মৃতদেহ দেখার জন্য তুমি হঠাৎ এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন? আগামীকাল এত বড় একটি দিন আমাদের জন্য। এখনও আমরা জানি না বায়ুযান কার্যকরী হবে কি না, আমরা শূন্যে ভাসমান

থাকতে পারব কি না, আমি সঠিক পথে তোমাদের নিয়ে যেতে পারব কিনা। এখনও শেষ মুহূর্তের কিছু প্রয়োজনীয় কাজ বাকি। কিন্তু আজকেই তোমাকে...'

'সেনেনমুতের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।'

অগস্ত্যর এমন কথায় উপল চমকে উঠল! চমকে উঠল ইরতেনসেনুও, বিস্ফারিত চোখে সে তাকাল অগস্ত্যর দিকে। নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'কী বলছ! পিতাকে হত্যা করা হয়েছে! কে করেছে? কেন? কীভাবে?'

'তোমার এই তিনটি প্রশ্নের একটির উত্তর আমার কাছে আছে ইরতেনসেনু। আমি নিশ্চিত যে, কোনও রোগভোগের কারণে সেনেনমুতের মৃত্যু হয়নি। তাঁকে খুন করা হয়েছিল বিষ দিয়ে।'

'বিষ!'

'হ্যাঁ উপল, ঠিক যে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে শ্বেতপুষ্পের গাছটিকে।'

উপল এবারে উত্তেজনার স্বরে বলল, 'গন্ধক!'

'হ্যাঁ, গন্ধকই মহামন্ত্রী সেনেনমুতের মৃত্যুর কারণ।'

'কিন্তু তোমার এমনটা মনে হল কেন?'

'আমার মনে আগে কখনও এমন চিন্তা আসেনি। কয়েকদিন আগের কথা, আমার যন্ত্রটি তৈরি করার সময়ে একদিন মধ্যাহ্নে আমি ভোজনে বসেছি, আমার সঙ্গে তখন ছিল বাকারি। বাকারি এই যন্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করে দিয়েছিল। সে প্রতিদিনই আসত আমাকে সাহায্য করবার জন্য। সেদিন ভোজন চলাকালীন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। একসময় এসে গেল সেনেনমুতের কথা।

'বাকারি তার পিতার নানা কীর্তির গল্প করতে লাগল, কীভাবে তার কূটনৈতিক বুদ্ধিবলে হিতাইতদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন সম্ভব হয়েছিল তা বলার সময়ে বাকারির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। বুঝতে পারছিলাম সে তার পিতাকে কতটা ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। বলতে বলতে সেনেনমুতের শেষদিনগুলির প্রসঙ্গ এল। বাকারি যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে আমাকে জানাচ্ছিল তার পিতা কত কষ্ট পেয়েছেন মৃতুর আগে। আমার চিকিৎসাবিজ্ঞানে আগ্রহ আছে, আমি তাই বাকারিকে জিজ্ঞাসা করি কোন রোগে মারা গেছেন সেনেনমুত। বাকারি জানায় যে সেই রোগের নির্ণয় রাজবৈদ্যও করতে পারেননি।

'কিন্তু সেনেনমুতের শরীর ভীষণই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, গাঢ় হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল তাঁর শরীর, এবং একধরণের অদ্ভুত জলভরা ক্ষতে ভরে গিয়েছিল সেনেনমুতের বুক এবং উদর। এই বর্ণনা পাওয়ার পরই আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। সহজে আমি মানুষকে বিশ্বাস করতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি মানুষ এমন একটি প্রাণী যে নিজের স্বার্থরক্ষার কারণে অবলীলায় মিথ্যা বলতে পারে। আমি তাই আজ সকালে ফারাও হাতসেপসুতের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে আবার সেনেনমুতের মৃত্যুর কথা উত্থাপন করি। তখন দেখলাম তিনিও প্রায় একইরকমের বর্ণনা দিলেন। যদিও তিনি ক্ষতের কথা উল্লেখ করেননি, হয়তো সেনেনমুতকে খুব কাছ থেকে না দেখার দরুন শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষতগুলি তাঁর নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। এতে আমার বিশ্বাস হয় যে অন্তত বাকারি মিথ্যা কথা বলেনি।

'কিন্তু এমন কোনও রোগের কথা আমি আগে শুনিনি। তাই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার পরই আমি ইরতেনসেনুকে বলি অতিথিশালায় ফিরে যেতে। আমি নিজে যাই রাজচিকিৎসক বেবতির কাছে। তাঁকে সেনেনমুতের অসুখের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যা বললেন তার অধিকাংশই বাকারি এবং ফারাওয়ের বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেল।

'তবে তিনি এমন কিছু আরও বললেন যা বাকারি আমাকে বলেনি। চিকিৎসক হিসাবে রোগীকে আরও ভালো ভাবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য বেবতি আরও কিছু লক্ষণের পরিচয় পান। বেবতি আমাকে জানান যে সেনেনমুতের যকৃতটি অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে গিয়েছিল। উদরে হাত দিয়ে তার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় যা একেবারেই সম্ভব নয়।

‘বেবতি আমাকে আরও জানান যে মৃত্যুর একদিন আগে থেকে মহামন্ত্রী অসংলগ্ন কথা বলছিলেন, অনেকটা প্রলাপের মতো। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ই আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হল, এই সবক’টি লক্ষণ কোনও রোগের নয়, গন্ধকের বিষক্রিয়ার ফলে হয় এগুলি। ঠিক এই গন্ধক প্রয়োগেই বেশ কিছু বছর আগে কুন্দিনাপুরীর এক গ্রামীণ উপরাজাকে হত্যা করা হয়। সেই রাজার মৃতদেহ আমি দেখেছিলাম। তাই আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঠিক করি সেনেনমুতের মৃতদেহ একবার দেখব, সেই কারণেই মমি তৈরির কর্মশালায় ইরতেনসেনুকে নিয়ে যাওয়া, অমন নীচ ছলের আশ্রয় নেওয়া।

‘সেনেনমুতের শরীরে আমি ক্ষতগুলি দেখেছি। তারপর গোক যখন বললেন যে তাঁর যকৃত থেকে পচন ধরা ডিমের গন্ধ আসছিল তখন আর কোন সন্দেহই রইল না। ওই গন্ধ অন্য কিছুর নয়, গন্ধকের। গন্ধক সেবনের পর তা জমা হয় যকৃতে। ক্রমে যা যকৃতকে অকেজো করে দেয়, মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীরে অমন ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অন্তিম অবস্থায় গন্ধক জমা হতে থাকে মস্তিষ্কে, তখন রোগী উন্মাদের ন্যায় আচরণ করতে থাকে। এরপরই নেমে আসে মৃত্যুর করাল ছায়া।’

যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না ইরতেনসেনু। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল সে। উপলও চুপ করে ছিল তখন। একসময় ইরতেনসেনু বলল, ‘তাহলে শ্বেতপুষ্পের বৃক্ষটি এবং পিতার হত্যাকারী একই জন?’

‘খুব সম্ভবত তাই, দুজন আলাদা মানুষ একই রকমের বিষ ব্যবহার করবে এটা কাকতালীয় হবে।’

‘কিন্তু কেন?’

‘কারণ অনুমান করা খুব সহজ। শ্বেতপুষ্পের গাছটিকে নষ্ট করতে পারলে হাতসেপসুতের সিংহাসনকে দুর্বল করে ফেলা যাবে। অন্যদিকে সেনেনমুত ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি পুন্তের ভাষা পড়তে পারেন। তাই তাঁকে খুন করলে এটা নিশ্চিত করা যাবে যে সেই বৃক্ষের হদিশ আর কোনভাবেই কেউ পাবে না।’

উপল এবারে বলল, ‘ঠিক বলেছ! ব্যাপারটা এবারে পরিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু খুনটা তাহলে করল কে? তোমার কী মনে হয়? বাকারি?’

অগস্ত্য এ কথার জবাব দেওয়ার আগে ইরতেনসেনু বলল, ‘না, আমার তা মনে হয় না। প্রথমত, পিতার বয়স হয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে বাকারিই মহামন্ত্রী পদে নিযুক্ত হতো। তাই সে এই পদের লোভে পিতাকে হত্যা করবে এটা ভাবাটা দুষ্কর। অন্যদিকে সে যদি হত্যা করেই থাকে তাহলে সে নিজেই আবার ফারাও হাতসেপসুতকে এটা জানাত না যে পুন্তের ভাষা পড়তে আমি সক্ষম। সেই ফারাওকে এই প্রস্তাব দেয় যে আমি যেন এই দেশে আসি এবং ফারাও মেন্তুহোতেপের রেখে যাওয়া প্যাপিরাসের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করি। বাকারিকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি। নিজের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার মতো মানুষ সে নয়।’

‘তাহলে হত্যা করল কে?’

‘অথবা এটা বলা যায় যে হত্যাটা করল কারা?’

অগস্ত্যের এই কথায় সামান্য যেন অবাক হল ইরতেনসেনু এবং উপল। অগস্ত্য বলল, ‘গন্ধক কিন্তু এই দেশে সহজলভ্য নয়। এ দেশে কোন আগ্নেয়গিরি নেই যা গন্ধকের প্রাকৃতিক উৎস। এর অর্থ ভিনদেশের কেউ এটি এই শহরে নিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে আবার এও ভাবনার বিষয় যে ফারাও-এর মন্দিরে অবাধে প্রবেশের অধিকার সবার নেই, তেমনই ছিল না সেনেনমুতের খুব কাছে পৌঁছনোর সুযোগ।

‘অর্থাৎ এই হীন কার্যে প্রয়োজন অন্তত দু’জন মানুষের। একজন অন্যদেশ থেকে গন্ধক নিয়ে এসেছে এবং অন্যজন এই শহরে তার প্রয়োগ করেছে। আচ্ছা ইরতেনসেনু, একটি প্রশ্ন তোমাকে করব ভেবেও করতে ভুলে গিয়েছি বারবার। সেনেনমুত তোমাকেই কেবল কেন পুন্তের ভাষার শিক্ষা দিতে গেলেন? বাকারি তো তাঁর নিজের পুত্র। তাকে কেন শেখালেন না?’

ইরতেনসেনু খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ‘এর সঠিক উত্তর আমার কাছে নেই অগস্ত্য। পিতা আমাকে বারবার বলতেন পুন্তের ভাষা আমাকে শিখতেই হবে। এ নাকি আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

তখন ছোট ছিলাম, অতটা ভেবে দেখিনি। এখন তোমার প্রশ্নের পর মনে করে দেখলাম, পিতা এই শিক্ষা আমাকে বরাবর দিয়ে এসেছেন একান্তে। কখনও সন্ধ্যাবেলায়, কখনও বা গভীর রাত্রে, যখন গৃহের বাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন বলতেন রাত্রিযামই এই ভাষা শিক্ষার পক্ষে আদর্শ।'

'তার মানে কি এই যে, সেনেনমুত তার নিজের সন্তান বাকারিকে বিশ্বাস করতেন না? কিন্তু কেন?'

উপলের চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

'আমি জানি না উপল। কিন্তু এই ভাষা শিক্ষার সময়ে আমার বয়স ছিল দশ। বাকারিরও বয়স তখন আট। এতটুকু বয়সের পুত্রকে অবিশ্বাস করার কী কারণ থাকতে পারে? আবার এও তো ঠিক যে পিতা কোন এক সময়ে বাকারিকে নিশ্চয়ই বলেছিলেন যে পুন্তের ভাষা আমি পড়তে পারি। তা না হলে এটি তো বাকারির জানার কথা নয়। পিতা যদি বাকারির উপরে সন্দিহান হতেন তাহলে তো বলতেন না কোনভাবেই।'

'তাহলে বাকারিকে সন্দেহের তালিকায় রাখা যাবে না তাই তো?'

'সেই প্রশ্ন এখন অর্থহীন উপল', বলল অগস্ত্য।

'আমাদের হাতে সময় নেই আর। আগামীকালই যাত্রা, তার অন্তে কী আছে তা আমরা কেউই জানি না। এই দেশে আসার পর থেকে সব কিছু এত দ্রুত হয়ে চলেছে যে ভাবনার কোন অবকাশ পাইনি। বুঝতে পারছি যে সেনেনমুতের মৃত্যু আর আমাদের পুন্তে যাত্রা দুটি একসঙ্গে জড়িত। কিন্তু কেন তা জানি না। এই প্রশ্নের উত্তর আপাতত অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

'বাকারি এখনও অবধি এমন কিছু করেনি যা থেকে তাকে সন্দেহ করা যায়। কাল সে আমাদের দীর্ঘ এক অনিশ্চিত যাত্রার সঙ্গী হবে, তাই তার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখাটা প্রয়োজন। যদি সুস্থ শরীরে থীবসে আবার ফিরে আসতে পারি তাহলে সেনেনমুতের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা যাবে। এখন আমাদের কর্তব্য ফারাওকে এই বিপদের মুখ থেকে উদ্ধার করা। আজকের রাত্রে যথেষ্ট বিশ্রামের প্রয়োজন।'

উপল নিজের ঘরে শুতে চলে যাওয়ার পর অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু কিছুক্ষণ যাবৎ যাত্রার শেষ মুহূর্তের কিছু আলোচনা করে নিল। তারপর তারা শয্যায় গেল। ইরতেনসেনু ক্ষণিকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেও অগস্ত্য জেগে রইল, তার ঘুম আসছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল কোথাও যেন একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে, এক অস্বস্তি গ্রাস করছিল তাকে। কোথাও যেন একটা ভুল হচ্ছে, সেটি কী তা সে বুঝতে পারছে না। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে থাকার পর রাত্রির অন্তিম যামে ঘুম এল অগস্ত্যর। তখনই এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল সে।

সে দেখল এক দৈত্যাকার শ্বেতপুষ্পের বৃক্ষকে। সেই বৃক্ষের গুঁড়ি এতই চওড়া যে তাকে দু'হাতে বেড় দিয়ে ধরা যায় না। গাছটি যেন আকাশ ফুঁড়ে আরও উপরের দিকে উঠে গেছে। গাছের শাখাপ্রশাখা চারদিকে বিস্তৃত হয়ে এক ছায়া ছায়া ভাবের সৃষ্টি করেছে। সেই আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে অগস্ত্য। পুষ্পের মন মাতানো গন্ধে বিভোর হয়ে আছে ও। হঠাৎ-ই অন্য আরেক গন্ধ তার স্নায়ুকে নাড়িয়ে দিল।

এই গন্ধটি তো সুমিষ্ট নয়, এ যে রক্তের গন্ধ! মাটির দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল অগস্ত্য। শ্বেতপুষ্পের গাছের নীচে পড়ে রয়েছে এক মানুষের মৃতদেহ। কম আলোয় তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে অগস্ত্যের পায়ের নীচ দিয়ে। উষ্ণ সেই রক্ত স্পর্শ করছে ওর পায়ের আঙুলের অগ্রভাগকে। অগস্ত্য সামনের দিকে এগিয়ে যায়, অবয়বটিকে খুব চেনা লাগছে যে! কিন্তু মুখটিকে দেখা যাচ্ছে না তো! সহসাই ওর চোখে এসে আঘাত করে এক তীব্র আলোকরশ্মি।

ধড়ফড়িয়ে বিছানার উপরে উঠে বসে সে, দুঃস্বপ্নই ছিল তাহলে। পাশে এখনও অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে ইরতেনসেনু। কিন্তু জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঘর ভরিয়ে দিচ্ছে, ওই আলো ঘুম ভাঙিয়েছে অগস্ত্যর। অনেকক্ষণ আগে ভোর হয়ে গেছে! ক্লান্ত শরীরে ওদের কারোরই ঘুম সময় মতো ভাঙেনি। ইরতেনসেনুকে ডেকে তোলাতে সেও বিছানায় উঠে বসেই বুঝতে পারল যে কত বিলম্ব করে ফেলেছে তারা, সত্বর তৈরি হতে শুরু করল।



জানলাটিকে খুলে দিয়ে অগস্ত্য অলিন্দের কাছে এসে দাঁড়াল। দিনের প্রথম প্রহরের সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল তার গায়ে। সে তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'আপনি আমার ঈশ্বর নন। কিন্তু আপনার উপরে আমার বিশ্বাস আছে, এই জগতের প্রাণরক্ষাকারী আপনি। হে আমুন-রা, হে সূর্যদেব, কোন রহস্য গোপন করে রেখেছেন আমাদের থেকে? মেন্তুহোতেপের প্রহেলিকার শেষ সূত্রটি আপনি। যার অর্থ আমরা এখনও জানি না। এক অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা আজ আমাদের। আমি জানি না আপনার অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না, আমার জিজ্ঞাসু মন সেই বিশ্বাসে বাধা দেয়। কিন্তু আজ আমি আপনার কাছে আমার জন্য নয়, প্রার্থনা করছি ইরতেনসেনুর জন্য, ফারাও হাতসেপসুতের জন্য, উপল এবং বাকারির জন্য, যাদের ভবিষ্যত নির্ভর করে আছে এই যাত্রার উপরে। এদের আপনি রক্ষা করুন।'

১৯। উড়ান

নীলনদের তীরে আজকে সাজো সাজো রব। মনে হচ্ছে যেন কোনও আনন্দ উৎসবে মেতেছে সবাই। নদীর পশ্চিম পাড়ের একটি নির্দিষ্ট অংশকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সেখানে কারোর প্রবেশের অধিকার নেই। এই অংশের বাইরে এবং নদীর পূর্ব তীরে মানুষের ঢল নেমেছে। শিশুরা তাদের পিতার কাঁধের উপরে বসে আছে। কিছু মানুষ নদীর নিকটবর্তী গৃহগুলির ছাদে ভিড় জমিয়েছে। তাদের সবার নজর বায়ুযানটির দিকে।

বায়ুযানের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে আছে ইরতেনসেনু এবং বাকারি। তারা তাদের অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে শেষ মুহূর্তের জন্য পরীক্ষা করে নিচ্ছে যানের সবক'টি অংশ। যে বিরাট আকারের কাপড়টিকে তৈরি করা হয়েছে তার সেলাইয়ের অংশগুলিতে আরেকটু মোমের প্রলেপ দিয়ে নেওয়া হচ্ছে শেষ বারের মতো। বাকারি প্যাপিরাসের কাণ্ড এবং খড় দিয়ে তৈরি চুপড়িটির এক কোণে জড়ো করে রেখেছে বেশ কিছু শুকনো খাদ্যদ্রব্য। তাদের মধ্যে আছে খেজুর, ভুট্টার রুটি এবং রোদে শুকানো মাছ এবং শূকরের মাংস।

তিনটি বড় আকৃতির ঘড়ায় জল এবং কিছুটা সুরাও নিয়ে নিয়েছে সে। কতদিনের যাত্রা তা তারা এখনও জানে না। এই খাদ্য এবং পানীয় পরিমিত পরিমাণে খরচ করলে দশদিন অনায়াসে চলতে পারে। চুপড়ির অপর একটি কোণে একটি চামড়ার থলিতে নিজের যন্ত্রপাতিগুলিকে আগেই জমা করে রেখেছিল উপল। সে এখন অগস্ত্যর সঙ্গে রয়েছে।

বায়ুযানটি থেকে কিছুটা দূরেই সেই স্নানাগার যেটিকে অগস্ত্য তার যন্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করেছে। স্নানাগারটির বাইরে সারি দিয়ে রাখা কলসগুলির উপরের ঢাকনাগুলি খোলা। প্রতিটি কলসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন করে শ্রমিক। তাদের হাতে ধরা রয়েছে একটি করে মাঝারি আকারের পাত্র। অগস্ত্য স্নানাগারের ভিতরে প্রবেশ করল।

যে দুটি মোটা তামার তার জলাধারের উপরের লোহার পাতের গায়ে এসে শেষ হয়েছে তাদের পরীক্ষা করল। তারপর স্নানাগারের বাইরে বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেল কলসগুলির দিকে। অগস্ত্য এবং উপল প্রতিটি কলসের নিচ থেকে যে সরু তামার তার বেরিয়ে এসেছিল সেগুলিকে একের সঙ্গে একে যুক্ত করল।

তারপর তারা এসে দাঁড়াল স্নানাগারের অপর প্রান্তে, যেখান থেকে ধাতব নলটি বেরিয়ে এসে মিশেছে বায়ুযানের ছিদ্রের মধ্যে। ততক্ষণে বাকারিও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। অগস্ত্য তার দিকে তাকাতে সে হাসিমুখে বলল, 'বায়ুযান প্রস্তুত। ইরতেনসেনু ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে।'

অগস্ত্য তার দিকে তাকিয়ে হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তারপর উপলের দিকে তাকাল, 'তাহলে আর বিলম্ব করা সাজে না।'

কলসগুলির পাশে যে শ্রমিকরা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিকে মুখ করে অগস্ত্য উচ্চস্বরে বলল, 'কাজ শুরু করো!'

অগস্ত্যর আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি শ্রমিক আরও এক পা এগিয়ে এল কলসের কাছে। নিজের হাতে ধরা পাত্রটি থেকে এবারে উজ্জ্বল নীল বর্ণের একটি তরল ঢালতে লাগল কলসের মধ্যে। শ্রমিকদের কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে, কোনভাবেই যেন তাদের শরীরের কোন অংশ কলস অথবা কলসের নীচ থেকে বেরিয়ে আসা তামার তারের সংস্পর্শে না আসে। অতি সাবধানতার সঙ্গে সেই নিয়ম মেনে চলছে শ্রমিকেরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাত্রের সব তরল কলসে ঢেলে দেওয়ার পর কলসের মুখ বন্ধ করে দিয়ে পিছনের দিকে চলে এল তারা।

এবার অগস্ত্যর আসল পরীক্ষা। মুখে হাসি টেনে রাখলেও তার বুক অতি দ্রুত কম্পিত হতে লাগল। এত বড় যন্ত্র সে আগে তৈরি করেনি। যন্ত্রটি কাজ না করলে ইরতেনসেনুর তৈরি বায়ুযানের কোন প্রকার ব্যবহারই করা যাবে না। কোনও কথা না বলে চুপ করে ওই স্থানেই দাঁড়িয়ে রইল সে। উপলও অগস্ত্যর মনের অবস্থা বুঝতে পারছিল, সেও গম্ভীর মুখ নিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল কিছুটা দূরের বায়ুযানের দিকে। বাকারি কিন্তু এক কিশোরের মতো কৌতূহলী মুখ নিয়ে ঘুরে ঘুরে সমস্ত আয়োজন আরও একবার দেখছিল। স্নানাগারটি থেকে যে নলটি বেরিয়ে এসেছে সেটির নীচে এসে দাঁড়াল সে। নলটি কি সামান্য কেঁপে উঠল? নাকি তার মনের ভূল?

আরও ভালো করে নলটির দিকে তাকিয়ে রইল বাকারি। যেন মনে হল এক মুহূর্ত আগেই নলটি কেঁপে উঠেছিল? না, সেটা এখন আর মনে হচ্ছে না। তবে নলটির মধ্য দিয়ে খুব মৃদু এক আওয়াজ আসছে কি? শনগাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাতাস চলাচলের সময়ে যেমন আওয়াজ হয়! কিছুক্ষণের মধ্যেই এক আশ্চর্য জিনিস দেখল বাকারি। বায়ুযানটি যেন সামান্য নড়ে উঠল!

অগস্ত্য, উপলের চোখেও তা ধরা পড়েছিল। তারা তিনজনে একছুটে এবারে চলে এল বায়ুযানটির কাছে। ইরতেনসেনুর পাশে এসে দাঁড়াল অগস্ত্য। সে তখনও প্রবল মনোযোগে বায়ুযানটির দিকে তাকিয়ে আছে। বায়ুযানের কাপড়টি যেন ফুলে উঠতে শুরু করেছে। অগস্ত্য এবারে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল! জড়িয়ে ধরল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উপলকে। তাদের যন্ত্র কাজ করছে! দেখতে দেখতেই কাপড়ের অনেকটা অংশ ফুলে উঠল। যেন কোনও ঘুমিয়ে থাকা দৈত্য অতি দ্রুত জেগে উঠছে। বাকারি অগস্ত্যর পাশে এসে বলল, ‘এই জাদু কী করে সম্ভব হল অগস্ত্য!’

অগস্ত্য হাসিমুখে খুব সংক্ষেপে বাকারিকে এর উত্তর দিল, ‘কলসগুলির মধ্যে এখন এক শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে, সেই শক্তি তামার তারগুলির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে এসে জড়ো হয়েছে স্নানাগারের মধ্যের জলাধারের ভেতর রাখা লোহার পাতদুটিতে। এই লোহার পাতদুটি এবারে জলকে দ্বিখণ্ডিত করছে। আমার পরীক্ষায় আমি আগে খেয়াল করেছিলাম যে জলের মধ্যে এই শক্তি প্রবাহিত হলে জল দু’প্রকারের বায়ুর জন্ম দেয়। সেই দুই বায়ুর একটি হল উড়ানবায়ু। এই উড়ানবায়ু এখন ওই নল বেয়ে এসে জমা হচ্ছে বায়ুযানের ভিতরে। এই বায়ু বাতাসের তুলনায় হালকা, দেখবে খানিকক্ষণের মধ্যেই বায়ুযানটির উপরিভাগ কেমন আকার নেবে।’

সত্যিই তাই হল। অগস্ত্যর উচ্ছ্বাসের মধ্যেও ইরতেনসেনু চুপ করেছিল। কারণ তার অংশের পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। উড়ানবায়ুকে ধরে রাখতে সক্ষম হবে তো এই বিশেষভাবে তৈরি কাপড়? সে জানে যে উড়ানবায়ু ভীষণ ভাবে দাহ্য, তাই কাপড়ে নেসের গাছের রস লাগানো হয়েছে, এতে কোনভাবেই বায়ুযানে অগ্নি সংযোগ হবে না। কিন্তু তবুও তার মন অশান্ত। চিন্তার দোলাচল তাকে এখনও অবধি মূক করে রেখেছিল।

তবে ধীরে ধীরে তার মুখেও হাসি ফুটল। উড়ানবায়ুর প্রভাবে কাপড়ের তৈরি বায়ুযানের উপরিভাগ এক অদ্ভূত আকার ধারণ করল। নদীর দুই তীরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সমুদ্রের ভিতর থেকে বিস্ময় এবং উল্লাস মেশানো এক আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

বায়ুযানের কাপড়ের তৈরি অংশটি এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটিকে এখন উল্টানো অশ্রুবিন্দুর মতো লাগছে। উচ্চতায় এটি দশ পুরুষের সমান। এর উপরিভাগটি উত্তল, সেই অংশের পর নিচের ভাগটি ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। সরু অংশটি এসে শেষ হয়েছে সেই ছিদ্রে যেখানে নল এসে মিশেছে। ওই খান দিয়ে এখনও উড়ানবায়ু প্রবেশ করে চলেছে। এক সময় এই অংশটি টানটান হয়ে ফুলে উঠল।

উড়ানবায়ুর প্রভাবে এখন এটি উপরের দিকে উঠে আসতে চাইছে। নীচের অংশে লাগিয়ে রাখা চুপড়িটি মাটির সামান্য উপর উঠে শূন্যে ভাসমান রয়েছে এখন। তবে এটিকে মাটির সঙ্গে ধরে রেখেছে চুপড়ির চার

কোণ থেকে বেরিয়ে আসা চারটি মোটা রজ্জু। নদীর তীরের মাটিতে গেঁথে রাখা কাঠের টুকরোর সঙ্গে বাঁধা রয়েছে এগুলি।



বায়ুযানের কাপড়ের অংশটি অনিন্দ্যসুন্দর ভাবে রঙ করা। হলুদবর্ণের পশ্চাদপটের উপরে বৃত্তাকারে নীল রঙের নকশা আঁকা। নকশার মধ্যে আঁকা রয়েছে এক দেবীর ছবি। দেবী নগ্নপদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর পরনের বস্ত্র উজ্জ্বল রক্তবর্ণের। গলায় লাল এবং নীল বর্ণের মণিহার। দেবীর চুল গাঢ় নীল বর্ণের। তাঁর মাথায় বসানো মুকুটটিতে একটি রক্তবর্ণের বৃত্ত আছে, যাকে পেঁচিয়ে আছে একটি সর্প। বৃত্তটির দু'পাশ দিয়ে উঠে এসেছে দুটি শৃঙ্গ। ইনি দেবী হাথোর।

সাধারণত দেশে কোন প্রকার পবিত্র কাজে সর্বাগ্রে দেবতা আমুন-রা এর চিত্রই বর্ণিত হয়ে এসেছে এ যাবৎ। কিন্তু আজ এই অদ্ভুত দর্শন বস্তুটি, যা শূন্যে ভাসমান হয়ে আছে, মিশরের ইতিহাসে যার তুলনীয় কিছু কোনদিন হয়নি, সেই বায়ুযানে দেবতা রা-এর কোন স্থান নেই! দেবী হাথোরের মুকুটের গোল অংশটি রা-এর প্রতীক, ওইটুকুই। বায়ুযানের গায়ে দেবী হাথোরের উপস্থিতিতে থীবসবাসী অবাক হল বটে, তবে এই নিয়ে তাদের মনে বিশেষ প্রশ্ন জাগল না। বিস্ময়ের ঘোরে তখনও তারা হতবাক।

ইরতেনসেনু মাথা উঁচু করে দেবীর চিত্রটির দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মুখে তখনও হাসি লেগে রয়েছে। চরম বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও যে ফারাও হাতসেপসুতের কূটনৈতিক বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে এই চিত্রটি তার প্রমাণ। তাঁর নির্দেশেই হাথোরের ছবিটি আঁকা হয়েছে। ফারাও প্রকাশ্যে নিজেকে দেবতা আমুন-রা এর সন্তান বলে দাবী করেছিলেন, যে দাবীর বলে তিনি আজ মিশরের সিংহাসনে আসীন। কিন্তু হাতসেপসুত গোপনে দেবী হাথোরের উপাসক।

দেবী হাথোরের ক্ষমতা অপরিসীম। তিনি মাতার মতো স্নেহবৎসল, তাঁর আশীর্বাদে নারীর শরীর উর্বর হয়, সন্তানসম্ভবাদের যে-কোনও প্রকারের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন দেবী হাথোর। কিন্তু ইনি মন্দিরে পূজিত হলেও মহান আমুন-রা এর তূল্য নন। হাতসেপসুতের ইচ্ছা দেবী হাথোরকে দেশের প্রধান দেবতার মর্যাদা দেওয়া। পুরুষ শাসিত সমাজে এক ফারাও হয়েও হাতসেপসুতকে নকল দাড়ি পরে পুরুষ সাজতে হয়, তা না হলে এই দেশের মানুষের থেকে নাকি যোগ্য সম্মান পাওয়া যাবে না। এক নারী কেন পুরুষের ন্যায় সম্মান পাবেন না? মেধার তুলনায় কেন বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে লিঙ্গের ভেদকে? হাতসেপসুত চান এই সামাজিক ব্যবস্থাকে বদলে ফেলতে। কিন্তু কাজটি সহজ নয়, একদিনে এটি সম্ভব হবে না। এই অনির্দিষ্ট যাত্রার ভবিষ্যত হাতসেপসুতকে চিন্তিত রেখেছে, ফারাও হিসাবে তাঁর নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই বায়ুযান।

কিন্তু আজকের দিনটি মিশরবাসীর মনে আজীবন অটুট রয়ে যাবে। তাই এমন দিনে নিঃশব্দে থীবসবাসীর কাছে নিজের আরাধ্যা দেবীকে এই ভাবে উন্মোচিত করলেন হাতসেপসুত। দেবী যদি সহায় হন, যদি ইরতেনসেনু পুন্তের বৃক্ষ নিয়ে ফিরে আসতে পারে, তাহলে তাঁর মন্দিরটিকে হাথোরের নামে উৎসর্গ করবেন তিনি। এক নারী এই দেশকে শাসন করছে, এক নারীই ধীরে ধীরে হয়ে উঠবেন এই দেশের ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীক।

রজ্জুর তৈরি মই-এর সাহায্যে একে একে বায়ুযানের চুপড়িটির ভিতরে উঠে এল অগস্ত্য, ইরতেনসেনু, উপল এবং বাকারি। কাপড়ের অংশটিকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করল অগস্ত্য। উড়ানবায়ুর প্রভাবে এখন টানটান হয়ে ফুলে রয়েছে এটি, যথেষ্ট বায়ু প্রবেশ করানো হয়েছে। সে এবারে মাথার উপরে হাত তুলে নির্দেশ দিল কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক শ্রমিককে। শ্রমিকটি স্নানাগারের দরজার বাইরের মোটা তামার তারটিকে একটি কাঠের দণ্ডের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করে দিল। আর উড়ানবায়ু তৈরি হবে না।

অগস্ত্য এবারে বাম হাতে যে নলটি বায়ুযানে প্রবেশ করেছিল তাকে টেনে খুলে দিল এবং একইসঙ্গে ডান হাতে ধরে রাখা রজ্জুতে টান দিল। এই রজ্জুটিকে গোল করে সেলাই করা ছিল বায়ু প্রবেশের মুখটিতে, টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখটি বন্ধ হয়ে গেল, যাতে উড়ানবায়ু আর এই ছিদ্রপথে বেরিয়ে না আসতে পারে। এবার যাত্রা শুরু করতে হবে। উপলের দিকে তাকাল অগস্ত্য, 'প্রস্তুত?'

'প্রস্তুত ভাই, সব দেখে নিয়েছি। এবার আর বিলম্বের কী প্রয়োজন?'

উপল এবার নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে নির্দেশ দিল, 'রজ্জুগুলি খুলে দাও!'

উপলের নির্দেশের অপেক্ষাতেই যেন ছিল চারজন শ্রমিক। তারা দাঁড়িয়েছিল চুপড়িটিকে মাটির সঙ্গে ধরে রেখেছে যে রজ্জুগুলি তাদের কাছে। এবারে তারা নীচু হয়ে মাটিতে গেঁথে রাখা কাঠের গজালগুলিকে হাত দিয়ে ধরল। একে অপরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে এক সঙ্গে গজালগুলিতে টান দিল।

এই সময় এমন এক কাণ্ড হল যার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। তিনটি গজাল মাটি থেকে উপড়ে এলেও একটি এল না। এতে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটল! তিনটি রজ্জু মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুযান শূন্যে অনেকটা ওপরে উঠে গেল। কিন্তু তখনও একটি রজ্জু মাটিতে গেঁথে রয়েছে। শত চেষ্টা করেও কিছুতেও সেই গজালটিকে মাটি থেকে তুলতে পারল না শ্রমিকটি। এদিকে বাতাসের টানে বায়ুযান কিছুটা এগিয়ে গেল, তার ফল হল আরও সাংঘাতিক! যে গজালটি মাটিতে গেঁথে ছিল তাকে টানতে টানতেই নিয়ে চলল বায়ুযান, গজাল মাটি কেটে দ্রুত এগিয়ে চলল নদীর দিকে।

শ্রমিকটি নিজের সব শক্তি দিয়ে ধরে রেখেছিল গজালটিকে, তাকেও টেনে নিয়ে চলল। নদীর তীরের পিছল কাদামাটির জন্য কিছুতেই নিজের পা দুটো মাটিতে গেঁথে দিয়ে গজালটির গতি রোধ করতে পারল না সে। একটি বড় পাথরের টুকরো যেন নদীর ঠিক পাশটিতে এই দুর্ঘটনার জন্যই অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছিল। পাথরের খাঁজে গিয়ে আটকে গেল গজাল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকটি সজোরে আছড়ে পড়ল পাথরের গায়ে। এই আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়ল সে। এবারে বায়ুযানেরও গতি রুদ্ধ হল, রজ্জুটি যেন টেনে ধরে রইল তাকে, বায়ুযান রজ্জুটির দিকে বিপজ্জনক ভাবে হেলে পড়ল! অগস্ত্যরা কোনওক্রমে চুপড়ির ধারটিকে ধরে রেখে নিজেদের ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করছিল। নদীর বুকের প্রবল বাতাসে বায়ুযানটি আর একটু পরেই আছড়ে পড়বে নদীতে!

এমন সময় এক দুঃসাহসিক কাজ করল বাকারি। চুপড়ি থেকে রজ্জুটিকে লক্ষ করে ঝাঁপ দিল সে! কোনওক্রমে এক হাতে রজ্জুটিকে ধরতে পারল। পরক্ষণেই অন্য হাত দিয়ে রজ্জুটিকে জড়িয়ে ধরল। তারপর কোমর থেকে একটি ছোট ছুরি বার করে কাটতে লাগল রজ্জুটিকে। ঘষে ঘষে মোটা রজ্জুটিকে কয়েকক্ষণের মধ্যেই কেটে ফেলল সে। সঙ্গে-সঙ্গেই যেন সদ্য খাঁচা ছেড়ে বেরোন বাজপাখির মতো আকাশের দিকে দৌড় দিল বায়ুযান।

ঝুলতে থাকা রজ্জুটিকে তখনও শক্ত হাতে ধরে আছে বাকারি! বাতাসের টানে সে রজ্জু সমেত উড়ে এসে বায়ুযানের গায়ে ধাক্কা মারল, তারপর আবার দূরে সরে যেতে থাকল। ততক্ষণে উপল রজ্জুর অপর প্রান্ত ধরে নিজেকে নীচের দিকে নামিয়ে এনেছে, উপলের পা দুটি ধরে আছে অগস্ত্য। উপল বাকারির উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'সাহস ত্যাগ কোরো না বাকারি! রজ্জুটিকে শক্ত করে ধরে রাখো! একটু একটু করে উপরের দিকে উঠে আসার চেষ্টা করো!'

কিছুটা উপরের দিকে উঠে বায়ুযান যেন শান্ত হল। নদীর ঠিক উপরের বায়ু চঞ্চল, কিন্তু বেশ কিছুটা উঠে আসার পর তার গতি যেন অনেকখানি কমল। যে রজ্জুটি বাকারি শক্ত করে ধরে ছিল তা আরও একবার আছড়ে পড়ল বায়ুযানে গায়ে। ঠিক সেই সময়ই উপল ডান হাত বাড়িয়ে প্রায় অচৈতন্য বাকারিকে ধরে নিল, তারপর অমিত শক্তিবলে তাকে টানতে টানতে রজ্জুর উপর দিয়ে নিয়ে এল।

অগস্ত্যও উপলকে ধরে রেখেছিল, চুপড়ির উপরে বাকারিকে জড়িয়ে থাকা উপল হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পরক্ষনেই উঠে দাঁড়িয়ে চুপড়ির গায়ে বাকারিকে সোজা করে বসিয়ে দিল উপল। তার ডান হাতের কব্জির উপরে নিজের দুটি আঙুল কিছুক্ষণ রেখে ইরতেনসেনুর দিকে তাকিয়ে স্বস্তির হাসি হেসে বলল, 'জ্ঞান হারিয়েছে, কিন্তু নাড়ি সবল। একটু পরই জেগে উঠবে ও। অসম্ভব সাহসিকতার পরিচয় দিল বটে তোমার এই ভাই!'

সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে অগস্ত্যদের রক্ষা করল বাকারি। মাটিতে তখনও সমবেত জনগনের হর্ষধ্বনি শোনা যাচ্ছে। উল্লাসে কেউ হাততালি দিচ্ছে, কেউ দেবতার জয়গান গাইছে, কারোর শিঙার আওয়াজ বাতাস বিদীর্ণ করে বায়ুযানে এসে পৌঁছে যেন তাকে কম্পিত করছে। বাকারির জ্ঞান ফিরে এল। ডান হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে সোজা করে তুলল অগস্ত্য, তারপর বুকে জড়িয়ে ধরল তাকে। বলতে লাগল, 'ক্ষমা করে দিও আমাকে, ক্ষমা করে দিও।'

বাকারি আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে হতভম্বের মতো চেয়ে রইল উপল আর ইরতেনসেনুর দিকে। ইরতেনসেনু কিছু বলার আগেই উপল এগিয়ে এসে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'আজ তুমি না থাকলে আমাদের এই যাত্রার এখানেই সমাপ্তি ঘটত। বায়ুযান এই নদীতে আছড়ে পড়লে আমরা কেউই বাঁচতাম না। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে ভাই। আমি নিজেকে সাহসী ভাবতাম, কিন্তু তোমার সাহস আর প্রত্যুতপন্নমতির কাছে আমার সাহস তুচ্ছ।'

নিজের শয়নকক্ষের অলিন্দে দাঁড়িয়ে এই কাণ্ড প্রত্যক্ষ করছিলেন হাতসেপসুত। নদীর তীরে নিজে উপস্থিত থেকে জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাননি তিনি। এখান থেকেই ইরতেনসেনুদের যাত্রা শুরুর সাক্ষী থাকবেন ভেবেছিলেন। যেভাবে বায়ুযান উড়ানের সঙ্গে সঙ্গেই বিপজ্জনক ভেবে হেলে পড়ে নদীর দিকে এগিয়ে আসছিল সেই আশঙ্কায় ক্ষণিকের জন্য যেন তাঁর হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি দেখলেন কীভাবে বাকারি নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করল বাকিদের।

এতদূর থেকে দেখলেও বেশ ভূষার মাধ্যমে বাকারিকে বেশ চিনতে পেরেছিলেন হাতসেপসুত। অগস্ত্য সেনেনমুতের মৃত্যু নিয়ে যে-কোনও কারণে সন্দিহান তা অনুমান করতে পেরেছেন তিনি, কিন্তু তাকে এই নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ পাননি। 'অগস্ত্য কি বাকারিকে সন্দেহ করছে?' এমন প্রশ্নেরও উদয় হয়েছিল তার মনে। এখন তিনি ভাবলেন অগস্ত্য বাকারিকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে থাকলেও এবারে তার নিরসন হবে। বাতাসের টানে ধাবমান বায়ুযানটি এবারে একটু একটু করে ছোট হতে লাগল।

ফারাও হাতসেপসুত আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করলেন, 'হে মহান হাথোর, আপনি আপনার সন্তানদের আশীর্বাদ করুন, যেন তাদের যাত্রা নির্বিঘ্ন হয়, যেন তারা সবাই অক্ষত শরীরে এই দেশের বুকে আবার ফিরে আসতে পারে। আমি আপনার দাসানুদাসী। আমার এই আকুতি যেন আপনার কর্ণে গিয়ে পৌঁছয়।'

হাতসেপসুত এরপর আবার বায়ুযানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এখন আকাশে একটি ভাসমান ভুট্টার দানার মতো লাগছে সেটিকে। যতক্ষণ না সেটি দিগন্তে মিলিয়ে যাবে ততক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইবেন তিনি।

২০। উপলের যন্ত্র

ধীরে ধীরে নীলনদের বেশ কিছুটা উপর দিয়ে বায়ুযান এগিয়ে যেতে থাকল। জনতার উল্লাসের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল। এখান থেকে এখন তাদের পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্র লাগছে। অগস্ত্যদের কাছে এমন অনুভূতি এই প্রথম। এর আগে কোনও মানুষই তো এত উপর থেকে পৃথিবীকে দেখেনি। নীলনদকে এখন একটি গাঢ় নীল বর্ণের ফিতার মতো মনে হচ্ছে। তার দু'পাশে চাষের জমিতে যেন কেউ সবুজ আসন বিছিয়ে রেখেছে। তার মাঝে জেগে রয়েছে খেজুর গাছগুলি।

চাষের জমির পরই শুরু হচ্ছে থীবসের শহর। এত উপর থেকে একতলীয় এবং দ্বিতলীয় বাড়িগুলিকে বাদামি বর্ণের কৌটোর মতো লাগছে। নদীর দু'পারের লাক্সর এবং কার্নাকের মন্দিরদুটিকে বরং অনেকটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে। কার্নাক মন্দিরে হাতসেপসুত যে স্তম্ভগুলিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সোনায় মোড়া তীক্ষ্ণ চূড়ার কিছুটা উপর দিয়ে উড়ে গেল বায়ুযান। ইরতেনসেনু অগস্ত্যর কাঁধে ছোট একটি টোকা দিয়ে তাকে ডাকল। অগস্ত্য পিছনে ফিরে দেখল সে আঙুল তুলে উত্তরের অভিমুখে নির্দেশ করছে। অগস্ত্যর দেখাদেখি উপল এবং বাকারিও উত্তরের দিকে তাকাল, তাকিয়েই তিনজনে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

সেখানে যতদূর চোখ যায় ধূ-ধূ মরুভূমি। কয়েক দণ্ড আগে সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু মরুভূমির বালি খুব তাড়াতাড়ি তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই তপ্ত বালির সংস্পর্শে এসে বাতাস ঘন হয়। এত দূর থেকে এই ঘন বাতাসের মধ্য দিয়ে মরুভূমিকে খুব স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে না। তবে এই অস্পষ্টতার মধ্যেও জেগে রয়েছে তিন দৈত্য। তাদের গর্ভে হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে রয়েছেন তিন ফারাও। পাথরের তৈরি এই শবগৃহগুলিকে মিশরীয়রা বলে 'মের'। এদের ভূমিভাগ চৌকনো কিন্তু ক্রমশ তা উপরের দিকে সূঁচালো হয়ে উঠে গিয়ে যেন এক ত্রিভুজের জন্ম দিয়েছে।

এই মেরগুলির শৃঙ্গ একসময় নাকি সোনায় মোড়ানো ছিল। পরে তস্করের উপদ্রবে সেই সোনার মুকুট এখন অদৃশ্য। তবে এতে এদের খ্যাতি এতটুকু কমেনি। মিশরীয়রা বিশ্বাস করে এই মেরগুলি এই পৃথিবীর উচ্চতম সৌধ। যে অভাবনীয় কারিগরি দক্ষতায় এদের তৈরি করা হয়েছিল তা এখন অন্তর্হিত।

অগস্ত্য নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেরগুলির দিকে, এতদূর থেকেও যেন উদ্ধত অশরীরীর মতো আকাশের দিকে চেয়ে আছে তারা। অগস্ত্য মনে মনে ভাবল যদি এই অভিযানের শেষে ফিরে আসতে পারে তাহলে অবশ্যই মেরগুলিকে একবার দেখে আসবে সে। এদের রহস্য হয়তো তার কাছে অজানাই রয়ে যাবে, কিন্তু তবু তাদের অন্তত একবার সে স্পর্শ করতে পারবে। নতজানু হয়ে সম্মান জানাবে সেই নাম না জানা কারিগরিবিদকে, যার অসম্ভব প্রজ্ঞার ফসল এই পাথরের দৈত্যগুলি।

হয়তো এই ধরণীতে তারাই প্রথম যারা শূন্যে ভাসমান হল। আজকে যেন বিজ্ঞান আরও অনেকখানি এগিয়ে গেল। এই অগ্রগতিতে তারও সামান্য ভূমিকা আছে ভেবে বুকের মধ্যে গর্ব অনুভব করল ইরতেনসেনু। অগস্ত্যর দিকে তাকিয়ে দেখল তার চোখে মুখেও একই গর্ব এবং প্রশান্তির ছবি। এতক্ষণের বিহ্বলতা কাটার পরে যেন সম্বিত ফিরে পেল তারা চারজন। তারা পেরেছে! যে পথ স্থলে অগম্য এখন তারা সেই পথে পাড়ি দিয়েছে! নীলনদ সঙ্গী হয়েছে তাদের। এখন শুধু সঠিক অভিমুখে চলার প্রয়োজন, যাতে নীলনদের উৎসে পৌঁছনো সম্ভব হয়। এই কাজের দায়িত্বে রয়েছে উপল।

উপল এখন নিজের সরঞ্জামগুলিকে তার চামড়ার তৈরি থলি থেকে বার করে গুছিয়ে রাখছে। একটি যন্ত্রকে সে খুব সাবধানে বায়ুযানের চুপড়ির একটি প্রান্তের সঙ্গে শক্ত রজ্জুর দ্বারা বাঁধল। তারপর যন্ত্রটি যথেষ্ট উল্লম্ব ভাবে রয়েছে কিনা তার পরীক্ষা করতে লাগল। রজ্জুটিকে আলগা করে আর একবার যন্ত্রটিকে স্থাপন

করল উপল। তারপর অগস্ত্যদের দিকে পিছনে ফিরে বলল, 'এটি আমার দিগযন্ত্র। যত প্রয়োজনই থাকুক, কোনভাবেই চুপড়ির এই কোণে তোমরা কেউ আসবে না, আমার এই যন্ত্রটি কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেলে বায়ুযানকে চালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

উপলের নিষেধের ফলে যন্ত্রটির খুব কাছে যেতে পারল না ইরতেনসেনু। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েই মনোযোগ দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল সে। দিগযন্ত্রটি উচ্চতায় এক হস্তের সমান। এর নীচের অংশে রয়েছে দুটি ধাতব গোলক। ইরতেনসেনু দেখল, নীচের গোলকটি যন্ত্রের পাদদেশের সঙ্গে মজবুত ভাবে লাগানো। উপরের গোলকটি আকারে নীচের গোলকের তুলনায় অনেকটাই ছোট, কিন্তু এই গোলকটি ঘূর্ণায়মান। একটি ধাতব পাতের সাহায্যে এর ঘূর্ণনকে রোধ করা যায়।

উপল ধাতব পাতটিকে সরিয়ে নিলেই গোলকটি একবার ডান দিকে এবং একবার বাম দিকে ঘুরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হচ্ছে। এই গোলকের উপরে রয়েছে ধাতুরই তৈরি এক আশ্চর্য জন্তুর মূর্তি। জন্তুটি যেন আকাশে উড়ছে, এর শরীর এক বলশালী পুরুষের হলেও মুখ যেন পাখির ন্যায়, পিঠে দুটি ডানা আছে। ইরতেনসেনুর দিকে তাকিয়ে উপল বলল, 'এই দিগযন্ত্র কীভাবে কাজ করে বুঝিয়ে দিই। বাতাসের প্রবাহ দিনের বিভিন্ন সময়ে এবং মাটি থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় বদলে যায়, সেই সঙ্গে বদলে যায় তার গতি এবং অভিমুখ। এই যন্ত্র এই বদলাতে থাকা অভিমুখকে আমাদের চিনিয়ে দেবে।

বাতাসের প্রবাহের ফলে এই গোলকটি ঘুরতে থাকে, প্রবাহের দিক বদলালেই গোলকটিও সেই বাতাসের টানে ঘুরে যাবে। তার ফলে এর উপরে লাগিয়ে রাখা গরুড়ের মুখটিও ঘুরবে। গরুড়ের মুখ যে দিকে থাকবে আমরা বুঝে পারব বাতাসের প্রবাহও সেই দিকে আছে। সেই মতো আমরা এই বায়ুযানের অভিমুখও বদলাতে পারব যাতে করে সর্বক্ষণ নীলনদ আমাদের দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকে। নদীর গতিপথ সোজা নয়, তাই বায়ুযানের অভিমুখও বদলাতে হবে বেশ কয়েকবার।'

বাকারি মন দিয়ে উপলের কথা শুনছিল, তার এই আবিষ্কারটি সত্যই চমকপ্রদ। সমুদ্রযাত্রার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা যে এখানে উপলের সহায় হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে একটি শব্দ বাকারির অচেনা লাগল। যন্ত্রের উপরের এই অদ্ভুতদর্শন জীবটির নাম উপল কী বলল?

'তুমি যন্ত্রের উপরের ওই জীবটির নাম কী বললে? গরুড়?'

অগস্ত্য বলল, 'হ্যাঁ বাকারি, নামটি তুমি ঠিক শুনেছ। ভারতবর্ষের পুরাণের মতে গরুড় হলেন দেবতা বিষ্ণুর বাহন। তার পিঠে চড়ে বিষ্ণু আকাশপথে যাত্রা করেন। গরুড় একইসঙ্গে শক্তিশালী এবং দ্রুত, তিনি আবার সাহসেরও প্রতীক। আবার গরুড়কে সূর্যের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। কোনও-কোনও পুরাণ কথায় গরুড় সূর্যের রথের চালক। উপল তার যন্ত্রটির বেশ চমকপ্রদ নামকরণ করেছে। আমাদের বায়ুযানটিরও একটি নাম দেওয়া উচিত ছিল।'

ইরতেনসেনু বলল, 'ঠিক, এর নাম দেওয়া হোক হাথোরেত! ফারাও হাতসেপসুত এই বায়ুযানকে দেবী হাথোরের নামে উৎসর্গ করেছেন, আর মিশরীয় ভাষায় আমরা রথকে বলি রেত। তাই হাথোরেত।'

'বাহ, অতি উত্তম, আমরা সবাই তাহলে হাথোরেত নামেই এই বায়ুযানকে সম্বোধন করব।'

বাকারি আবার উপলকে বলল, 'আপনার উল্লেখ করা গরুড়ের কথা এখনও আমার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। কেমন অদ্ভুত মিল দেখুন। উত্তরের মরুভূমির মাঝে যে মের শবাধারগুলি আপনি একটু আগে দেখলেন সেখানে একটি মেরের সামনে এক আশ্চর্য প্রাণীর অতিকায় মূর্তি আছে। এই মূর্তির বয়সও মেরের বয়সের মতো, হাজার বছরের উপরে। এর শরীর সিংহের কিন্তু মুখটি মানুষের। একে আমরা বলি হোরেম-আখত। এই হোরেম-আখত হল দেবতা হোরাসের প্রতীক।'

'এই হোরাস দেবতা ওসাইরিসের পুত্র ছিলেন না?'

'হ্যাঁ ঠিক, হোরাস তাঁর পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেথকে হারিয়ে দেবতাদের সিংহাসনে রাজা হিসাবে আরোহণ করেন। এই হোরাসের আরেকটি প্রতীক হল বাজপাখি। মনে করা হয় কোনও সময়ে হোরেম-

আখতের পিঠে বাজপাখির ডানার মতো দুটি ডানা ছিল। পরে সেটি ভেঙে যায়।'

'সত্যিই আশ্চর্যকর মিল দু'দেশের পুরাণে।'

অগস্ত্যদের বুকে নিয়ে দক্ষিণের দিকে উড়ে চলল হাথোরেত। নীচের পৃথিবীতে দৃশ্যপট কিছুক্ষণ অন্তর বদলে যেতে থাকল। সূর্য যখন অস্ত গেল তখন লোকালয় শেষ হয়ে শুরু হয়েছে অনুর্বর বালিয়াড়ি আর রুক্ষ পাথুরে স্থলভূমি। ভুট্টার রুটি আর শুকনো মাংস দিয়ে নৈশাহার সমাপ্ত করল সবাই। তারপর এক পাত্র করে সুরা পান করা হল। রাত নামলেই এই দেশের বুকে শীতলতা নেমে আসে, মাটির এতটা উপরে তাপমাত্রা আরও কম।

রাতে পৃথিবীর বুক থেকে দিনের সূর্যের জমিয়ে রাখা যে উত্তাপ নির্গত হয় তা এই উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না। তাই এই সুরা এখন নেশার দ্রব্য নয়, শরীরকে উষ্ণ রাখার ঔষধ বিশেষ। উপল, বাকারি ঘুমিয়ে পড়লেও অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু কিছুক্ষণ জেগে রইল। মৃদু স্বরে আলাপ করছিল তারা। ইরতেনসেনু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সমুদ্রযাত্রার সময়ের সেই রাতটির কথা তোমার মনে আছে অগস্ত্য? যে রাতে তোমাক নুত আর গেবের গল্প বলেছিলাম?'

'মনে আছে, সেদিন ঘুম আসছিল না তোমার, দুশ্চিন্তার পাহাড় মাথায় জমে ছিল।'

'হ্যাঁ, সে পাহাড় তো এখনও সেখানেই আছে, তাকে এতটুকু টলানো যায়নি।'

'এমন ভাবে ভেবো না ইরতেনসেনু, বরং ভাবো সেই পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা এখন উঠে আসছি, পথ অজানা, কিন্তু মনে বিশ্বাস আছে অচিরেই চড়াই পেরিয়ে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাবই।'

এই বলে সামান্য হেসে ইরতেনসেনুকে নিজের কাছে টেনে নিল অগস্ত্য। দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য। সহসাই একটি শব্দ অগস্ত্যর কানে এসে পৌঁছল। শব্দটি খুব ক্ষীণ। অগস্ত্য আলিঙ্গন আলগা করে চুপড়ির প্রান্তে দাঁড়িয়ে আরও ভালো ভাবে শোনার চেষ্টা করল শব্দটিকে। একটি সুরধ্বনি ভেসে আসছে, যেন কোনও রমণী প্রবল দুঃখে কেঁদে চলেছে। অগস্ত্য মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকাল। আকাশে এখন পূর্নিমার চাঁদ ঝলমল করছে। তার আলোয় নীচের পাথুরে মাটিকে নীলচে-সবুজ লাগছে, সেই মাটির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে নীলনদ।

নীলনদের জলে চাঁদের আলো যেন শতবার প্রতিফলিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন নদীর বুকে হীরকখণ্ড বিছিয়ে রেখেছে। কান্নার শব্দটি মাটি থেকেই আসছে, অগস্ত্য চোখ ছোট করে আবার দেখার চেষ্টা করল। এত উপর থেকে এই আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় না। কোন ছোট জনপদের অস্তিত্ব এখানে আছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করল সে। না, তেমন তো কিছু চোখে পড়ছে না। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই ইরতেনসেনুর উদ্দেশে অগস্ত্য বলল, 'কোন কান্নার শব্দ তুমি শুনতে পাচ্ছ?'



‘কান্নার শব্দ?’

‘হ্যাঁ, ভালো করে শোন, যেন মাটির বুক থেকে উঠে আসছে।’

ইরতেনসেনুও এবারে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। খানিকক্ষণ পর সে মুখ বন্ধ রেখেই হাসতে লাগল। হাসি থামলে বলল, ‘পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, মহর্ষি অগস্ত্যর কী মনে হয়? কান্নার স্বরটি কোন নারীর? মাটিতে কোন লোকালয় তো নজরে আসছে না। তবে কি কোন অশরীরীর?’

অগস্ত্য কী উত্তর দেবে তা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। ইরতেনসেনুর কথার কৌতুকমিশ্রিত শ্লেষে সে বুঝতে পেরেছে যে, কোনও লোকালয় থেকে এই শব্দ ভেসে আসছে না। কিন্তু এই ক্রন্দনধ্বনি যে তার মনের ভুল নয় সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ইরতেনসেনু এবারে বলল, ‘এখানে কোন লোকালয় নেই অগস্ত্য। হাথোরেত যে গতিতে এখন এগোচ্ছে তাতে আগামীকাল সকালের দ্বিতীয় প্রহরের আগে কোন মানুষের দেখা পাওয়া যাবে না। এই কান্নার শব্দ আসলে প্রকৃতির নিজের সৃষ্টি। ছোট ছোট পাথরের পাহাড়ের মধ্যে যে ফাটল থাকে তার মধ্য দিয়ে হাওয়া যখন বয় তখন এমন শব্দের সৃষ্টি হয়, মনে হয় কোনও রমণী যেন কাঁদছেন।’

অগস্ত্য এবারে যেন সামান্য লজ্জা পেল, এই উপলব্ধি তো তার হওয়া উচিত ছিল। সঙ্কীর্ণ পথে বায়ু প্রবাহিত হলে এমন করুণ সুর বেরিয়ে আসে, এই ভাবেই বাঁশি বাজে। ইরতেনসেনু আরও বলল, ‘তোমার এই ভ্রম তোমার একার নয় জানো। এখন মিশরের মানুষ রাত্রির এই সুরকে কান্নার স্বর বলেই ভাবে।’

‘কেন?’

‘কারণ তাদের অপার ঈশ্বর বিশ্বাস। আমাদের পুরাণে এক গল্প আছে জানো। সকালে বাকারি তোমাকে দেবতা ওসাইরিস এবং তাঁর ভাই সেথের কথা বলেছিল না? স্বর্গের সিংহাসনের দখল নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে লড়াই চলছিল। একসময় সেথের নিজের কুবুদ্ধির দ্বারা ওসাইরিসকে হত্যা করে। তারপর রাত্রের অন্ধকারে তাঁর শরীর টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেয় নীলনদের জলে।

‘দেবী আইসিস ছিলেন ওসাইরিসের স্ত্রী। তিনি তাঁর স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে মর্মাহত হয়ে নীলনদের তীরে একটি গাছের নীচে বসে কাঁদতে থাকেন। মিশরবাসীরা মনে করে এই কান্নার আওয়াজ আসলে দেবী

আইসিসের। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নীলনদে বন্যা হয়। বন্যার কয়েকদিন আগে বাতাসের জোর বেড়ে যায়। তখন এই করুণ সুরের তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়।

'সেইসময়ে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে সেই সুর এসে পৌঁছয়ে থীবস নগরীর মানুষের কানে। রাত্রের অন্ধকারে চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেলে এই সুরকে আরও ভালোভাবে শোনা যায়। তখন নগরীর অধিবাসীরা ভাবে ওই দেবী আইসিস কাঁদছেন, তাঁর চোখের জল নীলনদের দুই কুল ছাপিয়ে উঠবে, বন্যা আসবে। এবং বস্তুতই এই কান্নার কয়েকদিনের মধ্যেই নদীতে বন্যা শুরু হয়।'

'বড় আশ্চর্যের এই ঘটনা তাই না? কেমন ভাবে বিজ্ঞান মিশে গিয়েছে লোকগাথার মধ্যে।'

'সত্যিই তাই। যেমন ভাবে মহর্ষি অগস্ত্যর কূপের জলে শক্তিপ্রবাহের দ্বারা জলকে বায়ুতে পরিণত করার গল্প বদলে গিয়েছে সমুদ্রের সব জল শুষে নেওয়ার লোককথায়।'

ইরতেনসেনুর কথায় এবার তারা দুজনেই একই সঙ্গে হাসতে শুরু করে। সেই হাসির শব্দ যেন সামান্য জোরে হয়েছিল। ঘুম জড়ানো গলায় উপল বলে উঠল, 'কপোত কপোতিরা এবার নিদ্রা গেলেই ভালো হয় মনে হয়। তোমাদের কাজ এখন না থাকতে পারে, আগামীকাল সকালে আমার কাজের তো কোন ছাড় হবে না।'

সত্যিই তাই। নাবিকের তো কিছু বিশ্রাম প্রয়োজনই। অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু এবার শুয়ে পড়লেও আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকল। তাদের একজনের হাতের তালু বদ্ধ থাকে আরেকজনের তালুতে। তারা চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। একসময় ঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে।

তখনও জেগে থাকে তিনজন। আকাশের চাঁদ, বায়ুতে ধাবমান হাথোরেত এবং মিশরের মাটির উপর দিয়ে বয়ে চলা নীলনদ।

২১। সেশেনুর অরণ্য

'আর কত ঘুমোবে? এখনি ওঠো, এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখো।'

বাকারির কথায় ঘুম ভাঙ্গল অগস্ত্যদের। সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। গতকাল অনেক রাত্রে ঘুমানোর কারণে তাদের ঘুম ভাঙতেও দেরী হল। ইরতেনসেনু দেখল চুপড়ির প্রান্তে দাঁড়িয়ে উপলরা কিছু একটা দেখছে। নদীর পূর্ব প্রান্তে দুটি মন্দির। মন্দির দুটি আশ্চর্য প্রকৃতির। দুটি মন্দির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে জমজ ভাইবোনের মতো। দুটিকেই অবিকল একই রকম দেখতে। তাদের আকার, আয়তন, মন্দির গাত্রের স্তম্ভের গায়ের অলঙ্করণ সব এক।

বাকারি বলল, 'এটি কোম ওম্বের মন্দির। গতবছর ফারাওয়ের একটি কার্যে এই মন্দিরে এসেছিলাম আমি। ডান দিকের যে মন্দিরটি দেখছ তা হল দেবতা হারো-এরিসের। ইনি দেবতা হোরাসের আরেকটি রূপ। আর বামদিকের মন্দিরটি স্থানীয় দেবতা সোবেকের। এখানে দুই দেবতাকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে পূজা করা হয়। তাই যাতে একজন না রুষ্ট হয়ে যান তাই দুটি মন্দিরই বাইরে এবং ভিতরে অবিকল এক রকমের।'

'সোবেক?' প্রশ্ন করল উপল।

'সোবেক হলেন নীলনদের দেবতা। কথিত আছে তিনি দেবী হাথোর এবং খনসুর সঙ্গে মিলে এই পৃথিবী তৈরি করেন। সোবেকের আশীর্বাদে জমি উর্বর হয়। ওই দেখ।'

বাকারির আঙুলের নির্দেশ লক্ষ করে মাটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অগস্ত্যরা। সোবেকের মন্দিরটি নীলনদের একেবারে পাশেই। নদী থেকে একটি প্রশস্ত ঢালু পথ মন্দিরের দিকে উঠে গেছে। সেখানে সারি দিয়ে শুয়ে আছে দৈত্যাকার কুমিরের দল! তাদের এক একটি দৈর্ঘ্যে প্রায় দু'মানুষ লম্বা। কিছুটা দূর থেকে মুণ্ডিত মস্তক দুই পুরোহিত কুমিরগুলির দিকে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

কুমিরগুলি শূন্যে কিছুটা লাফিয়ে পড়ে গিলে নিচ্ছে টুকরোগুলিকে। কোন কোন টুকরোকে অপরের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। তাদের লেজগুলি ডুবে আছে নদীর জলে, সেই লেজের ঝাপটায় জলে আলোড়ন উঠছে। বাকারি বলল, 'এরাই হলেন দেবতা সোবেক। সোবেকের মুখটি কুমিরের, দেহ মানুষের। এই মন্দিরে দিনে তিনটি বেলায় কুমিরদের এইভাবে ছাগের নরম মাংস খাওয়ানো হয়।'

অগস্ত্য বলল, 'ভারতবর্ষে যে গঙ্গা নদী আছে, সেই দেবী গঙ্গার বাহন হল মকর। মকরের মাথাটি কুমিরের এবং দেহটি শুশুকের। সোবেকের কথা বলাতে আমার মকর দেবের কথা মনে পড়ে গেল।'

মাটিতে সোবেকের মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা দুই পুরোহিতের তখন হাথোরেতের দিকে নজর গিয়েছে। থীবসের নদী প্রান্ত থেকে আশ্চর্য জাদুকরী যানের উড়ানের কথা তাদের অজ্ঞাত। আকাশের বুকে এমন অদ্ভুত দর্শন বস্তুকে ভেসে যেতে দেখে তাই তারা যারপরনাই বিস্মিত হল। মাথার উপরে দু'হাত তুলে উচ্চকণ্ঠে কিছু একটা বলতে লাগল তারা। এত উপর থেকে তাদের কথাগুলির কিছুই শোনা গেল না, শুধু কিছু অস্পষ্ট স্বর ভেসে এল।

ইরতেনসেনু একটি থলি থেকে একটি গোটানো প্যাপিরাস বার করে আনল। প্যাপিরাসটি একটি পাথরের টুকরোর সঙ্গে সুতা দিয়া বাঁধা। ইরতেনসেনু প্যাপিরাসটিকে পুরোহিতদের লক্ষ করে ছুঁড়ে দিল। বলল, 'পুরোহিতরা মনে হয় দেবতা সোবেকের নাম নিয়ে আমাদের অভিসম্পাত করছেন। ওই প্যাপিরাসে ফারাওয়ের নির্দেশবাণী লেখা আছে। ওতে লেখা আছে আমরা দেব আজ্ঞায় নদীর উৎস স্থলে যাত্রা করছি। ফেরবার সময়ে তারা যেন আমাদের সাহায্য করেন।'

উপল এখন আবার নিজের কার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। উপল জানে যে নুবিয়দের গ্রাম অবধি নীলনদের গতিপথ মোটমুটি সোজাই। তবে বায়ুর অভিমুখের সামান্য বদলের জন্য রাতে হাথোরেত নদী থেকে কিছুটা সরে গিয়েছিল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উপল উঠে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সে আবার হাথোরেতকে নীলনদের কাছে নিয়ে এসেছে। এখন দিকযন্ত্রটিকে আবার চালনা করে সে বায়ুর গতিপথ পরীক্ষা করল একবার। তারপর বলল, 'বাতাসের মুখ বদল হচ্ছে এবারে, হাথোরেতের অভিমুখ বদলাতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবে নদীর প্রথম জলপ্রপাতকে। তারপরই শুরু হয়ে যাবে নুবিয়দের রাজত্ব।'

এই বলে উপল উড়ানবায়ু ভরা কাপড়ের উল্টানো অশ্রুবিন্দু সদৃশ অংশটির দিকে এগিয়ে গেল। যে রজ্জু দিয়ে এর মুখটি বাঁধা ছিল সেই রজ্জুটি এবারে সামান্য আলগা করল সে। সঙ্গে সঙ্গে শোঁ-শোঁ শব্দে তা থেকে বায়ু নির্গত হতে থাকল। কিছুটা বায়ু বার করে দেওয়ার পরই উপল আবার রজ্জুটিকে শক্ত করে বেঁধে দিল। বায়ু বেরিয়ে যাওয়ার দরুন হাথোরেত নীচের দিকে নেমে এল। এবারে আরও একবার দিগযন্ত্রে বায়ু অভিমুখ পরীক্ষা করল উপল।

এই পরীক্ষা করতে করতে উপল বলল, 'ভারত মহাসাগরে বর্ষাকালে বাতাসের অভিমুখের পরিবর্তন হয়। তাই যে পথে সমুদ্রযাত্রা করা হয় সেই পথেই পুনরায় ফিরে আসা যায় না ভারতবর্ষে। নাবিকদের তাই বায়ুর দিক নির্ণয়ের বিদ্যা শিখতে হয়। এই অঞ্চলের বায়ুর গতিপ্রকৃতিও আমার আয়ত্তে এসেছে। এখানে বায়ু মূলত প্রবাহিত হয় উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে, তা না হলে নদীর উৎস সন্ধানে আমাদের যাত্রা করা সম্ভবই হতো না। তবে সর্বদা একেবারে সোজাসুজি বয় না এই বায়ু। উপরের দিকে যত উঠতে থাকবে ততই বাম দিকে প্রবাহের জোর বেশি হবে। আবার নিচের দিকে নামতে থাকলে ডান দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে এই বাতাস।'

দিকযন্ত্রের পরীক্ষার পর সন্তুষ্ট হয়ে যন্ত্রটিকে থামাল উপল। খানিকক্ষণ পর দেখা গেল হাথোরেত এগিয়ে চলেছে একটি শুভ্র বর্ণ ঘন মেঘের দিকে। মেঘটি যেন মাটির খুব কাছাকাছি জমাট বেঁধে আছে। এই দু'দিনে আকাশের মেঘের ভিতর দিয়ে এসেছে হাথোরেত, তখন মনে হয় যেন কুয়াশার আস্তরণের মধ্য দিয়ে চলেছে তারা। কিন্তু এখন হাথোরেত অনেকটাই নীচে নেমে এসেছে। এখানে মাটির এত কাছে কীভাবে মেঘের সৃষ্টি হয়? এরই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে গমগম শব্দের গর্জন। সেই গর্জন ক্রমে আরও বাড়তে লাগল।

হাথোরেত সেই মেঘের দিকে আরও এগিয়ে গেল। একসময় প্রবেশ করল তার মধ্যে। এবারে অগস্ত্যরা বুঝল এই মেঘের আসল পরিচয়। তাদের সবার গায়ে এসে লাগল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জলবিন্দুর কণা। তারা এসে পড়েছে নীলনদের জলপ্রপাতের উপরে। জলপ্রপাতটি প্রস্থে প্রায় কুড়ি পুরুষের সমান, উচ্চতায় ত্রিশ পুরুষের কাছাকাছি। এত উপর থেকে বিপুল জলরাশি আছাড় খেয়ে পড়ছে নীচের পাথরের উপরে। তখন জল ছোট ছোট কণায় বিভক্ত হচ্ছে। এই জলকণাগুলি বাতাসে ভাসমান হয়ে সৃষ্টি করেছে ঘন মেঘের, যার মধ্য দিয়ে এখন হাথোরেত ভেসে চলেছে।

মুখে চোখে ঠান্ডা জলের বিন্দু জমা হয়ে আরামবোধ হতে থাকল। হাথোরেতে যেটুকু জল আছে তা পান করার জন্য নির্দিষ্ট। চুপড়ির একটি কোণ শণের কাঠির আচ্ছাদন দিয়ে ঘিরে রাখা আছে। সেখানে শৌচকর্ম সমাধা করা হয়, বর্জ্য ত্যাগ করা হয় নদীর জলে। এই কার্যেও ব্যবহৃত হয় সামান্য জল। তাই মুখ এবং শরীর প্রক্ষালনের জন্য কোন জলই নেই। ইরতেনসেনুরা জলপ্রপাত থেকে বিচ্ছুরিত এই শীতল জলকণাকেই মুখে, চুলে, হাতের অনাবৃত অংশে মেখে নিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে জলপ্রপাতটিকে পার করে এগিয়ে চলল হাথোরেত। অগস্ত্য এই সময়ে মাথা নীচু করে দেখল নদী যেন ক্রমশ তাদের বাম দিকে সরে যাচ্ছে, কিন্তু হাথোরেত তো আর নদীকে লক্ষ করে এগোচ্ছে না।

'আমরা মনে হয় নদীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছি উপল। এভাবে চলতে থাকলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীপথকে হারাব।'

‘চিন্তা কোরো না অগস্ত্য। সেশেনুর জঙ্গল অবধি নদীর গতিপথ আমি হাতের তালুর মতো চিনি। এই দেখ।’

এই বলে উপল অগস্ত্যকে একটি প্যাপিরাসের টুকরো দেখাল। তাতে কালো কালিতে একটি নকশা আঁকা। বোঝা যায় তা নীলনদের।

‘নদী পথে থীবস থেকে সেশেনু অবধি যাত্রা করে আমি এই নকশাটিকে এঁকেছি। এই দেখো একদম উত্তরে থীবস, যেখান থেকে আমরা অভিযান শুরু করলাম। এখান থেকে নদী মোটামুটি সোজাই প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলের এই স্থুল বিন্দুটি প্রথম জলপ্রপাত, যা কিছুক্ষণ আগেই আমরা পেরিয়ে এলাম। এরপরই নদী বেঁকে গেছে বাম দিকে। তারপর প্রকৃতির কোন এক অজানা খেয়ালে পিছনের দিকে প্রবাহিত হয়েছে বেশ কিছুটা। এরপরে আবার দিক বদল করে বইতে শুরু করেছে ডানদিকে। তারপর একসময় ফিরে এসেছে তার আগের গতিপথে। আমরা এখন সোজাই চলব, চারদিনের মধ্যেই দেখবে আমরা আবার নদীর এই গতিপথে ফিরে এসেছি। ভরসা রাখো আমার উপরে, আমি জানি আমি কী কাজ করছি।’

এক সময় বাম দিকে সরতে সরতে নীলনদ অদৃশ্য হয়ে গেল উঁচু-নীচু মালভূমির আড়ালে। হাথোরেত এবারে বয়ে চলল স্থলভূমির উপর দিয়ে। শুরু হল নুবিয়দের রাজত্ব। নুবিয়রা মিশর দেশে বাস করলেও তারা থীবস, মেমফিস বা গিজাবাসী মিশরীয়দের মতো একেবারেই নয়। তারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় কিন্তু পেশীবহুল দেহের অধিকারী। নুবিয় নারীরা নিজেদের গলায় রংবেরং এর পাথরকুচির মালা পরে। নুবিয়রা মিশরীয় দেবতাতেও বিশ্বাসী নয়, তাদের নিজের দেবতা আছে, তাঁর নাম আনহুর।

তবে ছ’শো বছর আগে নুবিয়রা ফারাওয়ের বশ্যতা স্বীকার করে। এখন নির্দিষ্ট সময় পর পর তারা রাজস্ব পৌঁছে দেয় ফারাওয়ের কাছে। কখনও কখনও যদিও বা এদের কোন জনগোষ্ঠী বিদ্রোহ করে বসে তখন সেই বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। ইরতেনসেনুর মনে পড়ে গেল ফারাও মেন্তুহোতেপের কথা। তিনি এই নুবিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করেই উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরকে এক করেছিলেন। সেই যুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করেছিল পুন্তের অধিবাসীরা এবং এক আশ্চর্য দৈত্য কামারু। নুবিয়দের অধিকৃত এই অঞ্চলের নাম হল আবিদোস।

আবিদোসের উপর দিয়ে তিনদিন ধরে বয়ে চলল হাথোরেত। এই তিন দিনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল অগস্ত্যদের। নুবিয়দের বসতি পাথরের নয়। তারা ঘর বানায় নদীর পলিমাটি দিয়ে। শুকনো কাঠের কাঠামো তৈরি করে তার উপরে দেয় পলিমাটির প্রলেপ, গৃহের মাথায় দেয় খড়ের ছাউনি। একশো বা দুশোটি গৃহ নিয়ে তৈরি হয় এক-একটি গ্রাম।

কখনও কোন নাম না জানা গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল ছুটতে শুরু করেছে হাথোরেতের পিছুপিছু। কখনও বা আবার শত্রু ভেবে তাদের দিকে উড়ে এসেছে তীক্ষ্ণ বর্শার সারি। যদিও তাদের কোনটিই হাথোরেতের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। ইরতেনসেনু প্রতিটি জনপদে ছুঁড়ে দিয়েছে রানির নির্দেশবাণী। নুবিয়দের ভাষা অন্য হলেও প্রতিটি গ্রামের মোড়লের ফারাওয়ের হরফ পড়তে পারার কথা। এই অভিযানের শেষে যদি ইরতেনসেনুরা সেশেনুর জঙ্গল থেকে ফিরে আসতে পারে তাহলে এই নুবিয়রা হবে তাদের সহায়ক।

তৃতীয় দিনের সকালের তৃতীয় প্রহরে তারা এসে পড়ল আনহুরের মন্দিরের কাছে। এই মন্দিরটি পাথর দ্বারা নির্মিত। তবে মন্দিরের নির্মাণ কৌশল মিশরীয়দের থেকে আলাদা। মন্দিরগুলির শীর্ষদেশ ত্রিকোণা, সূঁচালো। অনেকটা মেরের শীর্ষদেশের মতো। এই মন্দিরের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বাকারি বলল, ‘আনহুর দেবতাকে সাপের মতো দেখতে। এই আবিদোসের জঙ্গলে ময়াল সাপ পাওয়া যায়, তাদেরকে নুবিয়রা আনহুরের নামে পূজা করে।

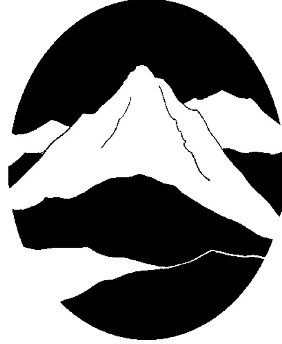
‘আনহুর পাতাললোকের দেবতা। সূর্যদেব রা এর সঙ্গে নাকি তাঁর প্রবল যুদ্ধ চলে রাত্রিবেলায়। বিগত কয়েকশো বছর ধরে নুবিয়রা ফারাওয়ের বশ্যতা স্বীকার করলেও তাদের ধর্ম বিশ্বাসে কখনও আঘাত

হানেননি কোন ফারাও। বছরে একবার নুবিয়রা আনহুরের বিগ্রহ নিয়ে আসে থীবস নগরীতে। তখন কার্নাক মন্দিরের প্রধান কক্ষে সেই বিগ্রহকে রেখে পূজা করা হয়। এই সময় আয়োজন করা হয় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার। যা ওপেতের উৎসবের থেকে কোন অংশেই কম নয়।'

এই সময় উপল বলল, 'আনহুরের এই মন্দির নুবিয় রাজ্যের সীমান্তের কাছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখ আবার নীলনদের দেখা মিলবে।'

সত্যিই তাই হল। আনহুরের মন্দির ছাড়িয়ে আরও একটু এগোবার পরই দেখা গেল নীলনদকে। সে যেন পথে হারিয়েছিল। এখন আবার ফিরে আসছে নিজের চেনা ঠিকানায়। নদী একটু একটু করে এগিয়ে আসতে আসতে একসময় আবার হাথোরেতের নিচ দিয়ে বইতে লাগল। এতক্ষণ তাদের নীচের জমি ছিল শস্য শ্যামলা সবুজ। কিছু ছোট ছোট অরণ্যের উপর দিয়েও উড়ে এসেছে তারা। কিন্তু অগস্ত্য লক্ষ করল আর কিছুটা দূর গেলেই এই দৃশ্যপট বদলে যাবে। কিছুটা দূরেই অপেক্ষা করছে আরও একটি জলপ্রপাত। তার পিছনে কে যেন গাঢ় সবুজ প্রাচীর তৈরি করে রেখেছে।

সেই প্রাচীরের গাত্র প্রস্তর নির্মিত নয়, বিরাট বৃক্ষরাজি ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে রচনা করেছে এই প্রাকারকে। এই হল সেশেনুর অরণ্য। অগস্ত্য উপলের দিকে তাকাল। দেখল তার চোয়াল শক্ত, ঋজু শিরদাঁড়া নিয়ে যেন কোন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে সে। অগস্ত্য তার ডান হাতটি রাখল উপলের কাঁধে। উপল চিন্তান্বিত গলায় বলল, 'এত অবধি যাত্রাপথ আমার পরিচিত ছিল অগস্ত্য। কিন্তু সেশেনুর জঙ্গল শুরু হওয়ার পর কী হবে তা আমি জানি না। যে কোন রকমের বিপর্যয়ের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের। এই অরণ্যের মধ্যে আমাদের একমাত্র চেনা সঙ্গী নীলনদ। কিছুতেই তাকে নজরের আড়াল করা চলবে না।'



সেশেনুর অরণ্য শুরু যখন হল তখন দিগন্তে সূর্য অস্তগামী। বিকালের নরম আলোয় বৃক্ষের পাতাগুলি গাঢ় সবুজ বর্ণের লাগছিল। তারা ক্রমে যেন আরও ঘন হয়ে এল। অযুত কোটি শাখাপ্রশাখার আড়ালে ক্রমে হারিয়ে যেতে থাকল নীলনদ। উপল এবার প্রমাদ গুনল। দিনের আলোয় তবুও নদীকে খুঁজে নেওয়া যাবে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে কী করবে সে! অরণ্যের মধ্যে কখনও যদি নীলনদ বাঁক নিয়ে নেয়? হাথোরেত তো বায়ুর টানে এগিয়েই চলবে। এই অরণ্যে প্রবেশ করে কেউ ফিরতে পারেনি কখনও। তার কারণটা এখন উপল ভালো মতোই বুঝতে পারছে।

পাতার ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখা যায় তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এই অরণ্যের ভূমি উঁচু-নীচু, প্রশস্ত বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু মাটি দেখা যাচ্ছে তাও ঘন গুল্মে ভরা। স্বাভাবিক ভাবেই এই পথে গমন করাটা আত্মহত্যারই সমান। আকাশপথে যাত্রা করে তারা নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবছিল। এখন উপল মনে হচ্ছে তাদের কোন বুদ্ধিই আর যথেষ্ট নয়। সেশেনুর অরণ্য যে এতটাই ঘন তা তার ভাবনার বাইরে ছিল। রাত্রের অন্ধকারে নীলনদকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন অদৃষ্টই ভরসা।

সূর্যের শেষ কিরণ এক সময় দিগন্ত বিস্তৃত জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাখির দল কলরব তুলে হাথোরেতের নীচ দিয়ে দল বেঁধে বাসায় ফিরতে লাগল। গোধূলির ক্ষীণ আলোয় শেষবারের মতো নীলনদকে

দেখতে পেল অগস্ত্যরা। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকার নেমে এল চরাচরে। তখনই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। উত্তেজিত স্বরে বাকারি ডাক দিল উপলকে, 'উপল! দেখো! এটা কী!'

মাথা ঝুঁকিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে উপলেরা যা দেখল তাতে তাদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। নীচের ঘন কালো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি ক্ষীণ আলোক রেখা! রেখাটি খুবই দুর্বল। জোনাকি পোকাকে নরম মাটির নীচে চাপা দিলে এমন ক্ষীণ আলোর আভা নির্গত হয়। অন্ধকারে চোখ সয়ে এলে ক্রমে সেই আলোকরেখা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিস্ময়াবিষ্ট গলায় অগস্ত্য বলল, 'নীলনদ!'

'কিন্তু কীভাবে? যেন মনে হচ্ছে কেউ ক্ষীণ দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে নদীর বুকে।'

বাকারির বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি।

'কীভাবে তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। কিন্তু এটি যে নীলনদই তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভালো ভাবে লক্ষ করে দেখো, আলোটি অল্প অল্প কাঁপছে। নদীর স্রোতের কারণে এমনটা হচ্ছে। মনে হচ্ছে এমন কিছু এক পদার্থ মিশে আছে নদীর জলে যা থেকে এই আলো নির্গত হচ্ছে।'

'তাহলে হাথোরেতের আর দিগভ্রষ্ট হওয়ার কোন কারণই নেই!' উপলের গলার স্বরে আনন্দের উচ্ছ্বাস স্পষ্ট।

'একদমই নেই! তবে আজ রাতে আমরা সবাই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। গোটা রাত্রি কাউকে না কাউকে জেগে থাকতেই হবে। মাঝে মাঝে প্রদীপের আলোয় দিকযন্ত্রটিকে পরীক্ষা করে বায়ুর গতিপথ দেখে নিতে হবে। এই অরণ্যের মধ্যে বায়ু কেমন আচরণ করবে তা আমরা কেউ জানি না। প্রথম প্রহরটি আমি জাগছি, তারপর যথাক্রমে বাকারি, ইরতেনসেনু এবং উপল।'

আকাশে তখন পঞ্চমীর চাঁদ। নীচের নিকষ কালো অন্ধকারকে সেই চাঁদের আলো স্পর্শটুকু করতে পারছে না। নীলনদের থেকে নির্গত ওই রহস্যময় আলোটুকুই সম্বল এখন। অগস্ত্য দিকযন্ত্রের ধাতব পাতটিকে আলগা করল। যান্ত্রিক শব্দ করে ঘুরতে লাগল গোলকটি। রাত্রি এখনও অনেক বাকি। নীলনদের উৎসে কি আগামীকাল পৌঁছতে পারবে তারা? পারবে তারা পুন্তের হারানো শহরকে খুঁজে বার করতে? কী আছে তাদের অদৃষ্টে? এই প্রশ্নগুলির একটিরও উত্তর অগস্ত্যর কাছ নেই। সে তাকিয়ে রইল তারা খচিত আকাশের দিকে।

২২। অকস্মাৎ দৈত্যের দেখা

পরদিন যখন ভোর হল তখনও হাথোরেত উড়ে চলেছে। সূর্যের জ্যোতি আরও জোরালো হওয়ার পর গাছের পাতার ফাঁকে নীলনদ আবার দৃশ্যমান হল। গত কালের রাত নির্বিঘ্নে কেটেছে। এখানকার বাতাসের গতিপথের কোন বদল হয়নি। সারারাত হাথোরেত প্রায় সোজাই চলেছে। তবে সেশেনুর অরণ্য যে এতটা বড় তা অগস্ত্যদের ধারণার বাইরে ছিল। এই বনানী যেন এক সবুজ সমুদ্রের মতো। নীচে নীলনদও আপন খেয়ালে বয়ে চলেছে।

সাধারণত উৎসের পরেই নদী খুব বেশি প্রশস্ত হয় না, স্রোতস্বীনী থাকে। তবে অগস্ত্যরা নদীর যতটুকু দেখতে পাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে নীলনদ এখনও একই প্রস্থের খাত দিয়ে বয়ে চলেছে, এর স্রোতও শান্ত। তাহলে নদীর উৎস এখনও অনেকটা দূরে। তবে উপল এতে খুব একটা বিচলিত নয়। হাথোরেতের মধ্যে এখনও অবধি যে পরিমাণ উড়ান বায়ু আছে তাতে করে অনায়াসে দু'দিন এখনও এই গতিতে এগিয়ে চলা সম্ভব। তার বিশ্বাস তার আগেই নদীর উৎস দৃশ্যমান হবে।

দিনের তৃতীয় প্রহর থেকে অরণ্যের মানচিত্র বদলে গেল। হাথোরেত এসে পড়ল পাহাড়ি এক অঞ্চলে। মাঝারি আকারের পাহাড়গুলির মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নীলনদ। এখন তাকে অনেক পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে। পাহাড় এবং অরণ্যের ফাঁকে নদীর দু'পাশে সবুজ ঘাসে ভরা চারণক্ষেত্র। সেখানে চরে বেড়াচ্ছে হরিণ, বন্য শূকর এবং মহিষের দল। উপল হাথোরেতের বায়ু কিছুটা কমিয়ে দিলে পর হাথোরেত খানিকটা নীচের দিকে নেমে এল।

প্রকৃতির রূপ যেন আরও ভালো ভাবে দৃশ্যমান হল এবারে। ঘাস খেতে খেতে কখনও নিজের খেয়ালে কোন হরিণ মাথা তুলে তাকাচ্ছে। সজাগ দৃষ্টি তার, এই অরণ্যে নিশ্চয়ই শ্বাপদের অভাব নেই। বন্য কুকুর এবং শৃগাল তো আছেই, সিংহ এবং চিতাবাঘ থাকাটাও অসম্ভব কিছু নয়। রাত্রে চিতাবাঘের ডাক শুনেছে তারা। নীলনদের তীরে রোদ পোহাচ্ছে কিছু কুমিরের দল। তারা যেন চলতশক্তিহীন প্রস্তরের মূর্তি। তাদের মুখগুলি হাঁ হয়ে আছে।

হরিণের দল সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে নদীর তীরে এসে জল খাচ্ছে। নদীর বুকে ভেসে আছে কিছু জলহস্তীর মাথাটুকু, বাকি শরীরটা জলের তলায়। এই জীবটিকে অগস্ত্য এবং উপল আগে দেখেনি, ভারতবর্ষে এর দেখা মেলে না। বাকারি তাদেরকে চিনিয়ে দিল। একটি জলহস্তী শ্লথ গতিতে নদী থেকে উঠে কাদামাটির উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। এদের দেহের তুলনায় মাথার আকার অনেকটা বড়, মুখের সামনের দিক চাপা, নাসারন্ধ্র স্ফীত। স্থূল মেদবহুল শরীরটিকে নিয়ে যে ভাবে জলহস্তীটি চলছিল তাতে মনে হয় যেন এই পৃথিবী থমকে রয়েছে, স্থির। বাকারি বলল, 'এই প্রাণীগুলিকে দেখে শান্ত মনে হলেও এরা অরণ্যের ত্রাস। প্রয়োজনে প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে পারে। এদের চোয়ালের জোর অকল্পনীয়। এক কামড়ে কোন বন্য মহিষের ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা করতে সক্ষম এরা। বনের সিংহ এবং জলের কুমিরও এদেরকে সমীহ করে চলে।'

অগস্ত্য এবং উপল অবাক হয়ে এই অদ্ভুত দর্শন প্রাণীটিকে দেখছিল। ইরতেনসেনুর কথায় তাদের চমক ভাঙল।

'নদীর স্রোত কি সামান্য বেড়েছে?'

সত্যিই মনে হচ্ছে নীলনদের ঢেউ-এর জোর যেন একটু বেশিই। নদীর বুকে বড় বড় পাথরদের জেগে থাকতে দেখা গেল। অগস্ত্যরা দেখল এই অংশের জমিতে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। অরণ্যও

যেন আবার ঘন হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নদীর দু'পাশের ঘাস জমি অদৃশ্য হল। বাকারি বলল, 'তোমাদের কারোর শীতবোধ হচ্ছে?'

ঠান্ডা হাওয়া বয়ে এল উল্টোদিক থেকে। সেই সঙ্গে একটি শব্দও সবার কানে এল। শব্দটি খুবই মৃদু কিন্তু তার অস্তিত্ব নিয়ে কোন সন্দেহই নেই। কেউ যেন পাথরের উপরে ক্রমাগত হাতুড়ি পিটছে। উপল এবারে চমকে উঠল, দ্রুত এগিয়ে গেল দিকযন্ত্রের দিকে। যন্ত্রটিকে চালনা করে বলল, 'উল্টোদিক থেকে ঠান্ডা বায়ু বইতে শুরু করল, এর অর্থ...'

এর অর্থ কী তা আর উপলকে বলে দিতে হল না। পাহাড়ের গায়ে একটি বাঁক নিতেই অগস্ত্যদের মনে হল তাদের মাথার উপরের সূর্য যেন অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল! কিছুটা দূরেই দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে এক পর্বত! অরণ্যের মাঝে এত বড় পর্বত থাকবে তা কল্পনাই করতে পারেনি তারা কেউ! পর্বতটির মাঝের অংশে একটি ফাটল। সেই ফাটল দিয়ে প্রবল বেগে নীচের দিকে নেমে আসছে এক জলপ্রপাত!

বিপুল জলরাশি নীচে পাথরের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে, তার ফলে ওই আওয়াজ তৈরি হচ্ছে। শীতল বাতাসের উৎসও ওই জলপ্রপাত। হাথোরেত এখন অনেকটা নীচ দিয়ে উড়ছে। যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চলেছে জলপ্রপাতের দিকে। আর কিছুটা পথ এগোলেই ধাক্কা খাবে পর্বতের গায়ে, নিশ্চিত মৃত্যু এখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে অগস্ত্যদের!

'হাতে সময় নেই, হাথোরেতকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে!'

এই বলেই উপল দৌড়ে গেল চুপড়ির এক প্রান্তে। চুপড়ির চারটি বাহুতে বাঁধা আছে বেশ কিছু পুটুলি, সেগুলি বালি দিয়ে ভরা। উপল এবারে চিৎকার করে বলল, 'সব কটি পুটুলি খুলে দাও দ্রুত!'

বাকি তিনজনও ছুট লাগাল অন্য তিন বাহুর দিকে। তড়িৎগতিতে খুলতে শুরু করল বালি ভরা পুটুলিগুলিকে। চারটি পুটুলি খোলার পরই দেখা গেল উড়ানবায়ুর প্রভাবে হালকা হয়ে হাথোরেত উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার গতিবেগও যে বেড়ে গেল! তারা আরও দ্রুত হাতে বাকি পুটুলিগুলিকে খুলতে শুরু করল। পর্বতের খাড়াই গাত্রের কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগল হাথোরেত। কিন্তু সেই সঙ্গে সে উচ্চতাও লাভ করছে। আরও একটু, আরও একটু উপরে ওঠার প্রয়োজন।

শেষ পুটুলিটিকে খুলে দেওয়ার পর ধপ করে চুপড়ির মধ্যে বসে পড়ল উপল। বাকিদের উদ্দেশে বলল, 'তোমরাও এখনই বসে পড়! শক্ত হাতে ধরে রাখ চুপড়ির গায়ের রজ্জুগুলিকে!'

হাথোরেত যখন জলপ্রপাতের একেবারে সামনে এসে পড়ল তখন সে মাটি থেকে অনেকটা উপরের দিকে উঠে এসেছে। পর্বতের গায়ের ফাটলের দিকে এগিয়ে চলল হাথোরেত। জলপ্রপাতের ঠিক উপরে এসে পৌঁছল। হাথোরেতের চুপড়িটি এবার জলের উপরিভাগকে স্পর্শ করে এগিয়ে যেতে থাকল। ইরতেনসেনুদের পরনের বস্ত্র ভিজিয়ে দিতে থাকল চুপড়ির মধ্যে ঢুকে আসা জল। আর উপরে ওঠা সম্ভব নয়।

এমন সময়ে এই গিরিখাতের মধ্যে বায়ুর গতিবেগ আচমকাই বৃদ্ধি পেল! যেন শুকনো পাতার মতো হাথোরেতকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকল এক উন্মত্ত বাতাস। টাল সামলাতে না পেরে হাথোরেত এক দিকে বেঁকে গেল, ধাক্কা মারল গিরিখাতের গায়ে। শক্ত পাথরের আঘাতে চুপড়ির একটি কোণ ভেঙ্গে গেল! ওই অংশে বসেছিল বাকারি। দ্রুত হাতে তাকে নিজেদের দিকে টেনে নিল অগস্ত্য এবং উপল!

গিরিখাতটি সংকীর্ণ হলেও খুব বেশি দীর্ঘ ছিল না। অচিরেই গিরিখাত পেরিয়ে হাথোরেত পর্বতের অন্য প্রান্তে এসে পড়ল। যে প্রবল বায়ু এতক্ষণ তাদেরকে বেসামাল করে রেখেছিল তাও যেন এবারে শান্ত হল। আবার সোজা হয়ে ভাসতে লাগল হাথোরেত, স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যেতে থাকল। খুব সাবধানে তারা চারজন চুপড়ির উপরে উঠে দাঁড়াল। চুপড়ির একটি অংশ আর নেই। সেখানে পানীয় জলের একটি ঘড়া রাখা ছিল, সেটিও চুপড়ি ভেঙে নীচে পড়ে গেছে। উপল গম্ভীর মুখে বলল, 'ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে

হাথোরেত। তবে আমরা যে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে ওই গিরিঘাত পেরিয়ে আসতে পারব তা ভাবিনি!'

তাদের নীচে আবার সেশেনুর অরণ্য শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নীলনদ। নদীর প্রস্থ এখন অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে। উপল বলল, 'মনে হয় না নদীর উৎস থেকে আর খুব বেশি দূরে আমরা। পানীয় জল আর নেই, সামান্য কিছু সুরা আছে, তাই দিয়ে যদি একটি দিন কাটাতে পারি তাহলে নীলনদের উৎসে আমরা ঠিক পৌঁছে যেতে পারব বলেই আমার বিশ্বাস। সৌভাগ্যের কথা এই যে, উড়ানবায়ু ভরা কাপড়ের থলিটির কোন ক্ষতিই হয়নি। অনেকটা উপর দিয়ে উড়ছি এখন, নীচের দিকে নেমে আসার দরকার।'

বাকারি এবারে প্যাঁচানো রজ্জুর বাঁধন খুলে দিয়ে হাথোরেতের ভিতরের উড়ানবায়ু বার করতে শুরু করল। ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল তারা। যে কয়েকটি সামগ্রী চুপড়ির ভাঙা অংশের খুব কাছাকাছি রয়েছে তাদেরকে সাবধানে সরিয়ে আনতে লাগল ইরতেনসেনু এবং অগস্ত্য। উপল দিগযন্ত্রটিকে চালনা করে বাতাসের গতিপথ বোঝার চেষ্টা করছিল। উচ্চতার এই তারতম্যে বায়ুযানের অভিমুখ বদলে যেতেই পারে। সহসা এক শব্দে চমকে উঠল সে। হুস করে এক আওয়াজ হল, যেন তীব্র গতিতে কিছু চলে গেল হাথোরেতের পাশ দিয়ে। সেটি কী তা বোঝা গেল না। তার পরক্ষণেই যেন সোনালি বিদ্যুতের এক রেখা ছুটে গেল চুপড়ির পাশ দিয়ে।

বল্লম! তার তীক্ষ্ণ ধাতব অগ্রভাগ ঝলসে উঠেছে সূর্যের আলোয়!

মুহূর্তের মধ্যে আরও কয়েকটি বল্লম অরণ্যের আড়াল থেকে ছুটে এল হাথোরেতের দিকে। কীংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অগস্ত্য ঝুঁকে পড়ে বোঝার চেষ্টা করছিল কোথা থেকে আসছে বল্লমগুলি। এক টানে তাকে চুপড়ির মধ্যে বসিয়ে দিল উপল। ওই বল্লমের সূঁচাগ্র শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। এবারে একটি বল্লম ছুটে এসে হাথোরেতের কাপড়ের থলিটিকে ফুটো করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বেগে নির্গত হতে থাকল উড়ানবায়ু!

প্রবল বেগে হাথোরেত নেমে আসতে লাগল মাটির দিকে, তাকে ভাসিয়ে রাখার মতো কোনও বায়ুই-ই আর অবশিষ্ট নেই। চুপড়িটি একটি দিকে বেঁকে গেছে। অগস্ত্যরা কোনওক্রমে রজ্জু ধরে বসে রয়েছে চুপড়ির মধ্যে। অগস্ত্য দেখল উপলের মুখে এক অদ্ভুত হাসি! সেই হাসিতে উন্মাদনা ছড়িয়ে আছে যেন! উপল চিৎকার করে বলতে গেল, 'অগস্ত্য! পুন্তের শহর...!'

উপলের কথা শেষ হল না। সজোরে অরণ্যের বুকে আছড়ে পড়ল হাথোরেত। প্যাপিরাসের কাণ্ড দিয়ে তৈরি চুপড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। জ্ঞান হারাল অগস্ত্য।

২৩। পুন্তের শহর

প্রবল মাথা যন্ত্রণার মধ্যে অগস্ত্যর জ্ঞান ফিরল। তার মুখের ফাঁকে কেউ ঢেলে দিচ্ছে এক তরল। সুমিষ্ট সেই তরলটি গলা বেয়ে নীচের দিকে নামার সময় অগস্ত্য বুঝল সে মৃত নয়। যে বা যারা তাদের দিকে বল্লম ছুঁড়েছিল তারা অগস্ত্যকে হত্যা করেনি, বরং তার শুশ্রষা করছে। অগস্ত্য কপালে চাপ ভাব অনুভব করল, মনে হয় কাপড়ের পটি বাঁধা আছে। চোখ দুটি অল্প খোলার পর কিছুই দেখতে পেল না সে, তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আছে।

কতক্ষণ ও সংজ্ঞাহীন হয়েছিল তা জানে না। এবার সে বুঝতে পারল তার হাত এবং পা বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল চেষ্টায় হাতের বাঁধন খোলার জন্য ছটফট করতে লাগল সে। তখন তার কাঁধে কারোর হাত পড়ল। শান্ত স্বরে এক পুরুষ কণ্ঠ পরিষ্কার প্রাকৃত উচ্চারণে বলল, 'শান্ত হও। শান্ত হও। কোনও ভয় নেই।'

সেই স্বরে এমনই আশ্বাসধ্বনি ছিল যা অগস্ত্যর ছটফটানি থামাল। সেই হাত জলে ভেজা নরম কাপড় দিয়ে অগস্ত্যের দু'চোখ একটু একটু করে মুছে দিল। অগস্ত্য এবারে সম্পূর্ণ রূপে চোখ খুলতে পারল। দেখল তার সামনে এক সৌম্যকান্তি যুবক বসে আছে, তার বয়স হয়তো অগস্ত্যরই সমান। যুবকের ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত, নিম্নাঙ্গ একটি সবুজ বর্ণের বস্ত্রে ঢাকা। যুবক দীর্ঘদেহী, তার গায়ের রঙ সোনালি ধানের শিষের মতো, তার ভ্রু দুটি গাঢ়, কর্ণদ্বয় মাথার দু'পাশে খাড়া হয়ে আছে। যুবকটির শরীরের গঠন অগস্ত্য এবং উপলের মতোই! অগস্ত্য অবাক হল। কিন্তু এই ভাবনা মনে উদয় হয়েই মিলিয়ে গেল। আকুল কণ্ঠে সে জানতে চাইল, 'আমার সঙ্গীরা, আমার স্ত্রী কেমন আছেন? কোথায় তারা? তাদের কিছু হয়নি তো?'

যুবকটি বলল, 'আপনার স্ত্রী অন্য একটি কক্ষে রয়েছেন, তিনি জ্ঞান না হারালেও তার বাম হাতে সামান্য আঘাত পেয়েছেন, চিকিৎসা চলছে। আর আপনার বাকি দুই সঙ্গী এই কক্ষেই রয়েছেন।'

যুবকের দৃষ্টি লক্ষ্য করে অগস্ত্য এবারে ঘরের অপর প্রান্তে তাকাল। সে এখন একটি মাঝারি আকৃতির কক্ষে রয়েছে। ঘরটি আকারে গোলাকার, বোঝা যায় মাটির তৈরি, উপরে শুকনো ডালপালার আচ্ছাদন। ঘরের মেঝে শুকনো পাতায় ঢাকা, তার উপরে শুয়ে আছে অগস্ত্য। সে এবারে উঠে বসল, অপর প্রান্তে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে উপল এবং বাকারি। তাদেরও হাত এবং পা বাঁধা। তবে তাদের উভয়ের হাতেই একটি করে পাত্র। সেটিকে দু'হাতের তালুর মাঝে ধরে তা থেকে কিছু একটা পান করছে তারা।

বাকারির কপালে অগস্ত্যর মতো কাপড়ের পটি বাঁধা, তার এক অংশে রক্তের গোলাকার দাগ। বোঝা যায় সেও মাথায় আঘাত পেয়েছিল। উপলের অঙ্গে অজস্র ছোট এবং মাঝারি কাটাছেঁড়ার দাগ, সম্ভবত হাথোরেত থেকে অরণ্যের কোনও কন্টকাকীর্ণ গাছের উপরে পড়েছিল সে। অবশ্য তাতে তার কোনও প্রকার ভ্রুক্ষেপ নেই, সে এক মুখ হাসি হেসে অগস্ত্যকে বলল, 'কী ভাই? বেশ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে রইলে যে। এখন কেমন বোধ করছ? এই পানীয়টা কিন্তু মোক্ষম, শুনলাম কোন বন্য হরিনীর দুধ থেকে তৈরি করে এটা, এমন জিনিস এ জীবনে আগে...'

উপলকে বাধা দিয়ে অধৈর্য স্বরে অগস্ত্য বলল, 'ইরতেনসেনু কেমন আছে উপল?'

পাত্রে আরেকটি চুমুক দিয়ে শান্ত স্বরে বলল উপল, 'হাথোরেত মাটিতে ভেঙে পড়ার পর থেকে ইরতেনসেনুর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তবে ঋষভের মুখে তো শুনলেই যে ইরতেনসেনু ভালো আছে। চিন্তা কোরো না, এরা আমাদের ক্ষতিসাধন করবে না।'

তাহলে এই যুবকটির নাম ঋষভ। মিশরের এই দুর্গম, গহীন অরণ্যের মধ্যে থাকা পুরুষটির নাম কেন ভারতীয়দের মতো? ও প্রাকৃত ভাষায় কথাই বা কীভাবে বলছে? অগস্ত্যর এমন ভাবনার মাঝে ঋষভ বলল, 'খুব আনন্দের বিষয় যে আপনার জ্ঞান ফিরে এসেছে। আপনার খবর আমি আপনার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা মিলিত হতে পারবেন। আমরা যাত্রা শুরু করব পুন্ত নগরীর উদ্দেশে।'

পুন্ত! তাহলে সত্যিই তারা সেই হারানো শহরের খোঁজ পেয়েছে! কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তারা কোথায় রয়েছে? অগস্ত্য প্রশ্ন করল, 'এখন আমরা পুন্তে নেই?'

সামান্য হেসে ঋষভ বলল, 'না, নগরী থেকে বেশ কিছুটা দূরে আছি আমরা এখন। আমাদের একটি দল জঙ্গলে শিকারে এসেছিল। এখানে আমাদের কয়েকটি মাটির তৈরি ঘর আছে, শিকারে এসে প্রয়োজনে যাতে রাত্রিবাস করা যায়। এই ঘরটি তাদের মধ্যে একটি। তবে আজ আমরা এখানে রাত্রি কাটাব না। এবারে ফিরে যাব আমরা। আপনারাও আমাদের সঙ্গী হবেন এই যাত্রায়।'

'আচ্ছা, আমাদের শুশ্রূষা করার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এভাবে হাত পা বেঁধে রেখেছেন কেন?'

'মাফ করবেন। যতক্ষণ না নগরীতে আমরা পৌঁছচ্ছি ততক্ষণ আপনাদের হাত এবং পা বাঁধাই থাকবে। আপনারা আগন্তুক। গত কয়েক শতাব্দীতে এই অরণ্যে পুন্তের অধিবাসী ছাড়া আর কোন মানুষের পা পড়েনি। আমরা এখনও আপনাদের সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করতে পারব না। যাত্রাকালীন আপনাদের সবার চোখও বাঁধা থাকবে।'

পুন্তের যাত্রাপথের সন্ধান তারা অগস্ত্যদের দিতে চায় না, তা বুঝল অগস্ত্য। যাই হোক, নগরীতে অন্তত পৌঁছনো সম্ভব হবে। কিন্তু তারা তো চাইলেই তাদের মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তা না করে তাদের চিকিৎসা করতে উদ্যত হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খানিকক্ষণ বাদে পেল সে। কিছুক্ষণ পর ঋষভ এবং তার কয়েকজন সাথী এসে অগস্ত্যদের চোখ বেঁধে ফেলল। তারপর তাদেরকে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের কোন একটি যানে উঠিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যানটি দুলকি চালে চলতে শুরু করল। যানটির গতি আর দোলা থেকে অগস্ত্যর মনে হল সেটি কোন পশুর দ্বারা টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অগস্ত্য তার ডান হাতে একটি নরম স্পর্শ পেল, সেই সঙ্গে তার নাকে ভেসে এল একটি গন্ধ। সুমিষ্ট এই গন্ধটি তার খুব চেনা।

'ইরতেনসেনু!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল অগস্ত্য।

চোখ বাঁধা অবস্থায় ইরতেনসেনুও অগস্ত্যর স্পর্শ পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠল। সে বলল, 'তুমি ঠিক আছ? কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

'না, মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম মনে হয়। কিন্তু এখন ঠিক আছি। তোমার কথা ঋষভের কাছে শুনেছিলাম।'

'হ্যাঁ, তারা আমাকে নারীদের জন্য সংরক্ষিত অন্য একটি কক্ষে নিয়ে গিয়েছিল। আমার বাম হাতে চোট পেয়েছি। তবে তারা খুব ভালো চিকিৎসা করেছে। আমার দু'হাত বাঁধা নেই। ডানহাতটি একটি শক্ত কাপড় আর কিছু শুকনো ডাল দিয়ে বুকের সঙ্গে বেঁধে রাখা আছে।'

এবারে একটি গলা খাঁকারির আওয়াজ পেল অগস্ত্য। সেটি উপলের। সে শ্লেষ মেশানো কৌতুকের স্বরে বলল, 'আর ইরতেনসেনু তুমি আমাদের খবর না নিতে চাইলেও জানিয়ে রাখি, তোমার স্বামীটির মতো আমি এবং বাকারিও এখনও বেঁচে আছি ভালোভাবেই। সামান্য চোট আঘাত যা লেগেছে তা ঠিক হয়ে যাবে।'

এই কথায় ইরতেনসেনু হয়তো সামান্য লজ্জিত হল, বিব্রতও বোধ করল, কিন্তু চোখ বাঁধা থাকায় অগস্ত্য তা দেখতে পেল না। সে এবারে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আমরা বেঁচে আছি কীভাবে? তারা তো চাইলেই আমাদের হত্যা করতে পারত।'

এর উত্তরে এবারে বাকারি মুখ খুলল। তার গলার স্বর শোনা গেল, 'হাথোরেতকে আকাশে উড়তে দেখে পুন্তবাসী এই শিকারীর দল একইসঙ্গে কৌতূহলী এবং ভীত হয়ে পড়ে। তা অবশ্য স্বাভাবিকই। তারা আগে কখনও এমন কিছু দেখেনি। তাই তারা হাথোরেতকে লক্ষ করে বল্লম ছুঁড়তে শুরু করে। বেশ উঁচু থেকে পতিত হলেও অরণ্যের ঘন বৃক্ষরাজির জন্য আমরা কেউ একেবারে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়িনি, তা হলে আমাদের কেউই বাঁচতাম না। তুমি একটি বৃক্ষের শক্ত কাণ্ডে ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান হারাও। আমারও কপালে আঘাত লাগলেও জ্ঞান হারাইনি। উপল পড়ে একটি কন্টকাকীর্ণ ঝোপের মধ্যে। ইরতেনসেনুর ভাগ্য সামান্য খারাপ থাকায় সে পড়ে একটি মাঝারি আকারের পাথরের উপরে।

'তারপর?'

উপল এবারে বলল, 'মাটিতে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আনুমানিক কুড়িজন নারী পুরুষ আমাদের ঘিরে ধরে। তাদের হাতে ছিল উদ্যত তির-ধনুক এবং বল্লম। তারা হয়তো আমাদের হত্যাই করত যদি না ইরতেনসেনু তাদের আটকাতো।'

'ইরতেনসেনু? কীভাবে?'

'হাতে আঘাত পেয়েও তা সহ্য করে শান্ত স্বরে ইরতেনসেনু তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। সে তার সঙ্গে থাকা ফারাও মেন্তুহোতেপের প্রহেলিকার প্যাপিরাসটি তাদের দেখায়। আমার সঙ্গে ফারাও হাতসেপসুতের রাজসংকেত সম্বলিত একটি সম্পুট ছিল। আমিও সেটি তাদের হাতে তুলে দিই।'

এবার ইরতেনসেনু বলল, 'আমি তাদেরকে বোঝাই যে কোন ক্ষতিসাধন করতে আমরা আসিনি। মেন্তুহোতেপের প্যাপিরাস তাদের হাতে দিয়ে সংক্ষেপে জানাই থীবসের মৃত শ্বেতপুষ্পের বৃক্ষের কথা। ফারাও-এর সম্পুটটি দেখেও তারা হয়তো কিছুটা আশ্বস্ত হয়। তখন তারা আমাদের চিকিৎসায় রত হয়। কিন্তু এখনও যে আমরা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নই তা তো বুঝতেই পারছ হাত, পা এবং চোখের এই বাঁধন থেকে। তবে পুন্তে পৌঁছনো তো অন্তত সম্ভব হচ্ছে। মহান হাথোরের আশীর্বাদে এখন শ্বেতপুষ্পের সন্ধান পেলেই হল!'

'একটি বিষয় আমাকে অবাক করল...' বলল অগস্ত্য।

'বুঝেছি কী বিষয়, এদের মুখে প্রাকৃত ভাষা শুনে আমিও ভীষণই অবাক হয়েছি। যদিও এদের কথা বলার ধরন ভারতীয়দের তুলনায় কিছুটা আলাদা। আর এদের কথার মধ্যে কিছু শব্দ অন্যরকম, যা আমাদের বোধগম্য নয়।'

'তাহলে প্রাকৃত না হলেও তার খুবই কাছাকাছি কোন ভাষা। কিন্তু এই ভাষায় তাহলে এরা কথা বলছেন কীভাবে?'

'সেটির উত্তর আমারও জানা নেই। তোমার কী মনে হয় উপল? পুন্তের নগরীতে ভারতীয়রা বাস করে? কীভাবে?'

উপল এর উত্তরে শুধু বলল, 'হুম।'

তার গলার স্বরে বোঝা গেল হয়তো অন্য কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন সে, কিন্তু তা কী সেটি জানা গেল না।

প্রায় অর্ধপ্রহর ধরে একটানা যাত্রা করল অগস্ত্যরা। তারপর একসময় যানটি থামল। তাদেরকে যান থেকে নামিয়ে আনা হল। তারপরে তাদের পায়ের বাঁধন এবং চোখের আবরণ খুলে দেওয়া হল। অগস্ত্য দেখল একটি বেশ চওড়া সরণির একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। তার অনুমানই ঠিক। তাদের যানটিকে টেনে নিয়ে এসেছে দুটি বৃষ। মাটির দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছে তারা।

এতটা পথ এসে নিশ্চয় তারাও ক্লান্ত। অগস্ত্য দেখল ঋষভ তার কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সাথীরা। নারী পুরুষ মিলিয়ে বাকারির কথা মতোই প্রায় কুড়িজনের দল। পুরুষদের সবার শুধুমাত্র নিম্নাঙ্গ একটা বস্ত্র দিয়ে ঢাকা। তা কোমর থেকে গোড়ালি অবধি নেমে এসেছে। নারীদের নিম্নাঙ্গের বস্ত্র অন্যরকমের, সে বস্ত্র দুটি পাকে আলাদা করে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। উরুর কাছে এসে বস্ত্রখণ্ডদুটি

এক হয়েছে। তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গে বক্ষবন্ধনী আছে। তাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে পাথরকুচির কণ্ঠহার। কয়েকজন পুরুষও এমন অলঙ্কার পরিধান করে আছেন। নারী পুরুষ উভয়ের হাতেই ধরা আছে শিকারের অস্ত্রাদি। কয়েকজন পুরুষ নারীর কাঁধ থেকে ঝুলছে মৃত শূকর এবং হরিণের শব। ঋষভ তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা গৃহে ফিরে যাও। আমি আগন্তুকদের নিয়ে এখন কেন্দ্রগৃহের দিকে গমন করব।'

ঋষভের সঙ্গে চলল তার তিনজন সঙ্গী। তাদের পাহারায় অগস্ত্যরা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে মাথা দু'পাশে ঘুরিয়ে চারদিক দেখছিল ইরতেনসেনু। এই তাহলে পুন্তের নগরী! যার কথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মিশরবাসী শুনে এসেছে! যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাত্র কয়েকদিন আগেও তারা সন্দিহান ছিল। এই সেই পুন্ত নগরী যেখানে সন্ধান মিলবে শ্বেতপুষ্পের! তবে ইরতেনসেনুর কল্পনার নগরীর সঙ্গে বাস্তবের পুন্তের কোন মিল নেই।

এই নগরীকে একটি ছোট জনপদও বলা চলে। এটি সুরম্য অট্টালিকা শোভিত নয়। নগরীর প্রতিটি গৃহই একতলীয়। পাথর দিয়ে বানানো। দুটি গৃহের মাঝখানে সমান মাপের ছাড় আছে। গৃহগুলির সামনে কিছুটা করে সবুজ জমি, তাতে বিভিন্ন শাক সবজীর চাষ করেছে গৃহস্থরা। তাদের কেউ কেউ বাড়ির সামনেই কোন কার্যে রত ছিল, কেউ বা সরণি বেয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সবাই ইরতেনসেনুদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল। এই নগরী গত কয়েকশো বছরে কোন ভিনদেশিকে দেখেনি। পথে ঋষভ অগস্ত্যকে তাদের অলৌকিক বায়ুযানের ব্যাপারে নানান প্রশ্ন করছিল, অগস্ত্যও হাসি মুখে তার কৌতূহল নিরসন করে চলেছিল।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ঋষভ এসে থামল একটি পাথরের বাড়ির সামনে। এই বাড়িটি আয়তনে অন্যান্য বাড়িগুলোর মতো হলেও আকারে বৃত্তাকার। এই গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে একটি ব্যাপার বুঝল অগস্ত্য। আক্ষরিক অর্থেই এই কেন্দ্রগৃহ শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। বাকি বাড়িগুলি যেন এই গৃহের চারপাশেই এক বৃত্তাকার নকশায় তৈরি করেছে। শহরটিকে যদি একটি গোলাকার উদরের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে তার নাভি হল এই কেন্দ্রগৃহ। ঋষভ গৃহের দরজায় সামান্য টোকা দিল। খানিকক্ষণ পর এক কমবয়সি যুবতী দরজা খুলল। তার দিকে তাকিয়ে ঋষভ বলল, 'অনিকাদেবীর সাক্ষাৎপ্রার্থী আমি। মিশর থেকে কয়েকজন আগন্তুক এসেছেন।'

যুবতীটি এই কথায় বেশ অবাক হল। বিস্ময়াবিষ্ট চোখে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অগস্ত্যদের দিকে। তারপর কিছু না বলে গৃহের ভিতরে প্রবেশ করল। খানিকক্ষণ পর আবার বেরিয়ে এসে বলল, 'আসুন, অনিকাদেবী আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

গৃহটির দরজা নীচু। মাথা সামান্য নামিয়ে একে একে সবাই গৃহে প্রবেশ করল। কয়েক পা হেঁটে একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। প্রথমে ঘরটিতে সেই অনাম্নী যুবতী ঢুকল, তার পিছনে এল ঋষভ, তার সঙ্গীরা এবং অগস্ত্যরা। বাইরে থেকে গৃহটি পাথর দ্বারা নির্মিত হলেও ঘরের ভিতরে মাটির প্রলেপ দেওয়া রয়েছে। দেওয়াল হালকা নীল বর্ণের। ঘরের দুটি দেওয়ালে দুটি জানালা রয়েছে, যা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। ঘরের এক পাশে রয়েছে যৎসামান্য কিছু আসবাবপত্র, একটি চারপায়া এবং দুটি কাঠের তৈরি আসন। অন্য পাশে রয়েছে একটি ভূমিশয্যা। তার উপরে যে বৃদ্ধা বসে আছেন তিনিই অনিকাদেবী।

বৃদ্ধার বয়স যে আনুমানিক কত তা বোঝা না গেলেও তার মুখের অজস্র বলিরেখা জানিয়ে দেয় যে তিনি অনেকগুলি বসন্তের সাক্ষী। বৃদ্ধার পরনে শুভ্রবস্ত্র। তিনি শয্যায় হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। তার সামনে এসে বসল ঋষভ। তার দেখাদেখি ইরতেনসেনুরাও মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল। বৃদ্ধার দু'পা স্পর্শ করে ঋষভ বলল, 'আমার প্রণাম নেবেন।'

'আশীর্বাদ করি।'

বরাভয়ের মুদ্রায় ডান হাত তুলে ঋষভকে আশীর্বাদ করে বৃদ্ধা ইরতেনসেনুদের দিকে তাকালেন। এই প্রথমবার তার চোখের দিকে নজর গেল ইরতেনসেনুর। অনিকাদেবীর দু'চোখ ঘোলাটে। শুকনো কাঠ পুড়ে যে ছাই তৈরি হয় সেই বর্ণের যেন চোখের মণিদুটি। বার্ধক্যজনিত কারণেই হয়তো এমনটা। বৃদ্ধা সেই

ঘোলাটে চোখ নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন ইরতেনসেনুর দিকে, এবারে তাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু তোমাকে বেশ দেখতে পাচ্ছি কন্যা। তুমি নিজেকে যতটা দেখতে পাও তার চেয়েও স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি। সময় আমার দৃষ্টিকে পরাজিত করলেও আমি এখনও অনেক কিছু দেখতে পাই, যার জন্য এই দু'চোখের প্রয়োজন হয় না। এই যেমন এখন আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মন সংশয়াবিষ্ট। কোনও দুরূহ চিন্তা তোমাকে পীড়িত করে রেখেছে বেশ কিছু দিন ধরে।'



তারপর একে একে অগস্ত্য, উপল এবং বাকারির দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। তারপর আবার বললেন, 'তোমাদের অপেক্ষাতেই আমি দিন গুনছিলাম। এবারে আমার ছুটি হবে। ঋষভ, তুমি এই আগন্তুকদের হাতের বাঁধন খুলে দাও। এরা পুন্তের অতিথি। এরা কোন ক্ষতিসাধন করবে না।'

অনিকাদেবীর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই ঋষভ এবং তার সঙ্গীরা অগস্ত্যদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করল। তারপর ঋষভ বৃদ্ধার হাতে তুলে দিলেন মেন্তুহোতেপের প্যাপিরাস। প্যাপিরাসটিকে খুলে তার অনেকটা কাছে মাথাটিকে নামিয়ে আনলেন অনিকাদেবী। খানিকক্ষণ পর চোখ তুলে বললেন, 'তোমরা শ্বেতপুষ্পের সন্ধানে এসেছ বুঝলাম। ছ'শো বছর আগে যখন মেন্তুহোতেপ এই পুন্ত নগরীতে দু'মাস কাটিয়ে ফিরে যান তখন নগরবাসী তাঁকে দুটি শ্বেতপুষ্পের বৃক্ষ উপহার স্বরূপ দেন। এমন বৃক্ষের তুলনা এই পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু এই প্রহেলিকার পাঠোদ্ধার করল কে?'

ইরতেনসেনু বলল, 'আমি।'

বৃদ্ধা আবার কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ইরতেনসেনুর দিকে। সেই চাহনিতে যেন একই সঙ্গে আনন্দ এবং আবেগের ভাব ফুটে উঠল। তিনি ইরতেনসেনুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমার কাছে এসো মা, এখানে এসে বোস।'

ইরতেনসেনুর এবার অনিকাদেবীর কাছে এসে বসল। তিনি পরম স্নেহে ইরতেনসেনুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমার নাম কী?'

'ইরতেনসেনু।'

'তোমার পিতার নাম কী?'

'আমার জন্মদাতা পিতাকে আমি দেখিনি। আমাকে বড় করেছেন আমার পালক পিতা।'

'প্রহেলিকাটি যে ভাষায় লেখা আছে তা পাঠ করার বিদ্যা তোমাকে কে দিয়েছিল?'

'আমার পালক পিতার কাছেই এর শিক্ষা পেয়েছিলাম আমি।'

'কী নাম তার?'

'সেনেনমুত।'

'তার শরীরের গড়ন কেমন ছিল?' সে ছিল মাঝারী উচ্চতার, গাত্রবর্ণ ঠিক মিশরীয়দের মতো নয়। তার গ্রীবার ডানদিকে এবং বাম বাহুর উপরের অংশে একটি করে তিল ছিল, তাই তো?'

ইরতেনসেনু হতবাক হয়ে চেয়ে রইল অনিকাদেবীর দিকে, তার মুখ থেকে কথা সরছিল না। তিনি অবিকল সেনেনমুতের বর্ণনা দিলেন কীভাবে?

অনিকাদেবী এবার বললেন, 'তার আসল পরিচয় এবার তোমার জানার সময় হয়েছে।'

এবার ইরতেনসেনু অবাক হল। সে পিছনে ফিরে বাকারির দিকে তাকাল, দেখল বাকারিও একই রকম অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ইরতেনসেনু আবার তাকাল বৃদ্ধার দিকে। বৃদ্ধা স্মিত হেসে বললেন, 'তার আসল নাম বিবান। বিবান এই পুন্তের সন্তান। ফারাও মেন্তুহোতেপকে পুন্ত নগরী শ্বেতপুষ্পের বৃক্ষ উপহার দেওয়ার পর তিনি তাদেরকে রোপন করেন থীবসে তাঁর মন্দিরের সামনে। তাদেরকে উৎসর্গ করেন মিশরের যুদ্ধের এক দেবতার নামে।

'এই ঘটনা আমার জন্মের পাঁচশত বছর আগে ঘটে। মেন্তুহোতেপের এই প্রহেলিকা তাঁর নিজের লেখা নয়। এই পুন্তের এক অধিবাসীরই লেখা। মেন্তুহোতেপ পুন্ত নগরীর ভাষা পড়তে আদৌ সক্ষম হননি। আমরা পুন্তকে বাইরের জগতের থেকে গোপন রাখতে বদ্ধপরিকর, তাই মিশরের ফারাওকেও এই ভাষার শিক্ষা দিইনি আমরা।'

এবারে অনিকাদেবীর কথার মাঝে বাকারি বলে উঠল, 'তাহলে এই প্রহেলিকাকে ফারাওয়ের সঙ্গে মিশরে পাঠাবার প্রয়োজন কী?'

'ভবিষ্যতের একটি দিনের কথা ভেবে, যদি কোন কারণে থীবসের শ্বেতপুষ্পের বৃক্ষের মৃত্যু হয় তাহলে তার খোঁজ পাওয়ার জন্য।'

'কিন্তু সেই ভাষা তো মিশরের কেউই পড়তে পারবে না। তাহলে সেটিকে রাখার কী অর্থ?'

বাকারির গলার স্বর রূঢ় শোনাল। তার নিজের পিতা যে মিশরীয় নন তা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

'এই কারণেই বিবানের মিশরে গমন। তার আগেও পুন্তের নাগরিকরা মিশরে থেকেছে। ভীষণ গোপনে মিশে গেছে মিশরীয়দের সঙ্গে। যুগ যুগ ধরে এই পুন্ত শহরের একজন প্রতিনিধি মিশরের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। তাদের কাজ ছিল ওই দিনটির অপেক্ষা করা, যদি সেই দিন আদৌ কখনও এসে পৌঁছয় তাহলে যাতে তারা সেই প্রহেলিকার পাঠোদ্ধার করে তৎকালীন ফারাওকে সাহায্য করতে পারে। এই কারণে তারা ফারাওয়ের রাজসভায় কোনও না কোনও কার্যে নিযুক্ত হয়ে যেত।

'পুন্তের অধিবাসীরা স্থিতধী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, তাই ফারাওয়ের ব্যক্তিগত পার্ষদের কাজ খুব সহজেই পেত তারা। তোমরা জানলে অবাক হবে, গত ছ'শো বছরে এমন বারোজন পুন্তবাসী থীবসের রাজসভায় নিয়োজিত ছিল। কোনও একটি সময়ে মাত্র একজনই থাকত মিশরে যে পুন্তের এই ভাষা জানত। তাদের কেউ ছিল ফারাওয়ের ব্যক্তিগত পার্ষদ, কেউ প্রধান উপদেষ্টা, কেউ গ্রন্থাগারের প্রধান আবার কেউ ছিল মহামন্ত্রী। যেমন ছিলেন বিবানের পিতা। তিনি ছিলেন ফারাও প্রথম তুতমোসের সময়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক। তাঁর মৃত্যুর পর এই দায়িত্ব এসে পড়ে বিবানের উপরে।

'বিবান এই কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য দু'বার ভাবেনি। সে জানত সে চিরদিনের জন্য পুন্ত ত্যাগ করছে। কিন্তু যেদিন বিবানের যাত্রা করার কথা তার কয়েকদিন আগেই তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী প্রসবের সময়ে মারা যান। বেঁচে যায় তার সন্তানটি, সেই দু'দিনের সন্তানকে কোলে নিয়ে বিবান যাত্রা করে মিশরের উদ্দেশে। মিশরে পৌঁছে সে নিজের নাম বদলে রাখে সেনেনমুত। তার সদ্যজাত কন্যাটিকে সে গোপনে দান করে থীবসের এক অনাথ আশ্রমে। বিবান কয়েক বছর অন্তর এই নগরীতে আসত, কয়েকটি ঘন্টা কাটিয়ে ফিরে

যেত আবার। তার কাছেই আমি শুনি সে বিবাহ করেছে এক মিশরীয় নারীকে, তার ঔরসে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়।'

ইরতেনসেনু মৃদু স্বরে বলল, 'সেই সন্তানটি এই যুবক।'

এই বলে সে বাকারির দিকে দেখাল। বৃদ্ধা এবারে তার আসন ছেড়ে উঠে ধীর পায়ে বাকারির কাছে এসে দাঁড়ালেন। সস্নেহে বাকারির চিবুকটি তুলে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার রক্তেও তবে পুন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তোমার মুখমণ্ডলে বিবানের সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি এখন আমি।'

এই সময় অগস্ত্য বলল, 'তাহলে ইরতেনসেনু...'

হ্যাঁ, ইরতেনসেনু বিবানের কন্যা। এই নগরীর মাটিতে তার জন্ম হয়েছিল। তার জন্মের সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। যেদিন কোলের মেয়েটিকে নিয়ে সে এই শহর ত্যাগ করে সেদিনও শেষবারের মতো তাকে আমি আদর করি। পরে বিবান তাকে অনাথ আশ্রম থেকে দত্তক নেয়। নিজের আত্মজাকে ছেড়ে সে বেশিদিন থাকতে পারেনি। সেই কারণেই বিবান ইরতেনসেনুকে পুন্তের ভাষা শিক্ষার পাঠ দিয়েছিল। কিন্তু তার দুই সন্তানের কাছে সে আজীবন নিজের পরিচয় গোপন রেখেছে। শতাব্দী প্রাচীন এক শপথকে সম্মান দেওয়ার জন্য নিজের আত্মপরিচয়কে বিসর্জন দিয়েছিল সে।'

এই বলে কিছুক্ষণের জন্য থেমে রইলেন অনিকাদেবী। গোটা ঘরে তখন আর কোন একটিও শব্দ নেই। এমন বিস্ফোরক সত্যের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ইরতেনসেনু বা বাকারি কেউই প্রস্তুত ছিল না। তারা এখনও যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। যাঁকে পালক পিতা বলে জানত ইরতেনসেনু সে আসলে তার জন্মদাতা! দত্তক নেওয়ার পর থেকে তাকে কখনও পিতার অভাব বুঝতে দেননি সেনেনমুত।

কিন্তু ইরতেনসেনু তো একবারের জন্যও তাঁকে নিজের জন্মদাতা পিতা বলে ভেবে উঠতে পারেনি, সব ছাপিয়ে কোথাও এক বাধা, এক সঙ্কোচ তার মনে রয়েই গিয়েছিল। আজ ওর মনে হচ্ছে তার সেই পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে, কিন্তু সেই উপায় তো আর নেই! এক প্রবল কষ্টে ইরতেনসেনুর হৃদয় মুচড়ে উঠছিল।

সেই সময়ে অগস্ত্যর মনের মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তর ঘুরপাক খাচ্ছিল। ইরতেনসেনু সেনেনমুতের নিজের সন্তান, তার মাতাও পুন্তের। অতএব তার শরীরে কেবলমাত্র পুন্তের রক্তই প্রবাহিত হচ্ছে। সেই কারণেই সেনেনমুত ইরতেনসেনুকে এই ভাষা শিক্ষার পাঠ দিলেও বাকারিকে দেননি। কারণ পুন্তের রহস্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব ইরতেনসেনুরই।

অনিকাদেবী এবারে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আজ শ্বেতপুষ্পটিকে এই নগরী থেকে আবার নিয়ে যাওয়ার জন্য বিবানের নিজেরই আসার কথা। কিন্তু তার স্থানে তুমি এসেছ, অর্থাৎ...'

ইরতেনসেনু কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে শুধু তিনটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারল, 'পিতা আর নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন অনিকাদেবী। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমরা নিশ্চয় ক্লান্ত। এখন বিশ্রাম করো। আগামীকাল ঋষভ তোমাদের শ্বেতপুষ্পের উদ্যানে নিয়ে যাবে। এই নগরীতে তো কোনও অতিথিশালা নেই। এই গৃহের একটি কক্ষে তোমাদের থাকার আয়োজন করা হবে।'

'মাফ করবেন দেবী অনিকা।' বাকারির কথায় অনিকাদেবী তার দিকে তাকালেন।

'অনেক পথ পাড়ি দিয়ে আমরা এখানে এসেছি। আজকের মধ্যে শ্বেতপুষ্পের গাছটিকে যদি আহরণ করতে পারি তাহলে আগামীকাল ভোরে আমরা যাত্রা শুরু করতে পারব মিশরের উদ্দেশে। ফারাও হাতসেপসুত চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন, যত দ্রুত সম্ভব তাঁর কাছে পৌঁছতে চাইছি আমরা।'

'আচ্ছা, তবে তাই হোক।' শান্ত স্বরে বললেন অনিকাদেবী। অগস্ত্য লক্ষ করল তাঁর স্মিত মুখে লেগে রয়েছে অল্প হাসি। সে হাসি মমতার। সে হাসি ভরসার।

২৪। শ্বেতপুষ্পের উদ্যান

সেশেনুর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পুন্ত শহরে আসার পথে তাদের কিছু ফলমূল দেওয়া হয়েছিল। তাই অগস্ত্যদের খিদে পায়নি আর। তারা চারজনে মিলে এবারে চলল ঋষভের সঙ্গে শ্বেতপুষ্পের কাননের দিকে। নগরীর মাঝের একটি প্রশস্ত পথ ধরে হাঁটতে লাগল তারা। চলার সময়ে অগস্ত্য উপলকে বলল, 'খানিক আগে এক বড় অদ্ভুত ঘটনা ঘটল বুঝলে।'

'কী ঘটনা?'

'ওই ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি সবার পিছনে ছিলাম। আমি যখন দরজা দিয়ে বেরোতে যাব তখন ওই বৃদ্ধা আমাকে আবার ভিতরে ডাকলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার এবং তোমার বন্ধুটির সঙ্গে আমার কথা হল না, কিন্তু তোমাদের মনের মধ্যে যদি কোনও সংশয়ের ভাব জন্মায় তবে কোনও কর্ম করার আগে আমার কাছে এসো, কথা বোলো আমার সঙ্গে। আমার ঘরের দ্বার তোমাদের জন্য সর্বদা খোলা।'

উপল অগস্ত্যর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো।

'এর কী অর্থ?'

'জানি না ভাই। কোন সংশয়ের কথা বলতে চাইলেন তিনি তা বুঝছি না। সংশয় তো একটি নয়, অনেকগুলি। চিন্তার জাল যেন মনের সবটুকুকে জড়িয়ে রেখেছে। আমি আমার স্ত্রী-এর বংশপরিচয় এতদিন জানতাম না, সে নিজেও তাতে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু সেও তো আমার অতীতকে আজও জানে না। স্বামী-স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে এক আত্মায় বাঁধা পড়ে এই সামাজিক চিন্তা যে ভুল, তা তুমি আর আমি দুজনেই জানি উপল। দুটি মানুষ যতই কাছাকাছি থাকুক না কেন, তাদের মধ্যে একটি অদৃশ্য আড়াল রয়েই যায়।'

'আমি জানি তুমি এটা ভেবে মনের মধ্যে পীড়া অনুভব করো যে ইরতেনসেনু তোমার সবটাকে চেনে না।'

'হুম, ঠিক। কিন্তু তার কি প্রয়োজন আছে? যে গোপনীয়তাকে আমরা নিজেদের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি তার তুল্য কি আর কিছু হয় আদৌ?'

উপল মাথা নামিয়ে বলল, 'না হয় না।'

অগস্ত্যর এই সময়ে কিছু একটা মনে হওয়াতে সে বলল, 'তুমি কি আমার থেকে কিছু একটা লুকাচ্ছ উপল?'

'না তো ভাই, কী লুকাব?'

'তা আমি জানি না, কিন্তু পুন্ত নগরীতে পৌঁছনোর পর থেকে তোমাকে আমি অন্যমনস্ক দেখছি। তোমার স্বভাবের আরেকটা দিকের কথা আমি জানি। তুমি যখন নিজের মনের মধ্যে দ্বিধায় পড়ো তখন চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলো না, মাথা নামিয়ে নাও। এখন তোমাকে তেমনই করতে দেখলাম।'

উপল এবারে মুখে হাসি টেনে এনে বলল, 'না না ভাই। সত্যিই তেমন কিছু নয়। আসলে আমার মনটিও অশান্ত হয়ে আছে। কীভাবে তোমাদের সঙ্গে এই অভিযানে জড়িয়ে পড়লাম তা ভাবতে গেলেও মনে হয় আমি যেন কোনও গল্প বা কোন অলীক স্বপ্নে বাস করছি। তার উপরে এই পুন্ত অধিবাসীর মুখে প্রাকৃত সদৃশ এমন ভাষা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।'

'ঠিক বলেছ, আমিও বেশ অবাক হয়েছি। ঋষভকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এর কারণ। ভারত ভূখণ্ডের সঙ্গে নিশ্চয়ই এর কোনও যোগাযোগ আছে।'

‘হুম, তাই হবে।’

কথা বলতে বলতে তারা নগরীর বাইরে চলে এল। পুন্তে সর্বমোট অধিবাসীর সংখ্যা একশতর কাছাকাছি, তাই জনপদটি খুবই ছোট। অরণ্যের মধ্যে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে তা বানানো। নগরীর বাইরে অরণ্যের মধ্য দিয়ে একটি অপ্রশস্ত পায়ে হাঁটা পথের উপর দিয়ে চলতে লাগল তারা। তাদের দু’পাশে বৃক্ষদল আবার ঘন হয়ে এসেছে। আকাশে সূর্য অস্ত গেছে কিছুক্ষণ হল, গোধূলির ম্লান আলো এই অরণ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

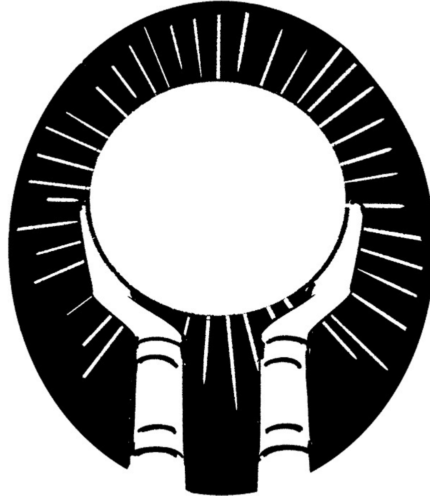
কিন্তু অগস্ত্যরা দেখল আঁধার নামার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এক নরম নীল আলোয় ভরে গেল অরণ্য। সেই সঙ্গে আকাশেও যেন এই নীল আলোর ছটা। এর উৎস কোথায় তা বোঝা যাচ্ছে না, তবে এখন নীল আলোতে চারপাশ বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে। তাদের কিছুটা দূর দিয়ে বয়ে চলেছে নীলনদ। নদী এখানে অনেকটা অপ্রশস্ত, কিন্তু তার স্রোত প্রবল, প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে যেন সে সমতলভূমিতে নেমে আসতে চায়। অগস্ত্য দেখল নীলনদের জলেও স্নিগ্ধ শুভ্র এক আলোক রশ্মি খেলা করছে, এই আলোর পথ ধরেই তো রাত্রের অন্ধকারে তারা আকাশে হাথোরেতকে ঠিক পথে চালনা করে আনতে পেরেছিল! পথ চলতে কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না। এই সময়ে বাকারি ঋষভের উদ্দেশে প্রশ্ন করল, ‘জঙ্গলের মধ্যে এত আলো কীভাবে আসছে।’

ঋষভ সামান্য হেসে জবাব দিল, ‘ধৈর্য ধরো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে।’

‘আর নদীর জলের ওই আলোর আভা? তার উৎস কী?’

‘সেশেনুর এই অরণ্য বড়ই অদ্ভুত বাকারি। এই অঞ্চলের নীলনদের জলে এক অতিসূক্ষ্ম ছত্রাক মিশে থাকে, অন্ধকারে তার শরীর থেকে এমন আলো বিচ্ছুরিত হয়।’

জঙ্গলের এই অংশ সমতল নয়। উঁচু-নীচু অজস্র টিলায় ভরা। তার মাঝের অমসৃণ রাস্তা ধরেই তারা এগিয়ে চলল। বোঝা যাচ্ছিল কিছুটা উপরের দিকে উঠে আসছে তারা। পাশে নীলনদের স্রোতের গর্জন ক্রমশই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। এক সময় তারা এসে পৌঁছল একটি পাহাড়ের পাদদেশে। অগস্ত্য দেখল পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে ধাপ বানানো আছে, বোঝা যায় এই পথে নিত্যদিন পাহাড়ের উপরে ওঠে পুন্তবাসী। ঋষভ বলল, ‘এই পাহাড়ের উপরিভাগে রয়েছে নীলনদের উৎস, সেখানেই শ্বেতপুষ্পের উদ্যান। এসো।’



ধাপগুলি সংকীর্ণ। একবারে একজন মানুষই একটি ধাপে দাঁড়াতে পারে। ধাপগুলিতে পা দিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল অগস্ত্যরা। বেশ কিছুটা উপরে ওঠার পর নীচের দিকে তাকাল ইরতেনসেনু। নীচে গভীর গিরিখাত। তাকালেই যেন মনে হয় দেহের ভারসাম্য টলে যাচ্ছে, অন্ধকার গিরিখাত যেন কোন এক অমোঘ

আকর্ষণে তাকে নিজের কাছে টেনে নিতে চাইছে। অগস্ত্য ইরতেনসেনুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'নীচের দিকে তাকিও না এখন। সামনে দৃষ্টি রেখে চলো। সাবধানে।'

সিঁড়ির শেষ ধাপটায় পা দিয়ে পাশের দিকে সরে দাঁড়াল ঋষভ। হাসি বলল, 'এসো, দেখো। এই হল নীলনদের উৎস! এই হল শ্বেতপুষ্পের উদ্যান!'

একে একে তারা চারজনে পাহাড়ের উপরে উঠে এসে ঋষভের পাশে এসে দাঁড়াল। তারা তাদের সামনে এখন যা দেখতে পাচ্ছে তাকে ভাষায় বর্ণনা করার সামর্থ্য হয়তো কারোরই ছিল না! এমন আশ্চর্য দৃশ্য স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। প্রথমেই তাদের মনে হল এক বিশাল সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা! বিপুল জলরাশির এক আধার তাদের সামনে। জলের মৃদু স্রোত বাতাসের টানে তাদের পায়ের কাছে এসে পড়ছে। ঠিক যেমনটা সমুদ্রের তীরে দেখা যায়। কিছুটা দূরে এই সমুদ্রের একটি অংশ সৃষ্টি করেছে এক জলপ্রবাহকে। এই জলধারাকে তারা দেখেছে তীব্রবেগে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসতে। এই তাহলে নীলনদ! তাহলে নদীর উৎস কোন বরফে ঢাকা পাহাড় নয়? এক সমুদ্র! কিন্তু অরণ্যের মাঝে পাহাড়ের বুকে এমন সমুদ্রের সৃষ্টি হবে কী করে!

ধীরে ধীরে তাদের ভ্রম ভাঙল। সমুদ্রের অপর প্রান্তকে তো সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে তারা দেখল এই জলাধার বিপুলা হলেও যেন দিগন্তে ঘন কালো জঙ্গলের রেখা দেখা যাচ্ছে। এটি তাহলে একটি হ্রদ, একটি অতিকায় হ্রদ! যা প্রকৃতির কোন খেয়ালে তৈরি হয়েছে পাহাড়ের কোলে। এই হ্রদের আকার এতই বড় যে প্রথম দর্শনে তাকে সমুদ্র বলে ভ্রম হয়। হ্রদের একটি প্রান্ত থেকে নীল আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখা যাচ্ছিল। বোঝা যায় ওই আলোই নীলনদের সেশেনুর অরণ্যকে আলোকিত করে রেখেছে।

তাদের নাকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। এই দৈত্যাকার হ্রদের বিহ্বলতা কাটিয়ে তারা এবারে তাকাল হ্রদের পাশের জমির দিকে। সেখানে সারি দিয়ে রয়েছে ছোট, মাঝারি বড় আকারের বৃক্ষরাজি। নীল আলোর মধ্যে বৃক্ষগুলির মাথা নীলাভ সাদা বর্ণের হয়ে রয়েছে। সেই দিকে আরও বেশ কিছুটা পথ হাঁটতে হল অগস্ত্যদের। কাছাকাছি আসতেই বুঝল এই বৃক্ষ তাদের চেনা, এই গন্ধ তারা আগেও পেয়েছে, ফারাও হাতসেপসুতের মন্দিরে! শ্বেতপুষ্প!

অসংখ্য শ্বেতপুষ্পের গাছ এখন তাদের সামনে। মৃদু হাওয়ায় তাদের ডালপালাগুলি দুলছে! তাহলে এক অসাধ্যকে সাধন করতে পেরেছে ইরতেনসেনুরা! যে চিন্তা কিছুদিন আগেও অলীক বলে মনে হয়েছিল তাকে সত্যি করতে পেরেছে তারা! শুধুমাত্র বুদ্ধি এবং সাহসের বলে। নিজের মুখেই অস্ফুটে ইরতেনসেনু বলে উঠল, 'হে দেবী হাথোর! আপনি পরম করুণাময়ী!'

শ্বেতপুষ্পের অগভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল তারা। পুষ্পের সেই অলৌকিক গন্ধ যেন কোন মন্ত্রবলে তাদের স্নায়ুকে শান্ত করে তুলছিল। প্রাণ ভরে শ্বাস নিচ্ছিল তারা সবাই। বাকারি সবার আগে চলছিল। তার মুখমণ্ডলে আনন্দের ছটা ফেটে পড়ছে। সে দ্রুত একটি ছোট শ্বেত পুষ্পের কিশলয়কে খুঁজে বার করল, একটি বড় বৃক্ষের পাদদেশে লালিত ছিল সেটি। তারপর চাইল ঋষভের দিকে।

ঋষভ হাসি মুখে মাথা সামান্য সামনের দিকে নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। এরপর উপল এবং বাকারি উবু হয়ে মাটির উপরে বসল। উপল একটি খুরপি নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। তাই দিয়ে অতি সন্তর্পণে শ্বেতপুষ্পের কিশলয়টিকে মাটি থেকে তুলে এনে বাকারির হাতে দিল। যেন সদ্যজাত সন্তানকে কোলে নিয়েছে, এমন ভাবে পরম যত্নে কিশলয়টিকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিল বাকারি। তারপর আনন্দোজ্জ্বল চোখে তাকাল ইরতেনসেনুর দিকে।

ইরতেনসেনুর চোখ তখন ছলছল করছে। আনন্দের অশ্রু তার গালগু বেয়ে নীচের দিকে নামছে। সে পেরেছে তার পিতার দেওয়া দায়িত্বকে পালন করতে! এই পুন্ত নগরী তাকে জন্ম দিয়েছে, কিন্তু তাকে লালন করেছে তো মরুভূমি, নীলনদের দেশ মিশর! সেই দেশ তার পালিকা মা, কিন্তু আপন সন্তানের স্নেহ

দিয়ে তাকে বড় করে তুলেছে। তার এই শরীর, মন, মস্তিষ্ক সব কিছু সেই দেশের দান, থীবস নগরের দান। আজ তার মনে হচ্ছে এর প্রতিদানে সেও কিছু করে উঠতে পারল।

আগামীকাল ভোরেই এই কিশলয়টিকে নিয়ে থীবসের উদ্দেশে যাত্রা করবে তারা। কিছুদিনের মধ্যেই আবার ফারাও হাতসেপসুতের মন্দিরের ফাঁকা স্থানে শোভা পাবে নতুন একটি শ্বেতপুষ্প বৃক্ষ। যে বা যারা ফারাওয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, যারা তার পিতাকে হত্যা করেছিল তাদের পরিচয় সে জানে না, জানে না সেই পরিচয় সে আদৌ কখনও পাবে কিনা। কিন্তু সে এখন জানে সেই চক্রান্ত যতই কুটিল হোক না কেন, তাকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছে চার অকুতোভয় নারী এবং পুরুষ। তার দেশ, তার পালিকা মাতা মিশরের বুকে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। অক্ষুণ্ণ থাকবে ফারাও হাতসেপসুতের সিংহাসন।



ইরতেনসেনু এবারে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অগস্ত্যর দিকে তাকাল। তাকিয়েই তার অন্যরকম লাগল। শ্বেতপুষ্পের বৃক্ষগুলিকে প্রথমবার দেখতে পাওয়ার পর অগস্ত্যর মুখেও উচ্ছ্বাসের চিহ্ন দেখেছিল সে। কিন্তু এখন সেই ভাব কোনও কারণে অন্তর্হিত হয়েছে। অগস্ত্য এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে শ্বেতপুষ্পের গাছটির দিকে, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি যেন দিগন্তে নিবদ্ধ। তার মুখমণ্ডলে যেন এক কষ্টের ছাপ।

‘কী হয়েছে অগস্ত্য?’

‘কই, কিছু না তো।’



অগস্ত্যর যেন সদ্য ঘুম ভাঙল। সে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে এবার বলল, ‘আমরা ভাগ্যবান ইরতেনসেনু! তাই আজ এই স্বর্গীয় উদ্যানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখনও মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছি। ফারাও তোমায় বুকে জড়িয়ে ধরবেন যখন আমরা এই কিশলয়টিকে নিয়ে থীবসে পৌঁছব।’

‘হ্যাঁ! চরম আনন্দের দিন আজ!’ উপল বলে উঠল।

বাকারি ঋষভকে বলল, ‘আপনাদের মহানুভবতার জন্য আজ মিশরের সিংহাসন পুনরায় সুরক্ষিত হল। এর প্রতিদানে আমাদেরও কিছু দিতে দিন। আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। আজ পুন্ত নগরীতে উৎসব হোক। রাত্রিবেলায় আসুন নগরীর সবাই একসঙ্গে আহার করি। আমি অতি উত্তম শূকরের মাংস রান্না করতে পারি! সকালে যে শূকরগুলি শিকার করেছিলেন সেগুলি রান্না করতে চাই আমি। তারপর এক মহাভোজ হবে।’

‘বাকারি সত্যিই ভীষণ ভালো শূকরের মাংস রান্না করে।’ বলল ইরতেনসেনু।

‘তবে তো খুবই ভালো! মিশরীয় ভোজ হোক তাহলে আজ রাত্রে! তাহলে তো এখনই আমাদের ফিরতে হয়।’

ঋষভকেও এই প্রস্তাবে উৎসাহিত দেখাল।

‘কিন্তু ওই আলোটা? ওই আলোর উৎস কী তা তো জানা হল না আর।’

কথাটি বলল অগস্ত্য। তার দিকে সবাই তাকাল এবারে। তার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হ্রদের অন্য পাড়ে, যেখানে নীল আলোটি তীব্রতম।

‘কীভাবে এই আলো উৎপন্ন হচ্ছে? তা কি জানা যাবে না?’

এবার ঋষভ সামান্য ইতস্তত করে বলল, ‘জানা যে যাবে না তা নয়। তবে আমি আশা করছিলাম যে তোমাদের কেউ এই প্রশ্নটি না করো। ওই আলোর উৎসটিকে রক্ষা করার জন্যই পুন্ত নগরী গত এক সহস্র বছর ধরে বাইরের জগতের থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে। তোমাদের আমি অবিশ্বাস করি না।

‘অনিকাদেবী এই নগরীর জ্যৈষ্ঠাতমা, তাঁর কথা আমরা সবাই মেনে চলি। তোমাদের এখানে নিয়ে আসার আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে যদি তোমরা ওই উৎসের সন্ধান করতে চাও তাহলে আমি যেন তোমাদের বাধা না দিই, সাহায্য করি। তবু মনের মধ্যে একটা দ্বিধা চলেই, আশা করি বুঝতে পারছ সেটি।’

‘হুম, তোমার চিন্তার কারণ আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি এবং ইরতেনসেনু বিজ্ঞানের সাধক। কোনও প্রকার অলৌকিকতায় আমরা বিশ্বাসী নই। তাই মনে হয়েছে ওই আলোর উৎসের পিছনে বিজ্ঞানই দায়ী কোনওভাবে। উপল আমার ভাইয়ের মতো, আমি নিজের চেয়েও তাকে বেশি বিশ্বাস করি। বাকারি তো ইরতেনসেনুর ভাই-ই। আমি তোমাকে কথা দিতে পারি, তোমাদের গোপনীয়তা আমরা কোনওভাবে লঙ্ঘন করব না। পুন্ত নগরীর কথা আমাদের চারজন ব্যতীত আর কেউ জানবে না। এই নগরী লোককথার মধ্যেই রয়ে যাবে যেমন গত ছয়শো বছর ধরে আছে।’

‘আচ্ছা চলো তবে। এই পথ পাড়ি দিতে সময় লাগবে বেশ অনেকটাই। হ্রদের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে ওই প্রান্তে পৌঁছতে হবে।’

‘তোমরা যাও, আমাকে এখনই নগরীতে ফিরতে হবে।’ বাকারি বলল।

‘এই শ্বেতপুষ্পের কিশলয়টিকে অতি যত্নে মিশরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমি নিয়েছি। কিশলয়টিকে মাটি থেকে তুলে আনলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে যদি এটিকে কোনও একটি পাত্রে প্রতিস্থাপন না করতে পারি তাহলে এর ক্ষতি হতে পারে। ওই আলো যা থেকেই তৈরি হোক না কেন তাতে আমার কোনও আগ্রহ নেই। তোমরা ঘুরে এসো। তোমাদের জন্য অতি উপাদেয় শূকরের মাংস প্রস্তুত থাকবে।’

বাকারির কথায় যুক্তি আছে। কিশলয়টিকে মাটিতে রোপন না করলে তা জল এবং খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে যেতে পারে। ঋষভ বলল, ‘কিন্তু তুমি যাবে কীভাবে? আমি তো এখন ইরতেনসেনুদের নিয়ে হ্রদের অন্য প্রান্তে গমন করব। তাহলে কী সবাই ফিরেই যাই নাকি? আগামীকাল তোমরা যাত্রা শুরুর আগে না হয় এই স্থানে নিয়ে আসব আবার।’

‘না না, তা হয় না। আগামীকাল সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা থীবসের উদ্দেশে রওনা দেব। এইখানে আসবার সুযোগ আর হবে না। তুমি ওদের নিয়ে ঘুরে এসো। আমি ঠিক পথ চিনে চলে যাব। আসার সময়

খেয়াল করেছি, জঙ্গলের মধ্যে একটিই তো পথ। আর এই আলোয় সেই পথ চিনে ফিরতে খুব অসুবিধা হবে না।’



বাকারি কিশলয়টিকে কোলে নিয়ে সন্তর্পনে পাহাড়ের গায়ের সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। সে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার পর অগস্ত্যরা ঋষভের পিছু পিছু হ্রদের ধার ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করল। সবার আগে হাঁটছিল ঋষভ, তার পিছনে উপল, তার পিছনে অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু। হাঁটতে হাঁটতে ঋষভ এই সেশেনুর জঙ্গলের গতিপ্রকৃতির বর্ণনা দিচ্ছিল তাদের। এই অরণ্যের মধ্যে এত বছর ধরে বাস করতে করতে কীভাবে পুন্তবাসীরা সেশেনুর বনানীকে নিজের হাতের তালুর মতো চিনে নিয়েছে তা বলছিল ঋষভ। তার মুখে অরণ্যের বিভিন্ন হিংস্র জীবের কথাও শুনছিল তারা। একসময় উপল বলল, ‘তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঋষভ। কামারু নামের কোনো জীবের কথা শুনেছ তুমি?’

ঋষভ পিছন ফিরে উপলের দিকে চাইল। তারপর ঈষৎ হেসে বলল, ‘হ্যাঁ শুনেছি বইকি, তবে তাকে চোখে কখনও দেখিনি।’

‘কেন? লোককথায় যে আছে পুন্তের নগরীতে কামারু নামের এক অদ্ভুত দর্শন জন্তু রয়েছে। মেন্তুহোতেপের প্রহেলিকাতেও তার উল্লেখ আছে।’

‘হ্যাঁ ঠিক। আমি এও শুনেছি যে নুবিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন এই কামারু মেন্তুহোতেপকে যুদ্ধে জিততে সাহায্য করেছিল। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো? কামারু লোককথারই একটি অংশ, আদতে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। এই জনপদের কেউই কোনওদিন সেই ভয়াল দর্শন জীবকে দেখেনি। এমনকী অনিকাদেবীও দেখেননি। কিন্তু পুন্তের মানুষ বিশ্বাস করে কামারু আছে, সে ঘুমিয়ে আছে এই হ্রদের নীচে। এমনও হতে পারে যে এই অরণ্যে সত্যিই হয়তো এমন জীব ছিল কোনও এককালে, যার দর্শন পেয়েছিলেন ফারাও মেন্তুহোতেপ। এই সেশেনুর জঙ্গল সত্যিই অদ্ভুত, এই শ্বেতপুষ্পের গাছও তো এই অরণ্য ব্যতীত পৃথিবীর আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।’

‘ঠিক, নদীর জলের ওই আলো বিচ্ছুরণকারী ছত্রাকও তো আর অন্য কোথাও দেখতে পাইনি আমি।’ বলল উপল।

‘তবে ছ’শো বছর ধরে কোনও জীবের পক্ষে বেঁচে থাকার কথা নয়। আমার ধারণা কামারু নামের জীবটি এই অরণ্যে কোনও সময়ে থাকলেও তা কালের নিয়মে মারা গেছে। হয়তো এই হ্রদের গভীরেই সেই জীবের অস্থি রয়েছে।’

অগস্ত্য চুপ করে তাদের কথা শুনছিল। কামারুর ব্যাপারে তার কোন প্রকার আগ্রহ নেই। এই জীবটির নাম শুনে এবং মেন্তুহোতেপের মন্দির গাত্রে এর ছবি দেখার পরে অগস্ত্যর দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে কামারুর আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। জীবটি একেবারেই মানুষের কল্পনাপ্রসূত, যা এক লোকগাথাকে যুগের পর যুগ ধরে জীবন্ত রাখতে সাহায্য করেছে। তার মনের মধ্যে এখন এক অদ্ভুত ভাব বিরাজ করছিল।

আজকের দিনটি যেন তার জীবনের অন্য সবক’টি দিনের থেকে আলাদা। প্রথমে হাথোরেতের অরণ্যের মধ্যে ভেঙে পড়া, তারপর পুন্ত নগরীর সন্ধান পাওয়া, তারপর জানা যে তার স্ত্রী মিশরীয় নন, এই নগরীতেই তার জন্ম হয়েছিল। সর্বশেষে অনিকাদেবী, ওই বৃদ্ধার কথাগুলি এখনও তার কানে ভাসছে। তার

মনের কোন সংশয়ের নিরসনের জন্য অনিকাদেবী অপেক্ষা করে আছেন? কেন তিনি বললেন কোন কর্ম করার কথা ভাবলে তা সমাধা করার আগে যেন তার সঙ্গে দেখা করে অগস্ত্য? কেন তিনি ঋষভকে আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন যে ওই রহস্যময় আলোর উৎস, যা পুন্ত নগরী সহস্র বছর ধরে গোপন করে রেখেছে, সেই আলোর উৎসের সন্ধান অগস্ত্যর কাছে উন্মোচিত করতে? কেন? কী আছে সেইখানে?

এক অজানা আশঙ্কা অগস্ত্যর বুকে দানা বাঁধতে লাগল। তার মনটিও ভালো নেই। যে বৃক্ষের নীচের কিশলয়টিকে বাকারি এবং উপল সংগ্রহ করল সেই বৃক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে অগস্ত্যর বুক সহসাই কেঁপে উঠেছিল। থীবসের সেই রাত্রে, হাথোরেতে যাত্রা শুরুর আগের রাত্রে স্বপ্নে অগস্ত্য এই বৃক্ষটিকেই দেখেছিল? কীভাবে? অবিকল এই বৃক্ষটিই! এই বৃক্ষের নীচেই অগস্ত্য দেখেছিল রক্তের দাগ! দেখেছিল কারো এক মৃতদেহ, যার মুখ সে দেখতে পায়নি, কে সে!

অগস্ত্যর বারবার মনে হচ্ছিল সে এক বড় প্রহেলিকার মধ্যে বাস করছে। কিন্তু প্রহেলিকাটি যে কি তাই সে বুঝতে পারছে না, শুধু তার মনে হচ্ছে আজকের দিনটি এতটাই অন্যরকম! কোনওভাবে দিনটি কেটে গেলে সে যেন মনের মধ্যে শান্তির ভাব অনুভব করবে। কিন্তু কেন এমনটা তার মনে হচ্ছে তা সে জানে না। ইরতেনসেনুকেও সে এই ব্যাপারে কিছু বলতে চায়নি। দীর্ঘদিনের ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, বিনিদ্র রাত্রি যাপনের পর আজ ইরতেনসেনুর মন অবশেষে শান্ত হয়েছে। তার হৃদয় এখন ভরে উঠেছে পরম আনন্দে। সেই আনন্দকে অগস্ত্য নষ্ট করতে চায় না নিজের অলীক চিন্তার কথা বলে। সে চুপচাপ হাঁটতে লাগল বাকিদের সঙ্গে।

২৫। সত্য-অসত্য

বেশ কিছুটা হেঁটে আসার পর একসময় ঋষভ থামল। তারা এখন এসে দাঁড়িয়েছে একটি অনুচ্চ টিলার সামনে। গাছগাছালির মধ্যে থাকার জন্য টিলাটিকে দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়নি। অগস্ত্য দেখল টিলার মাঝের অংশটি ফাঁপা, এর ফলে টিলার মধ্যে একটি গুহার সৃষ্টি হয়েছে। গুহামুখের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। ভিতর থেকে সেই উজ্জ্বল নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হ্রদের জল একটি সরু প্রাকৃতিক নালার মধ্য দিয়ে এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে। ঋষভ বলল, 'এই হল পুন্ত শহরের আরাধ্যা দেবীর মন্দির। মন্দিরে প্রবেশের আগে আপনারা আপনাদের মুখ ও হাত-পা এই হ্রদের জলে ধুয়ে নিন।'

ঋষভের দেখাদেখি হ্রদের শীতল জলে হাত-মুখ প্রক্ষালিত করে নিল তারা তিনজন। ঋষভ এবার গুহামুখের সামনে হাঁটু মুড়ে বসল, বসে নিজের ডান হাত বুকের বাম পাশে নিয়ে এসে চোখ বন্ধ করে মৃদু স্বরে এক মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। মন্ত্রের শব্দগুলি ওদের কারোরই কানে পৌঁছচ্ছিল না। কিন্তু এই সময়ে ইরতেনসেনুর নজর এড়িয়ে অগস্ত্য আর উপল দুজনের মধ্যেই দৃষ্টি বিনিময় হল। ওদের দুজনের চোখেই বিস্ময়! ঋষভ যেভাবে বুকে হাত দিয়ে দেবীর আরাধনা করছে তা তাদের খুব পরিচিত! এ কী ভাবে সম্ভব! অগস্ত্য আর উপল দুজনেরই মুখ থমথমে হয়ে গেল। ঋষভ উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন, এবারে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি।'

গুহার মুখটি খুব একটা প্রশস্ত না হলেও দু'জন মানুষ পাশাপাশি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারে। তাদের পায়ের পাশ দিয়ে অগভীর নালার মধ্য দিয়ে হ্রদের জল বয়ে চলেছিল। তারা দেখল সেই জলে শুভ্র আলোর আভা যেন আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই আলোয় এবং মন্দির গুহার ভিতর থেকে আসা আলোয় গুহার দেওয়াল পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল। সেখানে পাথরে লাল, সাদা, হলুদ এবং নীল রঙ দিয়ে বেশি কিছু চিত্র তৈরি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আছে পুন্তের জনজীবনের ছবি, শ্বেতপুষ্পের ছবি, এই হ্রদ থেকে জন্ম নেওয়া নীলনদের ছবি। পাশাপাশি রাখা কয়েকটি ছবির দিকে আঙুল নির্দেশ করে ঋষভ বলল, 'এই দেখুন। এগুলি ফারাও মেন্তুহোতেপের চিত্র।'

ইরতেনসেনুরা দেখল সেই চিত্রগুলি অনেকটাই মেন্তুহোতেপের মন্দিরের দেওয়াল-চিত্রের মতো। তাতে বর্ণিত হয়েছে নুবিয়দের সঙ্গে মেন্তুহোতেপের যুদ্ধ, তার এই নগরীতে আসার গল্প। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে পুন্তের এক নাগরিকের হাত থেকে মেন্তুহোতেপ দুটি কিশলয় গ্রহণ করছেন। বোঝা যায় সে দুটি শ্বেতপুষ্পেরই। আশ্চর্য জন্তু কামারুর চিত্রও আছে সেখানে। হলুদ রঙের শরীরে কালো রঙের ছোপ, চিতাবাঘের মতো। কাঁধের কাছ থেকে শুরু হয়েছে ময়াল সাপের দেহ। সাপটির মুখ হাঁ হয়ে আছে, মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি লিকলিকে জিহ্বা, জিহ্বার সামনের অংশটি চেরা। এই নীল আলোতে দানবটিকে যেন জীবন্ত লাগছিল। কামারুর চোখের উপরে কোনও রত্ন নিশ্চয়ই বসানো ছিল, তাই সেই চোখ জ্বলজ্বল করছিল আলোতে, যেন সে এই গুহামন্দিরের অতন্দ্র প্রহরী।

গুহার ভিতরের পথটি কিছুটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটি মাঝারি আকৃতির ঘরে। সেখানে এসে দাঁড়াল তারা চারজন। ঋষভ সামনের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'ইনি হলেন পুন্তের আরাধ্যা দেবী সিন্ধু। আর এই হল আলোর প্রকৃত উৎস।'

এই ঘরটি অনেকটা বৃত্তাকার। প্রকৃতির খেয়ালেই টিলার মধ্যে এই গর্ভগৃহের সৃষ্টি হয়েছে। ঘরের পাথরের মেঝের মাঝখানে একটি বর্তুলাকার ফাঁকা যায়গা, গুহার মুখ থেকে যে নালা দিয়ে হ্রদের জল গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছিল তা এই প্রশস্ত গর্তে এসে শেষ হয়েছে। ঘরের যে অংশের দিকে ঋষভ নির্দেশ

করছিল সেখানে মাটির উপর থেকে ছয়টি ধাপে পাথুরে সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে। সিঁড়িগুলি শেষ হয়েছে একটা পাথরের তৈরি চাতালে। সেখানে শ্বেতপ্রস্তরের সিংহাসনে বসে আছেন এক মাতৃমূর্তি। মূর্তিটি কালো পাথরে নির্মিত, উচ্চতায় দু'হস্তের সমান।

সিংহাসনে আসীন এই দেবী পৃথুলা। তাঁর মুখমণ্ডল গোলাকার, বড় বড় আয়ত চোখ, টিকালো নাক, পুরুষ্টু ঠোঁট। সেই ওষ্ঠে যেন স্মিত হাসি লেগে রয়েছে। দেবীর হাত এবং পাগুলি সরু নয়, তাতে মেদের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। দেবীর দুই স্তন স্ফীত এবং নিচের দিকে নেমে আছে, যেন মাতৃদুগ্ধে ভরে রয়েছে তা। দেবীর উদর দেশও স্ফীত, যদিও তার মাঝখানে একটি গোলাকার ফাঁকা অংশ আছে। তার ভিতরে বসানো আছে একটি আশ্চর্য রত্নকে!

রত্নটি আকারে ডিম্বাকৃতি, ইরতেনসেনুর হাতের তালুর মতো তার আয়তন। রত্নটি থেকে উজ্জ্বল নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই আলোর দিকে একটানা কয়েক পলের বেশি তাকিয়ে থাকা যায় না। এই আলোই এতক্ষণ ধরে তারা দেখতে পাচ্ছিল। ঘরের দেওয়ালগুলির উপরের অংশে অনেকগুলি গবাক্ষ। বোঝা যায় এই গবাক্ষ আর ওই গুহামুখ দিয়ে এই আলো বাইরে বেরিয়ে আসে, ছড়িয়ে পড়ে সেশেনুর অরণ্যে। ইরতেনসেনু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল এই আশ্চর্য দেবী মূর্তির দিকে। গর্ভে এই অমূল্য রত্নকে ধারণ করে না জানি কত বছর ধরে এই সিন্ধুদেবী সেশেনুর এই অরণ্যের মধ্যে আসীন হয়ে আছেন। এই সেই সম্পদ যাকে রক্ষা করার জন্য পুন্তের নাগরিকরা বাইরের বিশ্ব থেকে নিজেদের গোপন করে রেখেছে।

আচমকাই ধপ করে একটা আওয়াজ হল ইরতেনসেনুর পিছনে। সে পিছনে ঘুরে দেখল অগস্ত্য মন্দিরে মাটিতে বসে পড়েছে, উপল নীচু হয়ে তাকে তোলার চেষ্টা করছিল। ইরতেনসেনু উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কী হল অগস্ত্য? তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

যেন বহু বছর ঘুমোয়নি অগস্ত্য, এমন ক্লান্তির ছাপ তার চোখে মুখে। সে মুখে হাসি টেনে এনে বলল, 'ক্ষণিকের জন্য ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি ঠিক আছি, তুমি চিন্তা কোরো না। একটু ক্ষণ বসে থাকলেই ভালো বোধ করব।'

এই বলে গুহার ভিতরের দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসল অগস্ত্য। ইরতেনসেনু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতে সঙ্গে করে নিয়ে আসা পশুচামড়ার একটি থলি দিল, তা থেকে জল পান করল সে। কিছুটা জল হাতের মধ্যে নিয়ে ইরতেনসেনু অগস্ত্যর চোখে মুখে দিল। অগস্ত্য বলল, 'এবার ভালো লাগছে একটু। আমি এখানে বিশ্রাম নিই। তুমি মন্দিরটি দর্শন করে নাও। তারপর ফিরব আমরা।'

অগস্ত্যর কথায় আশ্বস্ত হয়ে ইরতেনসেনু সিন্ধুদেবীর মূর্তিটিকে আবার চারপাশ থেকে ঘুরে দেখতে লাগল। উপল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার অতিক্রম করছিল। ঋষভ বলল, 'মাফ করবেন। ওই সিঁড়িতে ওঠার অধিকার একমাত্র পুন্তের সবচেয়ে প্রবীন মানুষটির থাকে। বর্তমানে অনিকাদেবী ছাড়া আর কারোরই ওই সিঁড়িতে ওঠার অনুমতি নেই। তাঁকে আমরা প্রতি মাসে একবার করে মন্দিরে নিয়ে আসি। তিনি তখন হ্রদের জল দিয়ে সিন্ধুদেবীর মূর্তির প্রক্ষালন করেন, শ্বেতপুষ্প দিয়ে দেবীর আরাধানা হয় তখন।'

বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উপল সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করে, বলল, 'ওহো, ভীষণ দুঃখিত। আমি আসলে রত্নটিকে আরও একটু কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করছিলাম।'

ইরতেনসেনু সিংহাসনটিকে একটু পাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করছিল, সে এবারে বলল, 'দেবীর নাম সিন্ধু? কিন্তু আমি জানতাম সিন্ধু ছিল...'

'ভারত ভূখণ্ডের এক প্রাচীন জনপদের নাম। সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল সেই সভ্যতা।' বলল ঋষভ।

'হ্যাঁ তাই তো!'

'সিন্ধুদেবীর এই মূর্তিটি সেই নদীর উৎসে অধিষ্ঠান করত দু'হাজার বছর আগে।'

ঋষভের এই কথায় ইরতেনসেনু অবাক হয়ে গেল! পুন্তের অধিবাসীদের কথ্য ভাষায় প্রাকৃতের ব্যবহারের কারণ এবার সে বুঝতে পারছে। ইরতেনসেনু বলল, 'তাহলে আপনারা সেই প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক!'

ঋষভ সামান্য হেসে বলল, 'শুধু আমি নই, তুমিও ইরতেনসেনু। তোমার রক্তেও সিন্ধুর ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভারত ভূখন্ডে বাস করতেন। কিন্তু সেখান থেকে চলে আসতে হয় আমাদের, এই অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী রত্নটিকে রক্ষা করার জন্য।'

'কেন? কী ঘটেছিল সেখানে?'

'একদল হীনমনস্ক তস্করের জন্য সেই সভ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখান থেকে রত্নটির উপরিভাগকে ভালো ভাবে নজর করে দেখ। কিছু বুঝতে পারছ?'

ঋষভের কথা শুনে ইরতেনসেনু আবার মন দিয়ে রত্নটি নিরীক্ষণ করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'রত্নটি ডিম্বাকৃতি, কিন্তু এর গা একেবারে মসৃণ নয়! উপরের কিছুটা অংশ যেন ভাঙা!'

'হুম, ঠিক। ওই অংশটিকে ভেঙে নিয়ে যায় কিছু অবমানবের দল। সৌমিরদের নাম শুনেছ তুমি?'

সৌমিরদের নাম শোনেনি এমন মানুষ মনে হয় কমই আছে। ভারতবর্ষ থেকে তাদের কুখ্যাতি মিশরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জনজাতি তারা। যে ভূমিকম্পের জন্য সরস্বতী নদী নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য নাকি সৌমিররাই দায়ী। ইরতেনসেনু আগ্রহ ভরে ঋষভের কথা শুনছিল। সে শুধু মাথা নাড়িয়ে নিঃশব্দে জানাল যে সৌমিরদের নাম তার কাছে অজ্ঞাত নয়।

ঋষভ বলে চলল, 'সৌমিররা সমৃদ্ধশালী সিন্ধু সভ্যতার নষ্টের মূল কারণ। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল তা বাইরের পৃথিবীতে কেউ জানে না। সৌমিররা এখন পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে। আর আমরাও কখনও সেই ঘটনাটিকে নিয়ে মুখ খুলিনি। এই রত্নকে রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য ছিল।'

'কী এমন ঘটিয়েছিল সৌমিররা?'

এই প্রশ্নে ঋষভের মুখে যেন কালো ছায়া নেমে এল, তারপর ধীরে ধীরে তা বদলে গেল ঘৃণায় এবং রাগে। সে বলল, 'রাত গভীর হচ্ছে, এই মন্দিরে আর বেশিক্ষণ থাকলে সিন্ধুদেবীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে, চলো আমরা এবার ফিরি। যাত্রাপথে তোমাদের সব বলব।'

গুহামন্দির থেকে বেরিয়ে এসে আবার তারা হ্রদের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ঋষভ তাদের বলতে লাগল সেই অন্ধকারতম দিনের কথা, 'সরস্বতী নদীর তীরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল সিন্ধু সভ্যতা। সেই সভ্যতার প্রাণ ছিল সেই নদী। এবং সেই নদী বইত সিন্ধুদেবীর আশীর্বাদে। নদীর উৎসস্থলে ছিল দেবীর মন্দির, তখন থেকেই তার গর্ভে ছিল এই রত্নটি। এই রত্নের অলৌকিক ক্ষমতার বলে সরস্বতী নদীর জল কোনদিন শুকিয়ে যেত না। তার দু'পাশ উর্বর হয়ে উঠেছিল। সিন্ধু রাজ্য হয়ে উঠেছিল এই পৃথিবীর অন্যতম বিত্তশালী এক জনপদ। তখন সিন্ধুর উপকূল থেকে অন্যান্য দেশগুলিতে বাণিজ্যও চলত। মিশরে এসে পৌঁছত সিন্ধু রাজ্যের নৌকা।

'এই সরস্বতী নদীর পশ্চিম দিকে ছিল আরও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট জনজাতির বাস, তাদের নাম ছিল সৌমির। সৌমিররাও এই নদী মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছিল। তাদের খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান কোন কিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু সৌমিররা এতে সন্তুষ্ট হয়নি কখনও। তারা সিন্ধুরাজ্যের সমৃদ্ধিকে হিংসা করত। বাণিজ্যের ফলে সিন্ধুর প্রতিপত্তি বাড়ে, কিন্তু সৌমিরদের অঞ্চলে নদীর যে শাখাটি প্রবাহিত হতো তা খুব একটা প্রশস্ত ছিল না, বাণিজ্য তরী ভাসানো যেত না তাতে।

'সৌমিররা জানত যে নদীর জলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এই রত্নটি। তাই তারা এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে বসে। একদিন রাত্রে সিন্ধুদেবীর মন্দিরে হানা দেয় সৌমিররা। তারা রত্নটিকে চুরি করার চেষ্টা করে। কিন্তু

মন্দিরে নিযুক্ত সেনাদল তাদের প্রতিহত করে। তখন তারা প্রবল আক্রোশে রত্নটিকে মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলে নষ্ট করে দিতে চায়। রত্নটি মাটিতে পড়লে তার উপরের ছোট একটি অংশ ভেঙে যায়।

'সেই অংশটিকে নিয়ে পালায় সৌমির তস্করের দল। কিন্তু এই ঘটনায় সিন্ধুদেবী রুষ্ট হন। তার প্রকোপে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। সরস্বতী নদী হারিয়ে যায় ভূগর্ভে। শুকিয়ে যাওয়া নদীর পাড়ে সিন্ধু সভ্যতাকে আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বহু মানুষ এরপর খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারায়, বহু মানুষ ভাগ্যান্বেষণে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। তাদের মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষরাও ছিলেন।'

ইরতেনসেনু ভাবছিল, মানুষের লোভ তাকে কত নীচে নিয়ে যেতে পারে। একটি ভরভরন্ত সভ্যতা নষ্ট হয়ে গেল কিছু মানুষের নীচতার কারণে। ঋষভ বলে যেতে লাগল, 'সিন্ধুদেবীর মন্দিরের কার্যে নিযুক্ত পুরোহিত, সৈন্যদল, পরিচারকেরা তাদের পরিবারকে নিয়ে এক সঙ্গে ভারত ভূখণ্ড ত্যাগ করে। তারা সঙ্গে করে নিয়ে আসে এই দেবী মূর্তি এবং রত্নটিকে। পুন্তের লোককথায় কথিত আছে, বহু দেশ ঘুরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা একসময় উপস্থিত হন এই মিশর দেশে।

দেশের দক্ষিণে সেশেনুর গভীর জঙ্গলের মধ্যে তারা স্থাপন করেন পুন্ত নগরীর। কয়েক হাজার বছর আগে তারা পাহাড়ের উপরে এই গুহার খোঁজ পান। যেন প্রকৃতি বহুবছর আগে এই আশ্রয়ের সৃষ্টি করে রেখে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলেন এই দেবীমূর্তির জন্য। এই গুহায় তৈরি হয় সিন্ধুদেবীর নতুন মন্দির, সেই থেকে এই মন্দিরেই অধিষ্ঠিতা দেবী। তাঁর আশীর্বাদে এবং এই রত্নের ক্ষমতায় গুহার বাইরে অবস্থিত হ্রদের জল নাকি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

নীলনদ না জানি কত হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ডের উপর দিয়ে বইত। কিন্তু এই রত্নের প্রভাবে নদীর জল বাড়ে, তা গভীর এবং প্রশস্ত হয়। তার সুফল লাভ করে মিশরীয় সভ্যতা। নদীর তীরের ছোট ছোট জনপদগুলি এক হতে শুরু করে। যে ফারাওরা আগে কেবল মাত্র উত্তর মিশরের একটি ছোট গোষ্ঠির নেতা ছিল তাঁরা ক্রমে হয়ে ওঠেন সমগ্র মিশরের অধিপতি। বর্তমানের মিশরীয় সভ্যতা এই নীলনদের দান। আর এই নীলনদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে এই রত্ন।

এই নদী এখন সিন্ধুদেবীর সন্তান। এই রত্নকে রক্ষা করার জন্য আমরা হাজার হাজার বছর ধরে এই অরণ্যের মধ্যে বাস করছি। একবার একটি ভুলের জন্য একটি সভ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই ভুল আমরা আর হতে দেব না। এই রত্নকে রক্ষা করতে পুন্তের প্রতিটি নাগরিক দায়বদ্ধ।

'আমুন-রা!'

হঠাৎই বলে উঠল অগস্ত্য। এতক্ষণ চুপ ছিল সে।

'...কামারু রক্ষা করে আমুন-রাকে!'

মেন্তুহোতেপের প্রহেলিকার সেই আমুন-রা তাহলে এই রত্ন! যার আলোয় পুন্ত নগরী আলোকিত হয়। যার আশীর্বাদে নীলনদে জল প্রবাহিত হয়।

'হ্যাঁ, ফারাও মেন্তুহোতেপ এই রত্নের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন মিশরের সূর্যদেব আমুন-রাকে।'

'কিন্তু কামারু রক্ষা করে...এই অংশটার অর্থ কী? এই কামারুও কি তাহলে এই রত্নের সৃষ্টি?'

'না। সেশেনুর এই আশ্চর্য অরণ্যের বয়স পুন্তের জনজাতির থেকেও বেশি। পুন্তের লোককথায় কামারুর উল্লেখ বারবার আসে। এই জন্তুটির সঙ্গে কোনওভাবে পুন্তের নাগরিকদের সখ্যতা হয়েছিল। সে তাদের কোনও ক্ষতি করেনি। তারপর কোনও একসময়ে সে হারিয়ে যায়। তবে পুন্তের অধিবাসীরা আজও বিশ্বাস করে যে এই রত্নটিকে রক্ষা করছে কামারু নামের সেই দানব। সে এই হ্রদের নীচে ঘুমিয়ে আছে শত শত বছর ধরে।'

হ্রদের বুকের উপর দিয়ে শীতল হাওয়া বয়ে এসে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল ইরতেনসেনুর শরীরে। সে একবার হ্রদের দিকে তাকাল। শান্ত জল হ্রদের, তার উপরে খেলা করছে অসংখ্য অত্যাশ্চর্য শুভ্র আলোক বিন্দু। ইরতেনসেনু বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, সে বুঝতে পেরেছে খানিক আগে মন্দিরে দেখা রত্নটির কোনও ক্ষমতা

নিশ্চয়ই আছে যাকে হয়তো বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে তা তার বোধের বাইরে। এই হ্রদের গভীরে এক অতিকায় দানব ঘুমিয়ে রয়েছে এই কথাও বিশ্বাস করতে তার মন চায় না। কিন্তু এই আলো-আঁধারি যেন এক রহস্যময়তার সৃষ্টি করেছে হ্রদটিকে ঘিরে।

'আর সেই হারিয়ে যাওয়া রত্ন খণ্ডটির কী হল?' জানতে চাইল ইরতেনসেনু।

'সেটিকে আর পাওয়া যায়নি। সিন্ধুদেবীর অভিশাপে নাকি সৌমিরদের সমগ্র জনজাতির মৃত্যু হয়। তাদের সঙ্গেই ওই রত্নখণ্ডটিও হারিয়ে গিয়েছে। গর্ভরত্নটি খণ্ডিত হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে তার শক্তিকে হারাচ্ছে। গত কয়েকশো বছরে এর ঔজ্জ্বল্য কিছু হলেও কমেছে। হ্রদে এখনও অফুরন্ত জল থাকলেও এভাবে রত্নের শক্তি যদি হ্রাস পেতে থাকে তাহলে একসময় নীলনদও শুকিয়ে যাবে। অদৃষ্টেই হয়তো এমনটা লেখা আছে। হারিয়ে যাওয়া রত্নখণ্ডটিকে তো আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়!'

'তাহলে মিশরীয় সভ্যতার কী হবে!'

'নদী ব্যতীত যে সভ্যতা বাঁচে না তা তো তুমি বুঝতেই পারছ ইরতেনসেনু। আমরা জানি না সেই দিন কবে আসবে, হয়তো আরও কয়েকশো বছর পর, হয়তো বা এক সহস্র বছর পর। কিন্তু এই রত্ন এভাবে শক্তি হারাতে হারাতে একদিন নষ্ট হয়েই যাবে, এটা অবশ্যম্ভাবী।'

ঋষভের এই কথার পর অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা নেমে এল বাকিদের মধ্যেও। বাকি পথে কেউ আর কোন কথা বলল না। মন্দির থেকে বেরোবার পর থেকে উপলও অদ্ভুত ভাবে চুপ করে আছে, যা একেবারেই তার স্বভাববিরুদ্ধ। নগরীতে পৌঁছে তারা দেখল ছোট জনপদটি উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে। নগরীর মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গায় শুকনো কাঠ এবং পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তার চারদিকে ভিড় করে রয়েছে এই জনপদের সকল অধিবাসীরা। নারী, পুরুষ, বয়স্ক, শিশু কেউই বাকি নেই। তারা কেউ নিজেদের মধ্যে জটলা বেঁধে গল্প করছে, কেউ বা হাত ধরাধরি করে বাজনার তালে তালে নাচছে।

কয়েকজনকে দেখা গেল আগুনের কুণ্ডের চারপাশ পরিষ্কার করে নরম কাপড়ের আসন বিছাতে। ওখানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে মহাভোজ। পুন্তের জনপদের সবাই একসঙ্গে নৈশাহার করবে আজ। অগ্নিকুণ্ডের কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে বাকারিকে। সে রান্নার তদারকি করছে। অগস্ত্যরা এগিয়ে গেল তার দিকে। উজ্জ্বল মুখে বাকারি বলল, 'ও তোমরা এসে গেছ? কিশলয়টিকে আমি একটি মাটির পাত্রে রোপণ করেছি। এদিকে রান্নাও প্রায় হয়ে এসেছে। তোমরা আহার করে নাও একটু পরেই।'

কেউ কিছু বলার আগেই অগস্ত্য বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে এখন আমার শরীরটা ঠিক ভালো লাগছে না। সামান্য বিশ্রাম করি, তারপর আসছি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে। ইরতেনসেনু আর উপল, তোমরাও আমার সঙ্গে এসো। আগামীকাল যাত্রার আগে কিছু গোছগাছ করে নেওয়ার আছে। তারপর আমরা না হয় একসঙ্গে ভোজন করব।'

অগস্ত্য উপল এবং ইরতেনসেনুকে নিয়ে এল তাদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে। ঋষভ থেকে গেল বাকারিকে সাহায্য করার জন্য। কক্ষের দরজা ভিতর থেকে লাগিয়ে দিয়েই গম্ভীর গলায় অগস্ত্য বলল, 'তোমাকে আমার কিছু জানানোর আছে ইরতেনসেনু। উপল তুমিও এখানে থাকো, তোমাকেও কিছু বলার আছে আমার।'

'হুম, জানি।'

এই বলে গম্ভীর মুখে উপল একটি চৌপায়ার উপরে বসল। ইরতেনসেনু অগস্ত্যর কণ্ঠের গাম্ভীর্যকে হয়তো অতটা গুরুত্ব দেয়নি। সে তার ক্লান্ত শরীর শয্যায় এলিয়ে দিয়েছিল। চোখ বোঁজা অবস্থাতেই সে বলল, 'হ্যাঁ বলো। রাতের আহারের পরই তো বলতে পারতে।'

'না, আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এখনই বলতে হবে। তুমি একটু উঠে বসবে?'

অগস্ত্যর কথায় এবারে ইরতেনসেনু শয্যায় উঠে বসল। তার চোখে কৌতূহল। অগস্ত্য ইরতেনসেনুর সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। ইরতেনসেনু দেখল অগস্ত্যর মুখে যেন গ্লানির ছাপ স্পষ্ট। সিন্ধুদেবীর মন্দির থেকেই

সে এটি লক্ষ করেছে।

'কী হয়েছে অগস্ত্য?'

অগস্ত্য ইরতেনসেনুর হাতদুটিকে নিজের দু'হাতের মধ্যে ধরল। তারপর ধীর স্বরে বলল, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে ইরতেনসেনু? যদি জানো এক বিরাট সত্যিকে আমি তোমার থেকে লুকিয়েছি?'

'কোন সত্যি?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি ইরতেনসেনু। প্রাণের থেকেও প্রিয় তুমি। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। কিন্তু...তবু...'

'কিন্তু কী?'

'কিন্তু আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যিটিকে আমি গোপন করেছি তোমার থেকে। শুধু তুমি নও। এই পৃথিবীতে উপল ছাড়া আর কেউই জানে না সত্যিটিকে। কিন্তু আজ এখন তাকে তোমার সামনে আনতেই হবে। এই দিনটির জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার অদৃষ্ট আমাকে আজকে এই চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, কোন প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই।'

উপল এই সময় চৌপায়া থেকে উঠে অগস্ত্যর পিছনে এসে দাঁড়াল। অগস্ত্য উপলের মুখের দিকে চাইল। ইরতেনসেনু দেখল অগস্ত্যর চোখে জল। সে বলল, 'তুমি কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না অগস্ত্য। কোন সত্যের কথা বলছ?'

অগস্ত্য কিছুক্ষণ চুপ রইল, তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'আমি একজন সৌমির।'

ইরতেনসেনুর কর্ণকুহরে কথাগুলি যেন ঠিক ভাবে পৌঁছয়নি। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কী বললে তুমি?'

'আমি একজন সৌমির ইরতেনসেনু। আমি আর উপল দুজনেই সৌমির। এই পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জনজাতির দুই শেষ প্রতিনিধি।'

সহসা যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট হল ইরতেনসেনু! অগস্ত্যর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কিছুটা পিছনের দিকে সরে গেল সে। এ সে কী শুনল! অগস্ত্য সৌমির! যে সৌমিরদের কলঙ্কের কথা সে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে? যে সৌমির সিন্ধু জাতির ধ্বংসের কারণ? সে নিজে যে সভ্যতার সন্তান সেই সভ্যতাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া এক সৌমির তার স্বামী? বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বিস্ফারিত চোখে অগস্ত্যর দিকে তাকিয়ে রইল ইরতেনসেনু। তার মুখ দিয়ে কথা সরছে না, জিহ্বা যেন তার শক্তি হারিয়েছে। অগস্ত্য মাথা নামিয়ে নিয়েছে। একজন বালকের মতো কাঁদতে কাঁদতে সে শুধু বলছে, 'আমাকে ক্ষমা করো ইরতেনসেনু, আমাকে ক্ষমা করো...'

স্বামী এবং স্ত্রীর জীবন যে অপার বিশ্বাসের সুদৃঢ় স্তম্ভকে ঘিরে আবর্তিত হয় তা যেন কয়েক লহমায় টলে গেল। দুজনের মধ্যে যেন এখন কয়েক যোজন দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তার সামনে বসে থাকা যুবা পুরুষটিকে অচেনা মনে হতে লাগল ইরতেনসেনুর।

'অগস্ত্যর কোনও দোষ নেই ইরতেনসেনু।'

উপলের কথায় ইরতেনসেনু মুখ তুলে উপলের দিকে চাইল। উপল বলল, 'আমাদের সত্য আমরা নিজেদের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে দায়বদ্ধ। কিন্তু আজকে সময় হয়েছে তাকে সামনে আনার। হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে জঘন্যতম কাজটি করেছিলেন তার গ্লানি আমরা দু'জন সর্বদা বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াই। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সৌমিরেরা ভারত ভূখণ্ড ত্যাগ করে পূর্বের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু হয়তো সিন্ধুদেবীর অভিশাপেই কয়েক বছরের মধ্যেই অজানা জরার কবলে পড়ে মৃত্যু হয় বেশিরভাগ সৌমিরের।

'যারা বেঁচেছিল তারা কোনক্রমে নিজেদের দিনযাপন করেছে। তারা পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেও তখন আর কিছু করার ছিল না। একে একে সবকটি সৌমির পরিবার শেষ হয়ে যায়। আমাদের কৈশোরে

আমরা দু'জনেই কয়েক মাসের ব্যবধানে আমাদের মাতা এবং পিতাকে হারাই। বারো বছরের দুই কিশোর তখন এই পৃথিবীর শেষ দুই সৌমির। আমরাই তখন আমাদের একমাত্র পরিবার। চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও কীভাবে যে নিজেরা বেড়ে উঠেছি তা আমরাই জানি। হয়তো এই চরম গ্লানিকে ঢাকা দেওয়ার জন্য নিজেদের ক্রমাগত আরও প্রশিক্ষিত করে গেছি, চেষ্টা করেছি যে কার্যে নিয়োজিত তার শ্রেষ্ঠ স্থানে পৌঁছবার।

'আমি খুব কম বয়স থেকে নৌবিদ্যার জ্ঞান আহরণ করা শুরু করি। অগস্ত্য নিজেকে নিমগ্ন রাখে বিজ্ঞানের আরাধনায়। যৌবনে আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসি আমরা দুজনে। নিজেদের স্বীয় জ্ঞানের মাধ্যমে চেষ্টা করতে থাকি দেশটির উন্নতি করার। এই ভূখণ্ড থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা কেড়ে নিয়েছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা বলতে পারো। এক মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করে গেছি আমরা। হয়তো সিন্ধুদেবীর কোন ইচ্ছা ছিল, তাই আমরা আজও বেঁচে আছি এই গ্লানিকে বুকে নিয়ে। তুমি অগস্ত্যকে ক্ষমা করো ইরতেনসেনু। বিশ্বাস করো, তোমার কাছ থেকে এতদিন ধরে এই সত্যিকে গোপন করার জন্য ওর নিজের মনের মধ্যে ক্রমাগত রক্তপাত হয়ে চলেছে।'

ইরতেনসেনু উপলের বলা প্রতিটি শব্দকে মন দিয়ে শুনেছে। সে কিছুক্ষণ এক ভাবে বসে রইল শয্যার উপরে। তারপর উঠে এসে অগস্ত্যর সামনে বসল হাঁটু মুড়ে। শান্ত স্বরে বলল, 'তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।'

ইরতেনসেনুর এই কথায় অগস্ত্য চমকে উঠে তার দিকে তাকাল। অশ্রুর অবিশ্রাম ধারা তখনও তার দু'চোখ বেয়ে বয়ে চলেছে। সে জড়িয়ে ধরল ইরতেনসেনুকে। বলল, 'আমি তোমাকে কেবল নিজের স্ত্রী না, নিজের আত্মার অংশ বলে ভাবি ইরতেনসেনু। এই জগতে উপল ব্যতীত আমার আপন বলে আর কেউ নেই তুমি ছাড়া। আমার মধ্যে সৌমিরদের লোভ, হিংসা, চৌর্যবৃত্তির কোনটিই অবশিষ্ট নেই, বিশ্বাস করো।'

'তা আমি জানি অগস্ত্য। তোমার মনকে এইটুকু বুঝতে আমি পেরেছি। কিন্তু আজকেই এই কথাগুলি আমাকে বলা কেন? জানি সিন্ধুদেবী তোমাদের আরাধ্যা। আজ হঠাৎই কোনও দৈববলে সেই দেবীর দর্শন পাওয়াতে হয়তো তোমাদের দুজনের মন দুর্বল হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তো তোমরা এই সত্য আমার কাছ থেকে গোপন করে যেতে পারতে। আগামীকাল ভোরে আমরা এই শহর ত্যাগ করে চলে যাব। এই জীবনে এখানে আর তো ফিরে আসব না। তোমাদের পরিচয়ের কথা তো তোমরা গোপনই রাখতে পারতে।'

'না, তা আর সম্ভব নয়। আমি জানি ওই মন্দিরে প্রবেশের পর থেকে উপলের মনে কী চলছে। ওর সঙ্গে কোনও কথা না হলেও আমি জানি। আমাদের সৌমির পরিচয়ের গ্লানি আজ আমাদের দুজনের কাছে আবার খুব বড় আকারে দেখা দিয়েছে। সিন্ধুদেবীর গর্ভের রত্নটির একটি অংশ নেই তা দেখেছিলে তো?'

'হ্যাঁ। যে টুকরোটি সৌমিররা চুরি করে পালায়।'

'একটি নয়, সেদিন দুটি টুকরো চুরি করেছিল সৌমিররা। আজ সেই দুটি টুকরোকে বহন করছি আমি আর উপল।'

বিস্মিত ইরতেনসেনুর দিকে তাকিয়ে অগস্ত্য আবার বলল, 'আমার বাঁ-হাতে এই কাটা দাগটিকে তুমি বহুবার খেয়াল করেছ জানি। উপলের বাঁ-কাঁধেও এমন একটি কাটা দাগ আছে। তোমাকে আমি বলেছিলাম ছোটবেলায় খেলবার সময়ে ধারাল এক জাঁতির উপরে পড়ে আমি আর উপল দু'জনে আহত হই। তাই থেকে এই দাগ দুটি তৈরি।'

'হ্যাঁ বলেছিলে। এখন বুঝছি সেটিও মিথ্যা ছিল, তাই তো?'

অগস্ত্য লজ্জিত কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, এই দাগ দুটি দুর্ঘটনা জনিত নয়, অস্ত্রপচারের ফলে তৈরি।'

'মানে?'

'আমাদের দুই পরিবার ছিল দুই শেষ সৌমির পরিবার। দুই পরিবারেরই সদস্যরা একের পর এক মারা যেতে থাকে। আমি আমার মাকে এবং উপল তার বাবা-মা দু'জনকেই হারায়। আমার পিতাও তখন অসুস্থ,

বোঝা যায় এই পৃথিবীতে তার আর বেশিদিন নেই। সিন্ধুদেবীর গর্ভরত্নটির সেই দুটি খণ্ড আমাদের দুই পরিবারের কাছে ছিল। আমার পিতা সেই খণ্ডদুটিকে আমাদের শরীরে চর্ম আর মাংসের নীচে প্রোথিত করেন। আমার হাতের এই কাটা দাগের নীচে আছে সেই রত্নের একটি খণ্ড, উপলের বাম কাঁধে রয়েছে ওপর খণ্ডটি। এই দুটিকে সেই থেকে আমরা আমাদের শরীরের মধ্যেই বহন করছি। আমার পিতা ওই কাজ করেছিলেন যাতে কোনওভাবেই খণ্ডদুটিকে আমরা না হারাই। তার আশা ছিল আমরা যদি কোনওদিনও মূল রত্নটির কাছে এই খণ্ডদুটিকে ফিরিয়ে দিতে পারি।'

এবারে ইরতেনসেনুর চোখের সামনে যে কুয়াশা জন্মেছিল তা পরিষ্কার হল। অগস্ত্যরা তাহলে চায় এই রত্নখণ্ডদুটিকে দেবীর গর্ভে আবার ফিরিয়ে দিতে? এই প্রশ্ন করাতে অগস্ত্য বলল, 'এখানেই আমার দ্বিধা।'

উপল বলল, 'অগস্ত্য কোনওদিনই চায়নি রত্নখণ্ডদুটিকে ফিরিয়ে দিতে। তাই মূল রত্নটির কোন খোঁজ করিনি আমরা। কিন্তু আজ হয়তো কোন দৈববলেই আমরা সেই রত্নটির খোঁজ পেলাম। আমি চাই এই রাত্রেই সিন্ধুদেবীর কাছে এদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে এই ভার লাঘব করতে। নিজেকে সৌমির বলে ভাবতে আমার আজও ঘৃণা হয়। আমি চাই না আর এই কলঙ্ককে বয়ে নিয়ে বেড়াতে।'

'উপল, আমি এখনও নিশ্চিত নই যে রত্নখণ্ড দুটিকে ফিরিয়ে দেওয়া সঠিক কাজ হবে কি না। সৌমির হওয়ার গ্লানি আমাকে এখনও ন্যুব্জ করে রেখেছে। খণ্ডদুটিকে ফিরিয়ে দিলে পুন্তের মানুষ আমাদের আসল পরিচয় জানতে পারবে। তাদের সেই ঘৃণার দৃষ্টি আমি সহ্য করতে পারব না। তার চেয়ে এই গ্লানিকে নিজের মধ্যেই বয়ে নিয়ে বেড়াই।'

'তুমি কী বলছো অগস্ত্য! আজ চাইলে আমরাই কেবলমাত্র আমাদের পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব!'

'কীসের প্রায়শ্চিত্ত উপল? যে অগণিত প্রাণ নষ্ট হয়েছিল শুকিয়ে যাওয়া সরস্বতী নদীর তীরে, তারা কি আর ফিরে আসবে? সরস্বতী আবার প্রাণ ফিরে পাবে? এদের কোনটিই তো সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ঋষভের মুখে শুনলে না রত্নটি তার শক্তি হারাচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া খণ্ডদুটিকে ফিরিয়ে দিতে না পারলে নীলনদও একসময়ে শুকিয়ে যাবে!'

'উপল, যা বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না তাকে আমি বিশ্বাস করি না। সিন্ধুদেবী আমার একমাত্র ঈশ্বর। তার গর্ভরত্ন থেকে যে অদ্ভুত আলোক বিচ্ছুরিত হয় তা আমরা তিনজনই দেখেছি। কিন্তু ওই রত্নের প্রভাবে সরস্বতী নদীতে জল বইত এ আমার যেমন বিশ্বাস হয় না। তেমনই, এখন নীলনদের জলপ্রবাহের জন্য ওই রত্ন দায়ী তাতেও আমি বিশ্বাসী নই।

'হাজার বছর আগে ভূমিকম্পের নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। রত্নখণ্ডটি চুরি যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ভূমিকম্প হওয়াটা দৈব অভিশাপ নয়, নিতান্তই কাকতালীয়। কিন্তু তাই দিয়ে চুরির ঘটনাকে যথার্থতা দেওয়ার চেষ্টা আমি করছি না। সেই কাজ পাপই। কারণ তার ফলে মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস আহত হয়েছিল। এই আঘাতকে সামলানো কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ যখন বোঝে স্বয়ং ঈশ্বরই চান না সে বেঁচে থাকুক তখন তার বাঁচার আগ্রহ কমে যায়। প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার মানসিকতা হারায় তখন সে।

'তাই সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রত্যক্ষ ভাবেই দায়ী। তুমি জানো আমি দৈবে বিশ্বাসী নই। আজকে আমাদের এই নগরীতে আসা এবং এখানেই গর্ভরত্নের সন্ধান পাওয়াটা নিছক কাকতালীয় নয়, এর পিছনে কোন এক কারণ নিশ্চয় আছে। কিন্তু এখন আমার মস্তিষ্কের সেই কারণ খুঁজে বার করার ক্ষমতা নেই।'

অগস্ত্যর এই কথায় হতোদ্যম হয়ে চৌপায়ার উপরে বসে পড়ল উপল।

'তুমি তাহলে রত্নখণ্ডটিকে ফিরিয়ে দেবে না? আচ্ছা, তবে তাই হোক, কিন্তু আমি আজ রাত্রেই গুহামন্দিরে যাব। আমার অংশের খণ্ডটিকে রেখে আসব সেখানে। আশা করি আমার ইচ্ছার উপরে তোমার কোন অধিকার নেই।'

অগস্ত্য এই সময়ে বলল, 'এখনই একটি ভাবনা আমার মনে এল। অনিকাদেবী বলেছিলেন আমাদের মনের মধ্যে কোন সংশয়ের উদ্রেক হলে আমরা যেন কোনও কর্ম করার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাহলে কি উনি আমাদের চিনতে পেরেছিলেন? কীভাবে? উনি জানতেন আমাদের কাছে রত্নখণ্ডদুটি আছে এবং তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ভেবে আমরা দ্বিধাগ্রস্থ হব, কী করে জানলেন?'

'অগস্ত্য, আমি জানি বুদ্ধিতে এবং প্রজ্ঞায় তোমার সমকক্ষ আর কেউ নেই। কিন্তু এই জগতের সব রহস্যকে তুমি এখনও বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। আমিও তোমারই মতো বিজ্ঞানের উপাসক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি বিজ্ঞানের উপরেও কিছু আছে যা আমাদের বোধের বাইরে। হয়তো কোনও একদিন আমরা তাকেও বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারব। কিন্তু যতদিন না তা পারছি ততদিন আমি তাকে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতাই ভাবব।

'অনিকাদেবী কীভাবে জানতে পেরেছিলেন তোমাদের পরিচয় তা আমি জানি না, কিন্তু তিনি যে সাধারণ মানুষ নন এই বোধ আমার হয়েছিল আজ সকালের সাক্ষাতেই। তোমার বিজ্ঞানের বিশ্বাস যে তোমার দম্ভে পরিণত হচ্ছে তা তুমি বুঝতে না পারলেও আমি দেখতে পাচ্ছি। আজ একটিবারের জন্য সেই দম্ভকে সরিয়ে রাখো।'

ইরতেনসেনুর বলা কথাগুলোয় যে দৃঢ়তা ছিল তা যেন নাড়িয়ে দিয়ে গেল অগস্ত্যকে। সে বলল, 'আচ্ছা, তাহলে এখনই অনিকাদেবীর সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন আমাদের। তিনিই হয়তো সঠিক পথ নির্দেশ করবেন।'

নিজেদের কক্ষ থেকে বেরিয়ে অনিকাদেবীর ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল তারা তিনজন। তাদের মনে হল চারপাশ যেন বড় বেশিই শান্ত। উৎসবের যে বাজনা, গীত, আনন্দ কলরবের মধ্য দিয়ে এসেছিল তারা, তাদের কোন আওয়াজই আর বাইরে থেকে ভেসে আসছে না। হয়তো নৈশাহারের পর সবাই বাড়ি ফিরে গেছে। অনিকাদেবীর কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা দেখল কক্ষের দরজা সামান্য খোলা। তাঁর নাম ধরে কয়েকবার ডাকল ইরতেনসেনু, কোনও সাড়া না পেয়ে দরজাটি খুলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল তারা।

বাইরের চত্বরে জ্বলতে থাকা অগ্নিকুণ্ডের আলো গবাক্ষ বেয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। নিজের শয্যার উপরে বসে আছেন অনিকাদেবী। পাশে রাখা প্রদীপটি নিভে গেছে। বৃদ্ধার সামনে একটি পুঁথি খোলা, বোঝা যায় পুঁথিটি পাঠ করছিলেন তিনি, তারপর হয়তো বসে থাকা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে গেল তারা তিনজন। ইরতেনসেনু হাঁটু মুড়ে বসল। ইরতেনসেনু বৃদ্ধার গায়ে হাত রাখল আলতো করে। হাত দিয়েই সে চমকে উঠল! বৃদ্ধার শরীর বরফের মতো ঠান্ডা!

তখনই তাদের নজর গেল সামনে খুলে রাখা পুঁথির দিকে। পুঁথির পাতায় লেগে রয়েছে রক্ত! সেই রক্ত বয়ে আসছে অনিকাদেবীর শরীরের উপর দিয়ে, রক্তের উৎস তার গলার একটি গভীর ক্ষত! আড়াআড়ি ভাবে গলার উপর দিয়ে চলে গেছে ক্ষতটি। অনিকাদেবীর মুখ বিশ্রীভাবে বুকের উপরে ঝুঁকে পড়েছে, চোখ দুটি বিস্ফারিত! এমন অবস্থা দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল ইরতেনসেনু। ঠিক তখনই মাথার পিছনে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল অগস্ত্য।

কোনক্রমে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বাকারিকে, সে একটি প্রস্তরখণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে! তার চোখ মুখে হিংস্রভাব ফুটে উঠেছে! নিজের ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে অগস্ত্য মাটির উপরে পড়ে গেল। জ্ঞান হারানোর আগে সে দেখল উপল বসে আছে মাটিতে পড়ে থাকা ইরতেনসেনুর বুকের উপরে। তার বলিষ্ঠ হাত চেপে বসে আছে ইরতেনসেনুর গলায়!

২৬। ক্রীড়নক

শ্বেতপুষ্পের গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে অগস্ত্য। নীলাভ আলোয় চতুর্দিক ভরে থাকলেও ঘন শাখাপ্রশাখা ভেদ করে সেই আলোর সামান্য অংশই বৃক্ষের নীচে এসে পৌঁছেছে। সেই ছায়াভরা মাটির উপরে বাদামি কালো রক্ত জমাট বেঁধে আছে। রক্তের তীব্র গন্ধে অগস্ত্য ভালোভাবে শ্বাস নিতে পারছে না। কিছুটা দূরে সে দেখছে এক মানুষের শরীরকে পড়ে থাকতে, কে ও? অগস্ত্যর মনে হল অনিকাদেবীর মৃতদেহ সেখানে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তার ভ্রম ভাঙল, না তো, অনিকাদেবী নন, এ তো...

সহসা নিজের বাম হাতে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল অগস্ত্য, প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে সেই যন্ত্রণা তার চেতনাকে ফিরিয়ে আনল। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল সে। চোখ খুলেই সে দেখতে পেল উপলকে। উপলের চোয়াল শক্ত, সে দু'আঙুল দিয়ে অগস্ত্যর বাম হাতের ক্ষতের মধ্য থেকে একটি পাথরকে বার করে আনল, আবার তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল অগস্ত্য। কিন্তু তার চিৎকার পাথুরে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মাথাটি সামান্য তুলে অগস্ত্য দেখল সে শুয়ে রয়েছে সিন্ধুদেবীর গর্ভ মন্দিরের মেঝের উপরে! তার দু'হাত এবং পা কঠিন বন্ধনীতে বাঁধা। বাম হাতের ক্ষতচিহ্নের জায়গায় একটি টাটকা দীর্ঘ ক্ষত, তা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পাথুরে মেঝের উপরে এসে পড়ছে। উপল একটি কাপড়ের টুকরো দিয়ে ক্ষতটিকে ঢেকে দেওয়া শুরু করল।

অগস্ত্য উপলকে চিনতে পারছিল না। যেন সম্পূর্ণ অচেনা এক মানুষ তার সামনে বসে আছে। একেই সে শৈশবকাল থেকে নিজের ভাই বলে ভেবে এসেছে? এর সঙ্গেই কেটেছে তার কৈশোরের দিনগুলি? এই উপলই খরস্রতা পয়োষ্ণী নদীতে তাকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল? এই উপলকেই সে দেখেছে ইরতেনসেনুর গলা টিপে ধরতে?

'ইরতেনসেনু কোথায়? কী হয়েছে তার!'

আকুল কণ্ঠে বলে উঠল অগস্ত্য। হাতের তীব্র ব্যথাকে উপেক্ষা করে উঠে বসতে চাইল। উপল বলিষ্ঠ হাতে তাকে আবার শুইয়ে দিল।

'তোমার প্রেয়সী জ্ঞান হারিয়েছিল মাত্র, তাকে উপল খুন করেনি। তার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি অগস্ত্য, তবে আর বেশি দেরীও নেই। সে তোমার কাছেই আছে দেখো।'

বাকারির গলায় বিদ্রুপের ছাপ স্পষ্ট। উপল রক্তমাখা রত্নখণ্ডটিকে বাকারির হাতে দিল। বাকারি নীচু হয়ে বসে গর্ভমন্দিরের মাঝের বর্তুলাকার যে গর্তে হ্রদের জল জমে আছে, তাতে রত্নখণ্ডটিকে ধুতে লাগল। অগস্ত্য শুয়ে থাকা অবস্থাতেই ঘাড় কিছুটা ঘুরিয়ে দেখল সামান্য দূরে ইরতেনসেনুও শুয়ে রয়েছে। তারও হাত এবং পা শক্ত রজ্জু দ্বারা বাঁধা। তার জ্ঞান হয়তো কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে, অসহায় চোখে সে তাকিয়ে রয়েছে অগস্ত্যর দিকে। অগস্ত্য আবার একবার উপলের দিকে চাইল। উপল যেন ওকেই দেখছিল, চোখ নামিয়ে নিল সে। কাতর কণ্ঠে অগস্ত্য উপলকে বলল, 'কেন উপল? কেন?'

'আর কোন উপায় ছিল না অগস্ত্য। রত্নখণ্ডটিকে তুমি কোনভাবে ফিরিয়ে দিতে রাজি হতে না।'

'কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে এইভাবে? এক রাত্রের মধ্যে?'

অগস্ত্যর এই প্রশ্নে উচ্চস্বরে হাসতে লাগল বাকারি। তার চোখ মুখ দেখে এখন মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ শয়তান যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। শান্ত মিতভাষী বাকারি কোথাও যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। বাকারি হাসি থামিয়ে বলল,

'এক রাত্রের মধ্যে? তোমার বন্ধুটি শুধু এই একটি রাত্রেই তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে ভেবেছ?'

বাকারির কথার অর্থ অগস্ত্য বুঝতে পারল না, সে ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইল তার দিকে।

'অবশ্য একে বিশ্বাসঘাতকতা আমি বলব না। উপল যা করেছে তা নিজের কাছে ঠিক মনে হয়েছে বলেই করেছে। কিছুক্ষণ আগের তোমাদের রুদ্ধদ্বার আলোচনার কথা উপল আমাকে বলেছে। কী যেন বলেছিলে তুমি? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, তুমি দৈবে বিশ্বাস করো না। এই শ্বেতপুষ্পের সন্ধানে এসে গর্ভরত্নের খোঁজ পাওয়াটা একেবারেই কাকতালীয় নয়! তাই তো? তুমি ঠিকই ভেবেছিলে, কাকতালীয় তো নয়ই। গোটাটাই অনেক আগে থেকে খুব যত্ন নিয়ে লেখা একটি নাটিকার অংশ। তুমি আর ইরতেনসেনু তার কুশীলব মাত্র।'

'কী বলছ বাকারি? এই ষড়যন্ত্র তোমার করা!' ইরতেনসেনু অবসন্ন গলায় বলল।

'চুপ করো বিধর্মী!' চিৎকার করে বলে উঠল বাকারি। শুয়ে থাকা ইরতেনসেনুর সামনে এগিয়ে গেল সে, তারপর প্রবল ঘৃণার সুরে বলল, 'যেদিন থেকে আমার পিতা তোমাকে দত্তক নিয়ে এসেছে সেইদিন থেকে আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তোমার জন্য আমার ভালোবাসা বিভক্ত হয়েছিল। যখন দেখতাম পিতা পরম আগ্রহ ভরে তোমাকে ওই গোপন ভাষার পাঠ করাচ্ছে অথচ তা জানার কোন অধিকার আমার নেই, তখনই আমার হৃদয় বিষিয়ে উঠত।

'পিতার কাছ থেকে বারবার শুনে এসেছি, তুমিই যোগ্যতমা! দেখো আজকে তোমার কী পরিণতি হয়েছে! নিজের হাতে সেই পিতার নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা গোপন ধন আমার হাতে তুলে দিলে!'

'তাহলে পিতাকে তুমিই...!'

'হ্যাঁ আমি, আমিই হত্যা করেছি তাঁকে।'

'কিন্তু কেন? কীভাবে?'

'এই কাজ অগস্ত্যর এই বন্ধুটি না থাকলে সম্ভব হতো না।'

এই বলে উপলের দিকে আঙুল তুলে দেখাল বাকারি। উপল মাথা নীচু করে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এই রত্নের কাছে পৌঁছনোর জন্য বাকারিকে আমাকে সাহায্য করতেই হতো।'

'কিন্তু এই রত্নের খোঁজ তুমি পেলে কী ভাবে!'

'বাকারির থেকেই। আজ থেকে তিন মাস আগে। অসিরিয় দেশে বাণিজ্যের আদান প্রদান শেষ করে আমি থীবস নগরীতে বাণিজ্যের কাজে আসি। এমন আগেও কয়েকবার এসেছি। সেইবার তিনদিন ছিলাম থীবসে। প্রথম দিনের রাত্রিতে এক পানশালায় আমার সঙ্গে আলাপ হয় বাকারির। সেদিন প্রচুর নেশা করেছিল ও।

'নেশার ঘোরে বাকারি আমাকে বলতে থাকে সে তার পিতাকে ঘৃণা করে, তার মধ্যে সব রকমের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই বৃদ্ধ পিতার জন্য সে থীবসের মহামন্ত্রীর পদ লাভ করতে পারছে না। তার সেই পিতা নাকি মিশরীয় নয়, বিধর্মী। থীবসের মানুষকে ঠকিয়ে সে ফারাওয়ের সভাসদের আসন নিয়েছে।'

'কিন্তু সেনেনমুতের আসল পরিচয় বাকারি জানল কীভাবে?' অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করল। সে বুঝতে পেরেছিল সেনেনমুত খুন হয়েছেন, কিন্তু সেই খুনি যে বাকারিই, তা সে যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না।

'আমার বৃদ্ধ পিতাই একবার দুর্বল মুহূর্তে তাঁর জীয়নকাঠি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। একবার পিতার প্রবল জ্বর হয়, সেই সময় আমি তাঁর শুশ্রূষা করছিলাম। জ্বরের ঘোরে তিনি স্বজ্ঞানে ছিলেন না দু'দিন। সেই অবস্থায় তিনি বলছিলেন পুন্তের কথা, মেন্তুহোতেপের প্রহেলিকার কথা, সিন্ধুদেবীর গর্ভে থাকা আশ্চর্য রত্নের কথা। যেন পুন্তের কোন নাগরিকের সঙ্গেই বাক্যালাপ করছিলেন তিনি।

'জ্বর থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পর অবশ্য আমি তাঁকে এর কিছুই জানাইনি। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল পিতা প্রলাপ বকছেন। কিন্তু কিছুদিন তা নিয়ে ভাবার পর আমার মনে হল সত্যিই কথাগুলির মধ্যে যোগসূত্র আছে! শ্বেতপুষ্পের বৃক্ষ যে পুন্ত থেকে আহরিত তা থীবসের এক শিশুও জানে। আমি যখন উপলকে

পিতার কথাগুলি বলি তখনই উপল আমাকে বলে সে আমাকে সাহায্য করবে মহামন্ত্রী পদে আসীন হতে, যদি আমি তাকে পুন্ত শহরের হদিশ দিতে পারি।'

এই সময় উপল বলল, 'বাকারির কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল এই একমাত্র সুযোগ রত্নখণ্ড দুটিকে ফিরিয়ে দেওয়ার! কিন্তু মেন্তুহোতেপের প্রহেলিকার পাঠ সেনেনমুত তাঁর জীবদ্দশায় করতে রাজি হতেন না।

'তাই তাঁকে মরতে হল। উপল আমাকে গন্ধক দিয়েছিল বেশ কিছুটা। ভারতবর্ষ থেকে এই গন্ধক ও রপ্তানি করে অসিরিয়দের কাছে, তারা নাকি তা চিকিৎসায় ব্যবহার করে। উপলের দেওয়া গন্ধক আমি মিশিয়ে দিই পিতার খাদ্যে। কিছুদিনের মধ্যেই পিতা মারা যান, তাঁর মৃত্যুর কারণ থীবসের রাজবৈদ্যও বুঝতে পারেনি। গন্ধকের ব্যবহারই যে মিশরীয়রা জানে না। এতে আমার সুবিধাই হল।'

ইরতেনসেনু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কেমন অবলীলায় পিতৃহত্যার কথা বলে চলেছে বাকারি। তার গলার স্বর একটুও কাঁপছে না। সে বলতে লাগল, 'পিতার মৃত্যুর পর মহামন্ত্রী হওয়া আমার জন্য খুবই সহজ ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই আমি সেই পদ পাই। কিন্তু উপলকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমাকে পালন করতে হতো। পিতার মৃত্যুর পর আর একজনই ছিল যে মেন্তুহোতেপের প্রহেলিকার পাঠ করতে পারবে, সে ছিলে তুমি ইরতেনসেনু। তোমাকে তাই মিশরে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। এক রাত্রের অন্ধকারে আমি ফারাও হাতসেপসুতের মন্দিরের বাইরের বৃক্ষটির মাটিতে মিশিয়ে দিলাম উপলের দেওয়া বাকি গন্ধকটুকু।

সেই বৃক্ষটিও অচিরেই শুকিয়ে গেল। ফারাও এই খবরে যে অস্থির হয়ে উঠবেন তা আমি জানতাম। ফারাওয়ের সিংহাসনই যে আর সুরক্ষিত নয় তখন। তখন আমিই ফারাওকে জানালাম যে মেন্তুহোতেপের যে প্রহেলিকা ছ'শো বছর ধরে রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে তাতেই পাওয়া যাবে পুন্ত নগরীর ঠিকানা, আর সেই প্রহেলিকা যে ভাষায় লেখা তার পাঠ করতে পারবে একমাত্র তুমি। তারপর বাকিটা তো তুমি জানোই।'

এই কথা বলতে বলতে বাকারি উপলের দিকে এগিয়ে গেল, উপলের চোখে তখন জল। সে অগস্ত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে তুমি ক্ষমা করো ভাই। জানি আমি ক্ষমার অযোগ্য, তবুও এই জগতে তোমার চেয়ে আপন আমার আর কেউ নেই। এই রত্নখণ্ডের ভার আমি আর বইতে পারছিলাম না। তাই এই ছলের আশ্রয় নেওয়া।'

'কিন্তু এর জন্য তুমি খুন করতেও দু'বার ভাবলে না উপল!'

'এই রত্নের জন্য সহস্র মানুষের মৃত্যু হয়েছিল অগস্ত্য। আরও একটি প্রাণের বলি তার কাছে তুচ্ছ! আর কোন উপায় ছিল না। সেনেনমুত বেঁচে থাকলে পুন্তের খোঁজ আমরা কোনভাবেই পেতাম না। কুন্দিনাপুরীতে আমি ফিরে আসার পর অপেক্ষা করছিলাম কখন ফারাওয়ের বার্তা এসে পৌঁছবে ইরতেনসেনুর কাছে। আমি জানতাম ফারাওয়ের অনুরোধকে সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। আর সেই যাত্রার সঙ্গী হবে তুমিও। রত্নের আরেকটি খণ্ডের জন্য তোমাকেও এখানে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল।'

'আর তোমার আসা সুনিশ্চিত করতে ফারাওয়ের সম্পুটে তোমার নামটিও যোগ করার মন্ত্রণা আমিই হাতসেপসুতকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম এই কার্যে আমাদের অগস্ত্যর বুদ্ধিরও প্রয়োজন হবে। নাহ, এবারে এখনকার কাজে মন দেওয়া যাক।'

এই বলতে বলতে বাকারি এবার উপলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। উপল গুহামন্দিরের মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে নিজের ডান হাত বুকের বাম দিকে নিয়ে এসে নত হয়ে প্রণাম জানাল সিন্ধুদেবীকে। পরম ভক্তিভরে দেবীর উদ্দ্যেশে বলল, 'হে দেবী! সহস্র বছর আগে যে পাপ সৌমিররা করেছিল তার প্রায়শ্চিত্ত আমি আজ করতে চলেছি। রত্নখণ্ডদুটিকে আজ আমি আপনার গর্ভে ফিরিয়ে দেব। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।'

এই বলে দু'পা ভাঁজ করে মেঝের উপরে বসল সে। হাতের ছুরিটি সে দিল বাকারিকে। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সে নির্দেশ করল বামকাঁধের উপরের ক্ষতচিহ্নের দিকে। বাকারি ছুরি হাতে নিয়ে ঝুঁকে এল

উপলের কাছে। তারপর ছুরিটার ধারালো ডগা দিয়ে একটানে কেটে ফেলল কাঁধের চামড়া। চোয়াল শক্ত করে ছিল উপল, তার মধ্যেও যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল সে।

উপলের ক্ষতের মধ্য থেকে একটি ছোট রত্নখণ্ড বার করে আনল বাকারি। তারপর উপলের ডান হাতে খণ্ডটিকে দিল। নিজের চোখের সামনে নিয়ে এসে রত্নখণ্ডটিকে দেখতে লাগল উপল, তার মুখে প্রশান্তির আনন্দ ফুটে উঠেছে। এবার সে দুটি খণ্ডই দেবীর গর্ভে স্থাপন করে পাপমুক্ত হবে!

সহসাই অগস্ত্য চিৎকার করে উঠল, 'উপল! সাবধান!'

উপল অগস্ত্যের চিৎকার শুনে সম্বিত ফিরে পাওয়ার আগেই দেখল বাকারি তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে! সে সামান্যতম প্রতিরোধ করার আগেই উপলের বুকের বাম দিকে ছুরিটি আমূল বসিয়ে দিল বাকারি! যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল উপল! সেই আর্তনাদের সঙ্গে মিশে গেল অগস্ত্যর আর্ত চিৎকার। তার চোখের সামনে উপলকে খুন করল বাকারি! ইরতেনসেনুও কঁকিয়ে কেঁদে উঠল এবার। কিন্তু সেই দিকে বাকারির কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

মাটিতে এলিয়ে পড়া উপলের হাতের তালু থেকে রত্নখণ্ডটিকে তুলে নিল বাকারি। তারপর নিজের কোমর বন্ধের ভিতর থেকে বার করে আনল অন্য রত্নখণ্ডটিকে। তীর্যক হেসে বলল, 'তোমার এই বন্ধুটি বড়ই বোকা অগস্ত্য। প্রথমে যখন ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল তখন ভেবেছিলাম মন্ত্রীত্বেই আমি খুশি, ওই রত্নখণ্ড নিয়ে ও যা ইচ্ছা তাই করুক। কিন্তু পরে মনে হল ওই রত্নের যে আশ্চর্য ক্ষমতার কথা ও বলেছে তাকে তো অন্য কাজে ব্যবহার যায়! মিশরের সিংহাসনে এক নারী ফারাও হয়ে বসে আছে, এক নারী! যার অধিকার কেবল ফারাওয়ের বিছানায় এবং অন্তঃপুরে!

'আমি গোপনে প্রতিবেশী দেশ হিতাইতের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। এই গর্ভরত্ন নিয়ে আমি হিতাইতদের দেশে ফিরব। উপলের বানানো নকশা দেখে সেশেনুর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলতে আর কোন অসুবিধা হবে না আমার। হিতাইতরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করবে থীবসকে। তার আগে আমি নগরীতে প্রচার করে দেব শ্বেতপুষ্পের বৃক্ষটির নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা।

'যুদ্ধের দেবতা মন্তু রুষ্ঠ হয়েছে শুনলে বোকা মিশরীয়রা আর মেরুদণ্ড তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এই অলৌকিক রত্নের ঔজ্জ্বল্যের সামনে তারা হিতাইতদের বশ্যতা শিকার করবে। ওই নারী হাতসেপসুতকে আমি নিজের হাতে বধ করব সেদিন, তারপর থীবসের উপরাজা হয়ে রাজত্ব করব!'

'পাষণ্ড! নরকেও স্থান হবে না তোমার!'

চিৎকার করে বলে উঠল অগস্ত্য। তার কথায় বাকারি হাসতে লাগল। তারপর সামনে এসে তার ওপরে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'নরক বলে যে কিছু আছে তা আমি মানি না অগস্ত্য। পাপ বলেও কিছু হয় না। যা আছে তা এই জীবন, যাকে আমি অনুভব করতে পারছি আমার শরীর দিয়ে। এই এক জীবনকেই আমি ভোগ করব আমার ইচ্ছা মতো!'

নিজের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অসহায়ের মতো মেঝের উপরে পড়েছিল ইরতেনসেনু। চোখের সামনে উপলকে খুন হয়ে যেতে দেখেও সে কিছু করতে পারেনি। নিষ্ফল কণ্ঠে সে বলল, 'তুমি কী ভাবছ? তুমি এই রত্ন নিয়ে পালাতে পারবে? তার আগেই পুন্তের অধিবাসীরা তোমাকে ধরে ফেলবে।'

'সে আর সম্ভব নয় তো। গোটা পুন্ত শহর এখন ঘুমোচ্ছে, আমি তাদের নৈশাহারে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম তাতে কয়েক প্রহরের আগে কারোর ঘুম ভাঙবে না। পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন ওই বৃদ্ধা অনিকাদেবী। তাঁর চোখ দেখে মনে হয়েছিল তিনি যেন আমার মনের ভিতরটাকে পড়তে পারছেন। তাই সন্ধ্যাতেই আমি তাঁকে শেষ ঘুমে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাঁর মৃতদেহ তো তোমরা নিজেরাই দেখেছ।'

এই কথা বলতে বলতে বাকারি এগিয়ে গেল দেবীর আসনের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। অসহায় চোখে অগস্ত্য আর ইরতেনসেনু দেখল তাচ্ছিল্য ভরে নিজের বাম হাতে সিন্ধুদেবীর গর্ভ থেকে রত্নটিকে তুলে আনল সে। তারপর ডান হাতে ধরা রত্নখণ্ড দুটি তার উপরে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রত্নটি যেন

শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল! তীব্র নীলাভ সাদা আলোয় ভরে উঠল গর্ভমন্দির। রত্নটিকে দু'হাতে মাথার উপরে ধরে উন্মাদের মতো হাসতে লাগল বাকারি। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনও মানুষ নয়, সাক্ষাৎ শয়তান বিশ্রীভাবে হেসে চলেছে। ক্ষমতার লোভ লেগে রয়েছে তার চোখ মুখে।

সহসাই এক গর্জন ভেসে এল গুহা মন্দিরের বাইরে থেকে। সেই জান্তব গর্জন ছাপিয়ে গেল বাকারির উন্মত্ত হাসিকে। অগস্ত্যর রক্ত যেন শীতল হয়ে গেল এই আওয়াজে। জান্তব ধ্বনির তীব্রতা দ্রুত বাড়তে লাগল। নিমেষের মধ্যে গুহামন্দিরের ভিতর প্রবেশ করল একটি প্রাণী এবং অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকারির উপরে। একটি ছোট আর্তনাদ বেরিয়ে এল বাকারির মুখ থেকে, তারপরই শোনা যেতে লাগল হাড় ভাঙার শব্দ।

জন্তুটি বাকারিকে জড়িয়ে সিঁড়ির নীচে নেমে এসেছে। একে আগে দেখেছে ইরতেনসেনু এবং অগস্ত্য। রাজা মেন্তুহোতেপের মন্দির গাত্রে, এই গুহার অলিন্দে! এর শরীর চিতাবাঘের মতো, গাঢ় হলুদ চামড়ার উপরে গোলাকার কালো সাদা দাগ। পায়ের পাতায় নখর থাকলেও আঙুলগুলি পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। কাঁধের কাছে একটি লম্বা ফাঁক, সেখানে মাছের ফুলকার মতো দেখতে এক দেহ যন্ত্র। দানবটির কাঁধের পরের অংশ একটি ভয়াল ময়াল সাপের। সাক্ষাৎ কামারু দাঁড়িয়ে রয়েছে অগস্ত্যদের সামনে!

দানবের শরীর বেয়ে এখনও ঝরে পড়ছে হ্রদের জল। সে বেশ কয়েকটি পাকে পেঁচিয়ে ফেলেছে বাকারিকে। তার বাঁধন যত শক্ত হচ্ছে ততই বাকারির শরীরে একটি করে হাড় ভেঙে যাচ্ছে। ভয়ে এবং শ্বাসকষ্টে বাকারির চোখ দুটি লাল হয়ে গেছে, চোখের কোটর থেকে যেন তারা ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। একসময়ে মটমট শব্দে ভেঙে গেল বাকারির পাঁজরের সব কটি হাড়। এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল বাকারির মুখ দিয়ে, তারপরই তার প্রাণহীন মুণ্ডটি কাত হয়ে এলিয়ে পড়ল।

কামারু তার বাঁধন আলগা করল। বাকারির যে শরীরটা পাথরের মেঝেতে ধপ করে পড়ল তাকে আর চেনা যাচ্ছিল না। দুমড়ে মুচড়ে গেছে শরীরটি। কামারু এবার তাকাল অগস্ত্যর দিকে। ধীর পায়ে এগিয়ে এল। তার ময়াল সাপের মতো মুখটি নীচু হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা অগস্ত্যর মুখের কাছে এল। দু'দিকে চেরা জিভ মুখের বাইরে ভিতরে আসা যাওয়া করছে। মাথাটি স্থির হয়ে আছে অগস্ত্যর সামনে। সাপের গরম শ্বাস অগস্ত্যর মুখের উপরে এসে পড়ছিল। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কামারুর দিকে। কামারুর চোখদুটি অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখার মতো জ্বলছে! প্রতিটি মুহূর্তকে যেন মনে হচ্ছে এক একটি বছর।

কতক্ষণ কামারু এইভাবে অগস্ত্যর দিকে তাকিয়ে ছিল তা সে জানে না। এক সময় সেই দানব মুখ ঘুরিয়ে ইরতেনসেনুর দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে গেল মাটিতে পড়ে থাকা বাকারির শরীরের কাছে। কামারু এবার মুখে করে বাকারির ঘাড়টিকে ধরে ধীর পায়ে গুহামন্দির থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর অগস্ত্যরা শুনল জলের আওয়াজ। সিন্ধুদেবীর গর্ভরত্নটি তখন পড়ে আছে দেবীর আসনের কাছে। তার উজ্জ্বল ছ'টায় তখনও ভেসে যাচ্ছে গর্ভমন্দির।

২৭। নতুন জীবন

দিনের তৃতীয় প্রহরে সেশেনুর জঙ্গলের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু। তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঋষভ। ইরতেনসেনু তার কোলে পরম যত্নে ধরে রয়েছে শ্বেতপুষ্পের কিশলয়টিকে, সেটিকে একটি নরম কাপড়ে মোড়া রয়েছে। বাকারির ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঋষভের সঙ্গে বেশ কয়েকজন পুন্তবাসী গুহামন্দিরে পৌঁছায়। বাকারির বিষের প্রভাবে তারা তখনও কিছুটা আচ্ছন্ন।

কামারুর ভয়াল চিৎকার তাদের কানে এসে পৌঁছেছিল। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাদের। সেই শব্দ লক্ষ করে গুহামন্দিরে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগেনি আর। মন্দিরের মেঝেতে তারা দেখেছিল কামারুর রক্তমাখা পায়ের ছাপ, যে ছাপ এসে শেষ হয়েছিল হ্রদের ধারে। এত শত বছর ধরে যে ওই অদ্ভুত দর্শন জন্তুটি হ্রদের গভীরে রয়েছে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সিন্দুদেবীর গুহা মন্দিরের অতন্দ্র প্রহরী এই কামারু কি তাহলে অমর?

তবে এই দানব যে তার কর্তব্যে অবিচল তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান যে এই পৃথিবীর সব রহস্যের সমাধান করতে পারে না তা বুঝেছে অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু। রত্নটিকে সিন্ধুদেবীর গর্ভে স্থাপন করে তাদের বন্ধন মুক্ত করে ঋষভ। তাদের কাছ থেকে রাত্রির ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা সে শোনে। সব শোনার পর ঋষভ বলেছিল, 'আপনি সৌমির এই পরিচয়ে আজ আমার মনে কোন ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছে না। আপনার জন্যই আজ সিন্ধুদেবীর গর্ভরত্নটি আবার সম্পূর্ণ হতে পারল।'

'না, এই সম্মানপ্রাপ্তির অধিকার আমার নেই। যার জন্য এই হারিয়ে যাওয়া টুকরো দুটি আবার ফিরে এল সিন্ধুদেবীর কাছে, সে আমার বন্ধু উপল।'

সেনেনমুতের খুনের ঘটনা অগস্ত্য ঋষভকে বলেনি। উপল একটি পাপের স্খলনের জন্য অন্য একটি পাপ করেছিল, তার মূল্য তাকে নিজের প্রাণ দিয়ে চোকাতে হল। কিন্তু অগস্ত্য চেয়েছিল উপল তার শেষ সম্মানটুকু পাক। উপলের দেহটিকে সমাহিত করা হল শ্বেতপুষ্পের সেই বৃক্ষের নীচে যাকে অগস্ত্য স্বপ্নে দেখেছিল। শেষবারের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার আগে অগস্ত্য দেখেছিল উপলের রক্তাক্ত শরীরটিকে। বিধাতার খেলা বড় অদ্ভুত। দেবী সিন্ধু হয়তো যাত্রার আগেই এই যাত্রার পরিণতি দেখিয়েছিলেন অগস্ত্যকে।

'এবারে আমাকে বিদায় নিতে হবে।'

বলল ঋষভ। সে ইরতেনসেনু এবং অগস্ত্যর দিকে তাকাল।

'সেশেনুর অরণ্যের বাইরে যাওয়ার কোন অনুমতি আমাদের নেই। গর্ভরত্নটিকে রক্ষা করার জন্য পুন্ত নগরী অজ্ঞাতবাসেই থেকে যাবে অনন্তকাল ধরে। অবশ্য তাতে আমাদের কোন খেদ নেই। সিন্ধুদেবীকে এই অরণ্যের মাঝে রক্ষা করে চলব আমরা। নীলনদের জল কখনও শুকিয়ে যাবে না। অমর, অক্ষয় হবে মিশরীয় সভ্যতা। বাকিটা পথ তোমাদের একাই পাড়ি দিতে হবে। আমি এবার চলি। অনিকাদেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় হয়ে আসছে। তোমাদের বাকি পথের যাত্রা নিরাপদ হোক এই কামনা করি। সিন্ধুদেবী তোমাদের মঙ্গল করুন।'

অগস্ত্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেশেনুর ঘন জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল ঋষভ। বেশ কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে নুবিয়দের একটি গ্রামকে। সেখানে পৌঁছে ফারাও হাতসেপসুতের সম্পুটটিকে দেখালে নুবিয়রা ইরতেনসেনুদের সাহায্য করবে থীবসে পৌঁছতে।

সেশেনুর অরণ্য আর দূরবর্তী নুবিয়দের গ্রামের মাঝে রয়েছে একটি বৃহৎ চারণ ক্ষেত্র। লম্বা লম্বা নলিঘাসে ভরা সেই জমিটি। তার উপর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু। বিকালের নরম

সূর্যের আলো তাদের পিঠের উপরে এসে পড়ছিল। অগস্ত্যর বারবার মনে হচ্ছিল এই বুঝি সে পিছন থেকে উপলের গলার আওয়াজ শুনতে পাবে। পিছনে ফিরে সে দেখবে হাসি মুখে ছুটে এসে উপল তার কাঁধে হাত রাখল।

কিন্তু তা তো আর হওয়ার নয়। তার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের সাক্ষী সহচরটি এখন চিরনিদ্রায় শুয়ে রয়েছে শ্বেতপুষ্পের গাছের নীচে। আর কোনদিন সমুদ্রে ভাসবে না সিন্ধুযান, আর কোনদিন কেউ অগস্ত্যকে নিজের ভাই বলে সম্বোধন করবে না।

'এই পৃথিবীতে আমার নিজের বলতে কেবল তুমি রইলে ইরতেনসেনু।' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল অগস্ত্য। সে তাকিয়ে রয়েছে ইরতেনসেনুর দিকে। সেই দৃষ্টিতে রয়েছে স্বজন হারানোর বেদনা, একাকীত্বের ভয়।

'আমার পৃথিবীও তুমিই অগস্ত্য। পিতার মৃত্যু হয়েছে। মিশর আমার আপন দেশ নয়, পুন্তেও আমি আর কোনওদিন ফিরে আসব না।'

নিজের ডান হাতটি বাড়িয়ে ইরতেনসেনুর বাম হাতটি এবার ধরল অগস্ত্য। ধীর স্বরে বলল, 'এই হাত আর ছেড়ো না কখনও। আমৃত্যু ধরে রেখো।'

'রাখব। কথা দিলাম।'

বিকালের সূর্যকে সাক্ষী রেখে দুই নারী পুরুষ এরপর আলিঙ্গনে বদ্ধ হল। তাদের দুটি ওষ্ঠের মিলন হল। সেই চুম্বন যেন স্থায়ী হল অনন্তকাল ধরে। তারা উভয়েই তাদের পৃথিবীতে একা। কিন্তু তারা রয়েছে একে অপরের জন্য। মহামান্যা হাথোর, মহাশক্তিশালী সিন্ধুদেবীর আশীর্বাদ তাদের উপরে বর্ষিত হয়ে চলবে, তাদের অগোচরে। একদিন তারাও আর বেঁচে থাকবে না। তখন হয়তো ইতিহাস তাদের মনে রাখবে, পুরাণ তাদের গল্প বলবে।

পৃথিবীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান হয়তো আরও বলশালী হবে, তার আলোয় আলোকিত হবে মানবসভ্যতা, অথবা তার অন্ধকার হয়তো তাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। তবু তারই মাঝে এই পৃথিবীর মানুষ তার সত্য-অর্ধসত্য-মিথ্যায় খুঁজে চলবে ঈশ্বরকে।

অনন্তকাল ধরে।

কৈফিয়ত

হে পাঠক আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। কল্পকাহিনিটি লেখার সময়ে আমি ভাবিনি এই পরিশিষ্ট লেখবার কথা। কিন্তু অগস্ত্য এবং ইরতেনসেনু যখন সেই হরিৎক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল তখন আমার মনে হল আপনার মনে কি প্রশ্নের ঝড় ওঠেনি?

অগস্ত্য কি সত্যিই এমন চমৎকার আবিষ্কার করেছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে এসে যায় আরো একটি প্রশ্ন। অগস্ত্য কি সত্যিই ছিলেন? কতটা তার অস্তিত্বের পরিচয় পাই আমরা? কতটাই বা পুরাণের গাথা মাত্র?

ঋষি অগস্ত্যর উল্লেখ আমরা পাই ঋগবেদে। সেখানে বেশ কিছু শ্লোকের তিনি রচয়িতা। রামায়ণেও পাই তাঁকে, গোদাবরী নদীর তীরে তাঁর আশ্রম। আবার মহাভারতের বনপর্বে দেখি আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী অগস্ত্য ঋষির উল্লেখ। মৎস্যপুরাণ এবং পদ্মপুরাণেও বর্ণিত আছে তাঁর কথা। তাঁর জন্ম কোন সময়ে হয়েছিল তা বোঝা যায় না সঠিকভাবে। এমন এক কীর্তিমান মানুষের জীবন ব্যাপ্ত সহস্রাধিক বছর ধরে। কিন্তু কারোর জীবনই তো এত বছর স্থায়ী হয় না। তাহলে কি অগস্ত্য নামের বেশ কয়েকজন ঋষি ছিলেন? নাকি সম্মিলিত ঋষিকুলের নাম ছিল অগস্ত্য? এই উত্তর জানা নেই।

অগস্ত্যর যে আশ্চর্য আবিষ্কারগুলির কথা উপন্যাসে বলা হয়েছে সেগুলি সত্যিই ছিল? প্রাচীন পৃথিবীর আকাশে কি সত্যিই উড়েছিল হাইড্রোজেন বেলুন? এই ঘটনা যে সত্যিই ঘটেছিল তার কোনো নির্দিষ্ট চিহ্ন এই পৃথিবীর বুকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু পাওয়া গেছে কিছু আশ্চর্য শ্লোকের সন্ধান, যার রচয়িতা নাকি স্বয়ং অগস্ত্য। শ্লোকগুলি অগস্ত্য-সংহিতায় লিপিবদ্ধ। অগস্ত্য যদিই সত্যিই কখনও এই পৃথিবীর বুকে শ্বাস নিয়ে থাকেন এবং শ্লোকের রচনা করে থাকেন তাহলে সেই শ্লোকগুলি বারংবার পঠিত এবং রচিত হয়ে এসেছে।

আমি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছুকে বিশ্বাস করতে মন চায় না। তবুও যখন এই শ্লোকগুলির সন্ধান আমি পাই তখন নিজের কল্পনাকেই প্রশয় দেওয়ার সাধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল যদি সত্যিই কয়েক সহস্র বছর আগে কাচের গোলকের মধ্যে জ্বলে উঠত বৈদ্যুতিক আলো? সেই সময়ের পৃথিবীর আকাশে উড়ত এক আশ্চর্য বায়ুযান?

এই প্রসঙ্গে আপনার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন এসেছে যে লোপামুদ্রা তাহলে মিশরীয়? না, এও আমার বিশুদ্ধ কল্পনা। তবে বিদর্ভের রাজার কাছে যোগবলে লোপামুদ্রার জন্ম হয়েছিল বলে যে দাবি অগস্ত্য করেছিলেন তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। সেই কারণেই জন্ম নিয়েছে মিশর দুহিতা ইরতেনসেনু, যে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে এসে হয়েছে লোপামুদ্রা।

ফারাও হাতসেপসুত কিন্তু সত্যিই ছিলেন। 'জেহের জেসেরু' আজও মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে রয়েছে আমুন-রা, হাথোরের উপাসনা গৃহ।

পুন্তের অস্তিত্ব আদৌ কোথায় তা আজও কেউ জানে না। যদিও রানি হাতসেপসুতের সময়ে পুন্ত নগরীর উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়। হয়তো এখনকার দেশ সুদানের কোনো একটি অংশে ছিল এই পুন্ত।

নীলনদের যে গতিপথ এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তা আবার পুরোটাই বাস্তবিক। নদীর উপরের জলপ্রপাত, কোম ওম্বের মন্দির, নুবিয়ার রাজ্যগুলি সত্যিই রয়েছে। নীলনদ দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়। এই নদীর মূল উৎস সত্যিই একটি জঙ্গলে ঘেরা হ্রদ,' লেক ভিক্টোরিয়া'। ব্রিটিশ অভিযাত্রী জন হ্যানিং স্পেক ১৮৫৮ সালে লেক ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছতে সক্ষম হন।

বলা বাহুল্য, লেক ভিক্টোরিয়ার জলের নীচে কামারু নামের দৈত্যটি কোনোদিন ছিল না।

হে পাঠক, 'হারানো সূর্যের খোঁজে' আদ্যন্ত একটি ইতিহাস সুরভিত কল্পকাহিনি। এই আমার নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি।